সংকলন

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৩

২-৮ জুলাই

মাছে মাছে
ভরবো দে
গড়বো সোনা
বাংলাদে

মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

১৮ আষাঢ় ১৪২০
০২ জুলাই ২০১৩

বাণী

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৩** উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি দেশের মৎস্যচাষি, জেলে, মৎস্যজীবী ও মৎস্য খাত সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাই।

নদীমাতৃক বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মৎস্য খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের মানুষের আমিষের চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে এই খাত কার্যকর অবদান রাখছে। এ ছাড়াও মৎস্যসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা আমাদের প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে আসছে। সরকার মৎস্যজীবী ও জেলেদের উন্নয়নে অত্যন্ত আন্তরিক। আধুনিক ও পরিকল্পিত উপায়ে মৎস্যচাষ, আহরণ, পরিচর্যা, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আহ্বান জানাই। আমি মনে করি এ বছর জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের প্রতিপাদ্য **মাছে মাছে ভরবো দেশ, গড়বো সোনার বাংলাদেশ** অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে। সরকার ঘোষিত 'রূপকল্প-২০২১' বাস্তবায়নে সম্ভাবনাময় মৎস্য খাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। তাই এই খাতের সার্বিক উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলে নিষ্ঠার সাথে কাজ করবেন- এটাই সকলের প্রত্যাশা।

আমি **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৩** এর সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আব্দুল হামিদ

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৩

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৩

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৮ আষাঢ় ১৪২০
০২ জুলাই ২০১৩

বাণী

প্রতিবছরের ন্যায় এবারও **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৩** উদ্‌যাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এবারের প্রতিপাদ্য **মাছে মাছে ভরবো দেশ, গড়বো সোনার বাংলাদেশ** অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

প্রাকৃতিক জলাশয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। দেশের মৎস্য সেক্টরের উন্নয়নে সরকারের ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে গত চার বছরে এ খাতে ৬.২২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে রেকর্ড ৯২ হাজার ৪৭৯ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে প্রায় ৪ হাজার ৭০৪ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে। আমরা আন্তর্জাতিক আদালতে আইনি লড়াইয়ে বিজয়ী হয়ে গভীর সমুদ্রে ১ লক্ষ ১১ হাজার ৬৩১ বর্গকিলোমিটার এলাকায় বিপুল জলসম্পদের মালিকানা অর্জন করেছি। এ অর্জন মৎস্য আহরণ ও জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রকে আরও প্রশস্ত করবে বলে আমার বিশ্বাস।

বর্তমান সরকার প্রথমবারের মত জেলেদের নিবন্ধন ও আইডি কার্ড প্রদানের এক যুগান্তকারী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। জেলে সমাজের উন্নয়নে আমাদের এ উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমি মনে করি।

লাগসই ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার করে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

আমি **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৩** উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৩

জাতীয়
মৎস্য
সপ্তাহ
২০১৩

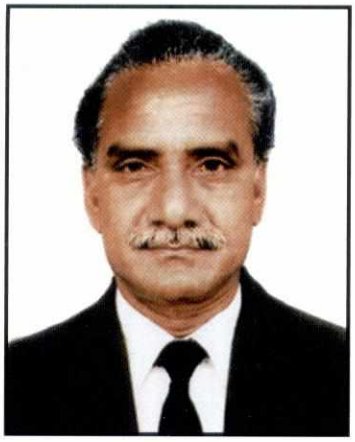

মন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা

১৮ আষাঢ় ১৪২০
০২ জুলাই ২০১৩

বাণী

রুপসী বাংলার রুপালি ফসল মাছ যা মিশে আছে আবহমান বাংলার ঐতিহ্যের সাথে। আর তাই **মাছে ভাতে বাঙালি** পরিচয় আমাদের জাতিগত ইতিহাসের অংশ। সুস্থ জাতি গঠনে অত্যাবশ্যক প্রাণিজ আমিষ সরবরাহে মাছের অবদান অনস্বীকার্য।

দেশের ক্রমবর্ধিষ্ণু জনসাধারণের নিরাপদ ও সহজলভ্য প্রাণিজ আমিষের যোগানে মৎস্য খাতের অবদান যেমন সর্বজনস্বীকৃত, তেমনি বিপুল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে মৎস্য খাত অসামান্য অবদান রাখছে। দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি পণ্য হিসেবেও মাছের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। অপার সম্ভাবনাময় মৎস্য খাতের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য এ খাতের সকল সম্পদের সর্বোচ্চ ও সহনশীল ব্যবহার প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে বর্তমান গণতান্ত্রিক ও মৎস্যবান্ধব সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় সকল শ্রেণি ও পেশার জনসাধারণের অংশগ্রহণে একটি সামাজিক আন্দোলন সূচিত হয়েছে। এ আন্দোলনের অংশ হিসেবে দেশের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিসহ মৎস্য খাতের উন্নয়নের গতিধারাকে আরো সমৃদ্ধ করার প্রচেষ্টায় ব্যাপক জনসচেতনতা এবং জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য প্রতি বছরের ন্যায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে মৎস্য অধিদপ্তর এবারও **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৩** উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে। এবারের জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের শ্লোগান নির্ধারণ করা হয়েছে **মাছে মাছে ভরবো দেশ, গড়বো সোনার বাংলাদেশ**। এ উপলক্ষে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের ফলে দেশের রুপালি মৎস্যসম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে, অবদান রাখবে একটি বিজ্ঞানমনস্ক, নিষ্ঠাবান ও মেধাসম্পন্ন জাতি গঠনে।

আমি **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৩** এর সকল কর্মকাণ্ডে দেশের আপামর জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। সফলতা কামনা করছি মৎস্য সপ্তাহে গৃহীত সকল প্রয়াসের। এ কর্মকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হউক।

মোঃ আব্দুল লতিফ বিশ্বাস, এমপি

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৩

প্রতিমন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা

১৮ আষাঢ় ১৪২০
০২ জুলাই ২০১৩

বাণী

মাছে মাছে ভরবো দেশ, গড়বো সোনার বাংলাদেশ এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৩** উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি দেশের সকল মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবী-জেলেসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্য খাতের অবদান অপরিসীম। দেশের আপামর জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মৎস্যসম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। দেশের মৎস্যসম্পদের সার্বিক উন্নয়ন সাধনে সমন্বিত প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং আধুনিক উপায়ে পরিকল্পিত মৎস্যচাষ, আহরণ ও ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য। আর এ সকল কর্মকাণ্ড দেশব্যাপী প্রচারের জন্য **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৩** উদ্‌যাপন একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে।

মুক্ত ও বদ্ধ জলাশয়ের সর্বোত্তম ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের আপামর জনগণের আমিষের চাহিদা পূরণ ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে মৎস্য সেক্টরের অবদান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে বলে আমি আশা করি।

২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সে লক্ষ্য অর্জনের জন্য সম্ভাবনাময় মৎস্য খাতের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করার আহ্বান জানাই।

আমি **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৩** এর সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হউক।

মোঃ আব্দুল হাই, এমপি

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৩

সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা

১৮ আষাঢ় ১৪২০
০২ জুলাই ২০১৩

বাণী

পদ্মা, মেঘনা, যমুনা বিধৌত গাঙ্গেয় বদ্বীপ আমাদের বাংলাদেশের বিশাল অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক জলরাশিতে রয়েছে মৎস্য উৎপাদনের অমিত সম্ভাবনা। সমুদ্র বিজয়ের প্রেক্ষাপটে অর্জিত বিশাল ও সম্প্রসারিত সামুদ্রিক এলাকায় আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এ সুযোগ ও সম্ভাবনাকে অনেক বেশি বাড়িয়ে দিয়েছে। বিশাল এ জলজ সম্পদের সর্বোত্তম এবং কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জাতীয় অগ্রগতি ত্বরান্বিতকরণ সম্ভব।

এ প্রেক্ষাপট বিবেচনায় দেশের সাধারণ মানুষকে মৎস্যসম্পদের গুরুত্ব সম্পর্কে আরও সচেতন এবং এ সম্পদ সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৩** উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে। এ মৎস্য সপ্তাহের মূল উদ্দেশ্য হলো মৎস্যসম্পদের অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে দেশের অর্থনৈতিক ভিতকে আরও শক্তিশালী করা এবং প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণে দেশবাসীকে অধিকতর সচেতন ও নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করা।

বর্তমান মৎস্যবান্ধব সরকার অপার সম্ভাবনাময় এ খাতকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতিসহ দেশের সামাজিক ও সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এ খাতের প্রবৃদ্ধি উত্তরোত্তর বাড়াতে হবে। এজন্য সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা ও পেশাজীবীসহ সকল মহলে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টিসহ সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। আর এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই গড়ে তুলতে হবে মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও উৎপাদনের সামাজিক আন্দোলন। **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৩** এর গৃহীত কার্যক্রমসমূহ দেশের জলজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করি।

মাছে মাছে ভরবো দেশ, গড়বো সোনার বাংলাদেশ এবারের এ শ্লোগান প্রতিপাদ্য বিষয়কে সফল করে তুলবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

উজ্জ্বল বিকাশ দত্ত

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৩

মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৮ আষাঢ় ১৪২০
০২ জুলাই ২০১৩

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য সেক্টরের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অনস্বীকার্য। এ দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। ২০১১-১২ আর্থিক সালে ৩২.৬২ লক্ষ মে.টন মৎস্য উৎপাদন হয়েছে, যার চলতি মূল্যমান প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকা। বিগত চার বছরে মৎস্য খাতে গড় প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৬.২২ শতাংশ। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১২ অনুযায়ী জাতীয় জিডিপিতে মৎস্য খাতের অবদান ৪.৩৯ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপিতে মৎস্য খাতের অবদান প্রায় এক-চতুর্থাংশ (২২.৭৬ শতাংশ)। বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের প্রায় ২.৪৬ শতাংশ আসে মৎস্য খাত থেকে, যা এখনো দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি খাত হিসেবে বিবেচিত। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৬০ শতাংশ যোগান দেয় মাছ, যা প্রাণিজ আমিষ সরবরাহে একটি নিরাপদ ও সহজলভ্য উৎস হিসেবেই স্বীকৃত। দেশের জনগোষ্ঠীর ১১ শতাংশের অধিক তথা প্রায় ১৬৫ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ সেক্টরের বিভিন্ন কার্যক্রমে নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করে। বিগত চার বছরে এ খাতে বার্ষিক অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে প্রায় ৬ লক্ষাধিক লোকের।

মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে আরও মজবুত এবং স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে দেশবাসীকে মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে অধিকতর সচেতন ও সম্পৃক্ত করার নিমিত্ত অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও ২-৮ জুলাই দেশব্যাপী **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৩** উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে। মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির আন্দোলনকে বেগবান করার লক্ষ্যে এ বছরের শ্লোগান নির্বাচন করা হয়েছে **মাছে মাছে ভরবো দেশ, গড়বো সোনার বাংলাদেশ**।

অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি প্রতি বছরের ন্যায় এবারও **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৩** উপলক্ষে মৎস্য বিষয়ক সংকলন প্রকাশ করা হচ্ছে। এ মূল্যবান সংকলনটি যাদের রচনা সম্ভারে সমৃদ্ধ হয়েছে আমরা তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানাই। স্থানাভাবে কিছু লেখা ছাপানো সম্ভব হয়নি, এজন্য আমরা দুঃখিত। একই কারণে কিছু লেখা সংক্ষিপ্ত করতে হয়েছে। সংকলনটি প্রকাশের ক্ষেত্রে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয় তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ, দিকনির্দেশনা ও অনুপ্রেরণা দিয়ে আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন, তাই তাঁদেরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সংকলনটি প্রকাশনায় আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য ওয়ার্ল্ডফিস, বাংলাদেশ ও সাউথ এশিয়া অফিস কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ইউএসএআইডি সাহায্যপুষ্ট ফিড দ্য ফিউচার অ্যাকোয়াকালচার-এর কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ প্রকাশনার সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ যে নিরলস শ্রম দিয়েছেন, এজন্য আমি তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

দেশের মৎস্যসম্পদের পরিকল্পিত উন্নয়নে দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলে সম্মিলিতভাবে কাজ করবো- **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৩** উদ্‌যাপনের সন্ধিক্ষণে এটাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

সৈয়দ আরিফ আজাদ

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৩

সূচিপত্র

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৩

বাংলাদেশের মৎস্যখাত : সাফল্য ও সম্ভাবনা ১৩
সৈয়দ আরিফ আজাদ

মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে গবেষণাভিত্তিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ ২১
ড. সুভাষ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বে অব বেঙ্গল প্রোগ্রাম ইন্টার-গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন এর এক দশক : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ২৫
ড. যুগরাজ সিং যাদব, ড. মোঃ শরীফ উদ্দিন ও ম রাজদীপ মুখার্জ্জী

অতিআহরণ : সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় একটি অন্তরায় ৩০
নাসিরউদ্দিন মোঃ হুমায়ূন ও বিক্রম জীৎ রায়

উপকূলীয় অঞ্চলে ভেটকি চাষ : সম্ভাবনার এক নতুন দিগন্ত ৩৪
ড. মোহাম্মদ নূরুল আবছার খান, মোঃ সাদেকুর রহমান খাঁন ও মোঃ ফয়সাল

বাংলাদেশের নদ-নদী ও মোহনা অঞ্চলে চিংড়ির জীববৈচিত্র্য ৩৮
ড. মোস্তফা আলী রেজা হোসেন

প্লাবনভূমিতে অণুপুষ্টিসমৃদ্ধ ছোটমাছের উৎপাদন ব্যবস্থাপনা কৌশল ৪৩
শামিমা আক্তার, ড. বিনয় কুমার বর্ম্মন ও ড. শকুন্তলা এইচ থিলস্টেড

সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনায় সতর্কতামূলক কৌশল অবলম্বন ৪৭
ড. মোঃ গিয়াসউদ্দিন খান

বিপন্ন কুচিয়া মাছের প্রজননকাল নির্ণয়ে জিএসআই ও ফেকান্ডিটি নিরূপণ ৫১
সৈয়দ আরিফ আজাদ ও ড. বিনয় কুমার চক্রবর্ত্তী

ল্যাবরেটরি অ্যাক্রিডিটেশন : গুরুত্ব ও করণীয় ৫৪
নিত্যরঞ্জন বিশ্বাস ও মোঃ বেলাল হোসেন

চিংড়ি বিপণন ব্যবস্থাপনা : প্রতিবন্ধকতা ও উন্নয়ন দিক নির্দেশনা ৫৮
ড. টি এস শেঠি ও মোঃ রফিকুল ইসলাম

অনন্য বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ নদী : হালদা ৬১
শেখ মুস্তাফিজুর রহমান

বাংলাদেশের মৎস্য সম্প্রসারণ কার্যক্রম : এর অপরিহার্য ভূমিকা ও চ্যালেঞ্জ ৬৫
মোঃ গোলজার হোসেন, খঃ মাহবুবুল হক ও ড. এ কে এম আমিনুল্লাহ ভূঞা

মৎস্য সেক্টর : জলবায়ু পরিবর্তন ও উন্নয়ন সম্ভাবনা ৬৯
ড. মোহাঃ সাইনার আলম ও ড. আলী মুহাম্মদ ওমর ফারুক

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় সুন্দরবনের গুরুত্ব : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ৭৪
এ বি এম আনোয়ারুল ইসলাম, মোঃ শফিকুল ইসলাম ও মোহাঃ আতিয়ার রহমান

পাঙ্গাস ও তেলাপিয়া মাছের দুর্গন্ধ হ্রাসকরণের যুতসই কৌশল ৭৭
ড. সুলতান মাহমুদ, মোঃ রোসনে আলম ও মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

হাওর অঞ্চলের জলাভূমিতে সহব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ও তার প্রভাব ৭৯
ড. এম জি মোস্তফা ও রমেশ চন্দ্র মণ্ডল

গলদা চিংড়ির গুণগতমানসম্পন্ন ব্রুড ও পোনা উৎপাদন কৌশল ৮২
ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম সরদার, ড. মোঃ ফজলুল আউয়াল মোল্লাহ্ ও মোঃ হুমায়ুন কবির খান

বরফ-খণ্ড ও বরফকৃত মাছ সংরক্ষণে স্বল্পখরচে নির্মাণযোগ্য হিমাগার ৮৫
ড. এ কে এম নওশাদ আলম

জলাভূমির জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় লাগসই কৌশল ৮৭
মোঃ আবুল হাসেম সুমন, ড. সৈয়দ আলী আজহার ও মোঃ তৌহিদুর রহমান

উপকূলীয় উন্মুক্ত জলাশয় ব্যবস্থাপনা ও জেলে পুনর্বাসন ৯২
ড. এ কে এম আমিনুল হক

মৎস্যসম্পদের সহনশীল উন্নয়নে প্রকৃত জেলেদের ডেটাবেইজ প্রণয়ন ৯৫
মোঃ আরিফুর রহমান তরফদার, মোঃ কামরুল হাসান ও মোঃ মাগফুর রহমান

বাংলাদেশের গলদা হ্যাচারি : সমস্যা ও করণীয় ৯৭
ড. মোঃ লোকমান আলী

ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন : বর্তমান প্রেক্ষাপট, বিদ্যমান সমস্যা ও করণীয় ১০১
ড. নির্মল চন্দ্র রায় ও এ বি এম জাহিদ হাবিব

মাছে ফরমালিনের অপব্যবহার প্রতিরোধে মৎস্য অধিদপ্তরের ভূমিকা ১০৫
ড. জি এম শামছুল কবীর ও শেখ মনিরুল ইসলাম মনির

মৎস্যচাষের অপার সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল ১০৮
প্রফুল্ল কুমার সরকার ও সরোজ কুমার মিস্ত্রী

স্থায়িত্বশীল মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় অভয়াশ্রমের গুরুত্ব ১১১
অজিত কুমার পাল ও ড. আব্দুল কাদির

মাছের হ্যাচারি ও নার্সারিতে রোগের প্রাদুর্ভাব ও তার প্রতিকার ১১৩
ড. মোঃ আলী রেজা ফারুক

মাছের উচ্ছিষ্টাংশ ব্যবহারের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা ১১৭
এস এম ইসতিয়াক

বাংলাদেশে উৎপাদিত মূল্য সংযোজিত চিংড়িপণ্যের পরিচিতি ১২০
মোঃ আমিন উল্লাহ

জাতীয় মৎস্য পুরস্কার ২০১৩ ১২৩

বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ ১২৪

প্রয়োজনীয় টেলিফোন নম্বর ১৩১

বাংলাদেশের মৎস্যখাত : সাফল্য ও সম্ভাবনা

Fisheries Sector of Bangladesh : Achievements and Potentials

সৈয়দ আরিফ আজাদ

বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য সেক্টরের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় প্রায় ৬০% আমিষের যোগান দেয় মাছ। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১২-এর তথ্যমতে এ দেশের মোট দেশজ উৎপাদ বা জিডিপি'র ৪.৩৯ শতাংশ এবং মোট কৃষিজ আয়ের প্রায় এক-চতুর্থাংশ (২২.৭৬ শতাংশ) মৎস্য খাতের অবদান। দেশের মোট জনগোষ্ঠীর ১১ শতাংশের অধিক বা প্রায় ১৬৫ লক্ষ লোক এ সেক্টরের বিভিন্ন কার্যক্রমে নিয়োজিত থেকে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে। দেশের রপ্তানি আয়ের ২.৪৬ শতাংশ আসে মৎস্য উপখাত হতে। বিগত চার বছরে এ খাতে বার্ষিক অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে প্রায় ৬ লক্ষাধিক লোকের।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত রূপকল্প ২০২১-এর আলোকে ২০১৩ সালের মধ্যে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে মৎস্য উৎপাদন কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে বৃদ্ধি করতে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। রূপকল্প ২০২১-এ উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে মৎস্য অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে মৎস্য সেক্টরে অর্জিত হয়েছে বিশেষ সাফল্য। আশা করা যায় ২০১৪-১৫ সালের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন অনেকাংশেই সম্ভব হবে।

২০১৪-১৫ সালের মধ্যে অর্জিতব্য লক্ষ্যমাত্রাসমূহ-

- মাছের উৎপাদন ২০০৮-০৯ সালের (২৭.০১ লক্ষ মে.টন) তুলনায় ২৫% বৃদ্ধিকরণ;
- জনপ্রতি মাছের প্রাপ্যতা ৪৫ গ্রাম থেকে ৫৬ গ্রামে উন্নীতকরণ;
- চিংড়ি ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে বৈদেশিক আয় এক বিলিয়ন ইউএস ডলার বা আট হাজার কোটি টাকায় উন্নীতকরণ;
- বেকার যুবকদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস এবং মৎস্যচাষে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;
- মৎস্যচাষি/মৎস্যজীবীদের আয় ২০% বৃদ্ধিকরণ; এবং
- দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ।

মৎস্য সেক্টরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য ও ভবিষ্যত সম্ভাবনা (Remarkable achievements and future potentials of fisheries sector)

১. মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও গ্রামীণ কর্মসংস্থান: দেশের মৎস্যসম্পদের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির বিভিন্ন সময়োপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ করে। দেখা যায়, ২০০৭-০৮ বছরে মাছের মোট উৎপাদন ছিল ২৫.৬৩ লক্ষ মে.টন, বর্তমান সরকারের মৎস্য-বান্ধব কার্যক্রম এবং চাহিদামাফিক সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের ফলে ২০১১-১২ বছরে এ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩২.৬২ লক্ষ মে.টন। চলতি ২০১২-১৩ বছরে মৎস্য উৎপাদন ৩৪.০০ লক্ষ মে.টনে উন্নীত হবে বলে আশা করা যায়।

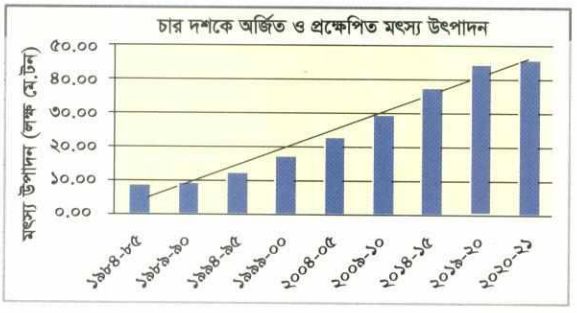

বর্তমান সরকারের চার বছরে মৎস্যখাতে গড় প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৬.২২ শতাংশ। বিগত ১০ বছরের উৎপাদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, এ খাতে বার্ষিক প্রবৃদ্ধি বেশ উৎসাহব্যঞ্জক (গড় প্রবৃদ্ধি ৫.৬১ শতাংশ) এবং এ ক্ষেত্রে প্রায় স্থিতিশীলতা বিরাজমান। প্রবৃদ্ধির এ ক্রমধারা অব্যাহত থাকলে আগামী ২০১৪-১৫ ও ২০২০-২১ সালের মধ্যে দেশে মৎস্য উৎপাদন যথাক্রমে ৩৭.০০ ও ৪৫.৫০ লক্ষ মে.টন অর্জিত হবে বলে আশা করা যায়।

দেশে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে দরিদ্র মৎস্যজীবীদের আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে দেশের ১১ শতাংশের অধিক লোক তাঁদের জীবন-জীবিকার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মৎস্য উপখাতের ওপর নির্ভরশীল। মৎস্য সেক্টরে সংশ্লিষ্ট এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রায় ১০ শতাংশ নারী, যা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক শতাংশ। এছাড়াও উল্লিখিত সময়ে অর্থাৎ বিগত চার বছরে এ সেক্টরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অতিরিক্ত বার্ষিক ৬ লক্ষাধিক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

তাছাড়া বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা যায়, বর্তমানে মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানাসমূহে নিয়োজিত শ্রমিকের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই নারী।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের (নদী, সুন্দরবন, কাপ্তাই লেক, বিল ও প্লাবনভূমি) পরিমাণ প্রায় ৪০ লক্ষ ২৫ হাজার হেক্টর, বদ্ধ জলাশয়ের (পুকুর, মৌসুমী চাষকৃত জলাশয়, বাঁওড় ও চিংড়ি ঘের) পরিমাণ ৭ লক্ষ ৪১ হাজার হেক্টর, সামুদ্রিক জলসীমার পরিমাণ ১ লক্ষ ৬৬ হাজার বর্গ কিমি এবং সমুদ্র উপকূল রয়েছে ৭১০ কিমি। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ১৯৮৩-৮৪ সালে মাছের মোট উৎপাদন ছিল ৭.৫৪ লক্ষ

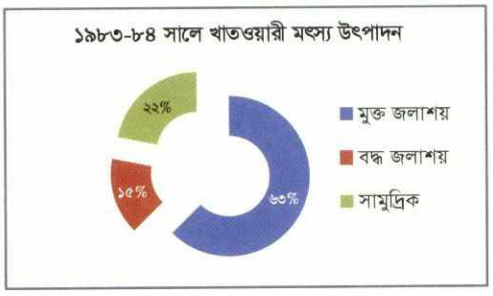

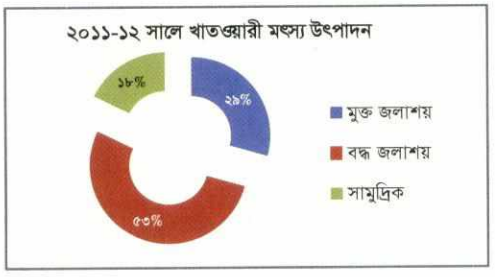

মে.টন, সেখানে প্রায় তিন দশকের ব্যবধানে এ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩২.৬২ লক্ষ মে.টন। বিগত প্রায় তিন দশকের খাতওয়ারী উৎপাদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, ১৯৮৩-৮৪ সালে উন্মুক্ত জলাশয়ের অবদান ৬৩ শতাংশ হলেও ২০১১-১২ সালে এ খাতের অংশ দাঁড়িয়েছে মাত্র ২৯ শতাংশে। প্রায় তিন দশকের ব্যবধানে বদ্ধ জলাশয়ের অবদান সাড়ে তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে এ সময়ের ব্যবধানে মুক্ত জলাশয়ের উৎপাদন হ্রাস না পেলেও প্রবৃদ্ধি কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে ধরে রাখা সম্ভব হয়নি মূলত বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট প্রতিবন্ধকতার কারণেই।

২. পোনা অবমুক্তি কার্যক্রম ও বিল নার্সারি স্থাপন: উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্তি কার্যক্রমের আওতায় ২০১২-১৩ বছরে দেশব্যাপি ৭২৭ মে.টন গুণগত মানসম্পন্ন ও বিপন্নপ্রায় প্রজাতির পোনামাছ অবমুক্ত করা হয়েছে। বিগত চার বছরে মোট পোনামাছ অবমুক্তির পরিমাণ প্রায় ২,৩২৮ মে.টন। এ পোনামাছ অবমুক্তি কার্যক্রমের ফলে বার্ষিক প্রায় পাঁচ হাজার মে.টন অতিরিক্ত মাছ উৎপাদিত হচ্ছে এবং ইতোমধ্যেই অনেক বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির মাছের আবির্ভাব ঘটেছে। তাছাড়া

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গণভবন লেকে পোনা অবমুক্তকরণ

বর্তমান সরকারের আমলে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় দেশে প্রথমবারের মত বিল নার্সারি কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। গত চার বছরে ৪৩৮টি বিল নার্সারি স্থাপিত হয়েছে। ২০১২-১৩ বছরে বিল নার্সারি স্থাপন করা হয়েছে ২১০টি। প্রাথমিক তথ্যে দেখা যায়, এ কার্যক্রম পরিচালনার ফলে দেশের উন্মুক্ত জলাশয়ে বার্ষিক প্রায় দুই হাজার মে.টন অতিরিক্ত মাছ উৎপাদিত হচ্ছে এবং জলমহালের ওপর নির্ভরশীল জেলে/সুফলভোগীদের আয় বৃদ্ধিসহ স্থানীয় পর্যায়ে প্রাণিজ আমিষের সরবরাহ বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্র: মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত বিল নার্সারি কার্যক্রম

৩. জাটকা সংরক্ষণ ও ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন: ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যতম কৌশল হচ্ছে জাটকা সংরক্ষণ এবং মা ইলিশ রক্ষা। মা ইলিশ রক্ষা পেলে এবং প্রধান প্রজনন মৌসুম সুরক্ষা করা সম্ভব হলে ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে। এ লক্ষ্যে প্রধান প্রজনন মৌসুমে ইলিশের নিরাপদ প্রজননের জন্য প্রতি বছর আশ্বিন মাসের প্রথম উদিত চাঁদের পূর্ণিমার দিনসহ আগের পাঁচ দিন ও পরের পাঁচ দিন (মোট ১১ দিন) উপকূলীয় এলাকাসহ দেশব্যাপী ইলিশ আহরণ, পরিবহন, বাজারজাতকরণ, বিক্রয় ও মজুদ নিষিদ্ধ করে আইন সংস্কার করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ২০১১-১২ বছরে ১৫টি জেলার মোট ৮৫টি উপজেলায় ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ১,৮৬,২৬৪টি সুফলভোগী জাটকা মৎস্যজীবী-জেলে পরিবারের মধ্যে মোট ২২.৩৫ হাজার মে.টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে। তারই ক্রমধারায় আরও বর্ধিত কলেবরে ২০১২-১৩ বছরে জাটকা আহরণে বিরত জেলেদের দৈনন্দিন

চিত্র: জাতীয় মাছ ইলিশ

খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য জাটকা সমৃদ্ধ ১৬টি জেলার ৮৮টি উপজেলায় ২,০৬,২২৯টি জাটকা মৎস্যজীবী-জেলে পরিবারের মধ্যে পরিবার প্রতি মাসিক ৩০ কেজি হারে চার মাসের (ফেব্রুয়ারি-মে) জন্য রেকর্ড পরিমাণ ২৪.৭৫ হাজার মে.টন খাদ্য শস্য প্রদান করা হয়েছে। স্মর্তব্য অতীতে কখনই দরিদ্র জেলেদের জন্য এত বিপুল পরিমাণ খাদ্য সহায়তা দেওয়া হয়নি। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে খাদ্য শস্যের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে বর্তমান বছরসহ সাড়ে চার বছরে মোট ৮৭.০৭ হাজার মে.টন খাদ্য শস্য প্রদান করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পূর্বের সাত বছরে জেলেদের সহায়তা কর্মসূচিতে খাদ্য শস্য বরাদ্দ ছিল মাত্র ৬.৯১ হাজার মে.টন।

তাছাড়া বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি কার্যক্রমের আওতায় ২০১২-১৩ বছরে ১০ হাজার সুফলভোগীকে বিষয়ভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানসহ ক্ষুদ্র ব্যবসা, হাঁস-মুরগি পালন, গরু-ছাগল পালন, ভ্যান/রিক্সা চালানো, সেলাই মেশিন, ইলিশ ধরার জাল প্রদান, খাঁচায় মাছ চাষ ইত্যাদি আয়-বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ইলিশ ও জাটকা বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম আরও বেগবান ও কার্যকর করার নিমিত্ত বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক একটি অত্যাধুনিক জলযান ক্রয় করা হয়েছে। ২০১১-১২ বছরে ইলিশের উৎপাদন ছিল ৩.৪৭ লক্ষ মে.টন, যার বর্তমান বাজার মূল্য ১২ হাজার কোটি টাকার ওপর। বাংলাদেশে মোট উৎপাদিত মাছের এক-দশমাংশের অধিক আসে শুধু ইলিশ থেকে। কাজেই একক প্রজাতি হিসেবে ইলিশের অবদান সর্বোচ্চ। সর্বোপরি উপকূলীয় মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবন-জীবিকা নির্বাহে ইলিশের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রায় ৫.০০ লক্ষ লোক ইলিশ আহরণে সরাসরি নিয়োজিত এবং প্রায় ২০ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ইলিশ পরিবহন, বিক্রয়, জাল ও নৌকা তৈরি, বরফ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, রপ্তানি ইত্যাদি কাজে জড়িত।

৪. পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ: চিংড়ি বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রধান রপ্তানি পণ্য। আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে এ দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি খামারে উত্তম চাষ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা হয়েছে।

চিত্র: উপকূলীয় এলাকায় আধা-নিবিড় চিংড়ি চাষ

এ সমস্ত খামারে পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণের পাশাপাশি সমন্বিত চিংড়ি-শস্য/সবজি চাষ ব্যবস্থাও প্রবর্তিত হচ্ছে। জাতীয় চিংড়ি নীতিমালা অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। আশা করা যায়, এ নীতিমালা মোতাবেক পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও লাগসই সম্প্রসারণ সেবা প্রদান, চাষি প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী খামার পরিচালনা ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে চিংড়ি খামার থেকে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পাশাপাশি একটি স্থায়িত্বশীল চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন সম্ভব হবে। নানাবিধ অপপ্রচার ও নেতিবাচক কার্যক্রমকে মোকাবেলা করে এ ক্রমবর্ধনশীল শিল্পকে অধিক স্থায়িত্বশীল করার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর সরকারি-বেসরকারি সকল স্টেকহোল্ডার সমন্বয়ে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

চিত্র: উপকূলীয় এলাকায় পরিবেশবান্ধব সমন্বিত চিংড়ি চাষ

৫. সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন: অভ্যন্তরীণ জলসম্পদের দুই-তৃতীয়াংশের অধিক প্লাবনভূমি। বিপুল এ জলসম্পদের স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য ইতোমধ্যেই জলাশয় সংশ্লিষ্ট সুফলভোগী/জেলেদের সমন্বয়ে সমাজভিত্তিক সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছে। দেশের সকল জলমহালে এ ধরনের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার উপযোগিতার কথা বিবেচনা করে সমাজভিত্তিক সংগঠন গড়ে তোলার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। জলাশয় সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবী-জেলেসহ সংশ্লিষ্ট সুফলভোগীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং জলাশয়ের জৈবিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যেই জলমহাল নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতির সংরক্ষণ, প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির জন্য অভয়াশ্রম স্থাপন একটি অন্যতম কারিগরি কৌশল। বর্তমান সরকারের বিগত

সাড়ে চার বছরে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন নদ-নদী ও অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে ৪৩৩টি অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এমতাবস্থায় বিগত সাড়ে চার বছরে স্থাপিত ৪৩৩টিসহ দেশব্যাপী প্রায় ৫০০টি অভয়াশ্রম স্থানীয় সুফলভোগী কর্তৃক সফলতার সাথে পরিচালিত হচ্ছে। এসব অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতি যথা- চিতল, ফলি, বামোস, কালিবাউস, আইড়, টেংরা, মেনি, রাণী, সরপুঁটি, মধু পাবদা, রিটা, কাজলী, চাকা, গজার, তারা বাইম ইত্যাদি মাছের পুনরাবির্ভাব ঘটেছে।

চিত্র: অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে পুনরাবির্ভাবকৃত মাছ

৬. মৎস্য আইন বাস্তবায়ন: মৎস্য খাতের উন্নয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা, পরিবেশ সংরক্ষণ, মানসম্পন্ন মৎস্য ও মৎস্য খাদ্য উৎপাদন, রপ্তানি বৃদ্ধি ইত্যাদি উদ্যোগকে সামনে নিয়ে বর্তমান সরকার কর্তৃক মৎস্য খাদ্য ও পশু খাদ্য আইন ২০১০ এবং মৎস্য খাদ্য বিধিমালা ২০১১ প্রণয়ন করেছে। পাশাপাশি মৎস্য হ্যাচারি আইন ২০১০ এবং মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা ২০১১ ইতোমধ্যেই প্রণীত হয়েছে। প্রণীত এসব আইনের আওতায় মৎস্য হ্যাচারি ও মৎস্য খাদ্য উৎপাদন কারখানার নিবন্ধন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আশা করা যায়, আইন দু'টির সফল বাস্তবায়নের ফলে উদ্যোক্তা/চাষি পর্যায়ে গুণগত মানসম্পন্ন পোনা ও মৎস্য খাদ্যের পর্যাপ্ততা অনেকাংশেই নিশ্চিত হবে। দি প্রটেকশন এন্ড কনজার্ভেশন অব ফিস রুলস ১৯৮৫ সংশোধন করে ৪টির স্থলে ৫টি এলাকায় ইলিশ অভয়াশ্রম ঘোষণা এবং ইলিশের ভরা প্রজনন মৌসুমের কাল সংশোধন করা হয়েছে। তাছাড়া সরকার নভেম্বর, ২০১১-এ প্রকাশিত গেজেটের মাধ্যমে ১ (এক) সেমি বা তার চেয়ে কম ব্যাসের বা দৈর্ঘ্যের ফাঁস-বিশিষ্ট জালের ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে। দেশীয় প্রজাতির মাছ সংরক্ষণ আরও কার্যকর করার নিমিত্ত মৎস্য সংরক্ষণ আইন সংশোধনকল্পে জালে ধৃত মাছের আকার ও সময় পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ৩০ সেমি আকারের বোয়াল মাছ এপ্রিল থেকে আগস্ট, ৩০ সেমি আকারের পাঙ্গাস মাছ নভেম্বর থেকে জুলাই এবং ২৫ সেমি আকারের জাটকা মাছ নভেম্বর থেকে জুন মাস পর্যন্ত ধরা, পরিবহন ও বাজারজাতকরণ নিষিদ্ধ করার প্রস্তাবনা রাখা হয়েছে। অতি সম্প্রতি দেশে আফ্রিকান মাগুর মাছ চাষ নিষিদ্ধ ও জলাশয় শুকিয়ে মাছ ধরা নিষিদ্ধ করার বিধান রেখে মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০-এর সংশোধন করা হয়েছে। তাছাড়া জাটকা ধরার সর্বনিম্ন আকার ২৩ সেমি-এর পরিবর্তে ২৫ সেমি নির্ধারণসহ জব্দকৃত মাছ নিলামের পরিবর্তে গরীব-দুঃস্থ ও এতিমখানায় বিনামূল্যে বিতরণের বিধান সংযুক্ত করে মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০-এর সংশোধন করা হয়েছে।

৭. মৎস্যজীবী-জেলেদের পরিচয়পত্র প্রদান: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত আগ্রহ ও উদ্যোগে বর্তমান সরকার কৃষকদের মত দেশের প্রকৃত জেলেদের শনাক্ত করে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদানের লক্ষ্যে এক যুগান্তকারী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। দেশব্যাপী প্রায় ২০ লক্ষ মৎস্যজীবী-জেলের মধ্যে ২০১২-১৩ বছরে প্রায় দুই লক্ষ মৎস্যজীবী-জেলেদের পরিচয়পত্র প্রদানের লক্ষ্যে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে পরিচয়পত্র প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আশা করা যায় ২০১৩-১৪ বছরের মধ্যে প্রকল্পের আইডি কার্ড প্রদানের ইপ্সিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। এ কার্যক্রমের ফলে প্রকৃত জেলেদের জলমহাল ব্যবস্থাপনায় অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ সরকারি প্রণোদনা ও সহায়তা প্রদান সহজতর হবে। তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগে (ঝড়, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি) জীবননাশ ঘটলে জেলে পরিবারকে এ প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হবে। তাছাড়া এ পরিচয়পত্র ইলিশ জেলেদের চিহ্নিতকরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে, যার ফলে চলমান ভিজিএফ ও বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি কার্যক্রম আরও ফলপ্রসু হবে।

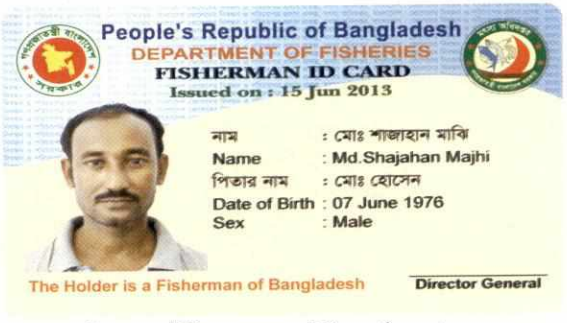

চিত্র: মৎস্যজীবী-জেলেদের আইডি কার্ডের নমুনা

৮. বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্যচাষ নিবিড়করণ: দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইতোমধ্যেই রুই জাতীয় মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি পাঙ্গাস, কৈ, শিং, মাগুর ও তেলাপিয়া উৎপাদনের এক নীরব বিপ্লব সাধিত হয়েছে। প্রশিক্ষিত ও দক্ষ সম্প্রসারণ কর্মীর মাধ্যমে মাছ চাষের আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে চাষি প্রশিক্ষণ, উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তর, লাগসই সম্প্রসারণ সেবা প্রদান, প্রদর্শনী খামার পরিচালনা ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের

ফলে বর্তমানে দেশের ৩.৭১ লক্ষ হেক্টর পুকুর-দীঘিতে বার্ষিক হেক্টর প্রতি গড় মৎস্য উৎপাদন প্রায় ৩.৬২ মে.টন। চাহিদাভিত্তিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের সব পুকুর-দীঘি লাগসই মাছ চাষের আওতায় আনা সম্ভব হলে আগামী ২০১৪-১৫ সালের মধ্যে হেক্টর প্রতি উৎপাদন ৪.০ মে.টন এবং ২০২০-২১ সালের মধ্যে ৫.০ থেকে ৬.০ মে.টনে উন্নীত করা সম্ভব।

চিত্র: পুকুরে চাষকৃত তেলাপিয়া মাছ

মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় নিমগাছি মৎস্যচাষ প্রকল্পটি সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ ও তাড়াশ এবং পাবনা জেলার চাটমোহর ও ভাঙ্গুড়া উপজেলার প্রায় ৬৭৪.৭৬ হেক্টর আয়তন বিশিষ্ট ৭৮৩টি সরকারি পুকুর/দীঘি/জলাশয় নিয়ে আশি'র দশকের প্রথম দিকে শুরু হয়ে ২০ জানুয়ারি ১৯৮৬ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত চলমান ছিল। প্রকল্পের মাধ্যমে মৎস্যচাষের অনুপযোগী জলজ আগাছায় পরিপূর্ণ দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকা হাজা-মজা পুকুর-দীঘির কচুরিপানা ও জলজ আগাছাসহ অন্যান্য উদ্ভিদ অপসারণের পর পুকুর সংস্কার, পুনঃখনন ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করে মৎস্যচাষের আওতায় আনা হয়।

চিত্র: পুকুরে চাষকৃত পাঙ্গাস মাছ

প্রকল্পের ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম সফলভাবে চলমান অবস্থায় বিগত ২১ জুন ১৯৮৬ খ্রি. তারিখ মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয় এবং গ্রামীণ ব্যাংকের মধ্যে সম্পাদিত এক চুক্তির মাধ্যমে প্রকল্পটির ব্যবস্থাপনা ২৫ বছরের জন্য গ্রামীণ ব্যাংক-এর নিকট হস্তান্তর করা হয়। চুক্তির মেয়াদ শেষে বিগত ২০ জানুয়ারি ২০১১ খ্রি. তারিখ প্রকল্পটি পুনরায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিকট হস্তান্তরিত হয়।

উত্তরাঞ্চলের অপার সম্ভাবনাময় এ খাস জলজ সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার আপামর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়নের নিমিত্ত ইতোমধ্যেই একটি উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে, যা অনুমোদনের চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। তাছাড়া এ প্রকল্প উত্তরাঞ্চলের প্রায় ২০০ টি সরকারি/বেসরকারি হ্যাচারির কৌলিতাত্ত্বিক গুণসম্পন্ন ব্রুড মাছ উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। নিমগাছি মৎস্য চাষ প্রকল্পভুক্ত পুকুর/জলাশয়ে অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় পরিচালনার জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিগত ২৬ এপ্রিল ২০১১ খ্রি. তারিখে নিমগাছি সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১১ অনুমোদন করা হয়। উক্ত নীতিমালার আলোকে সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের নিমিত্ত উল্লিখিত চারটি উপজেলার ৭,২৬৩ জন সুফলভোগীকে নিয়ে ইতোমধ্যেই ৫১৫টি সুফলভোগী দল গঠন করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট পুকুরের জন্য দল গঠন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

৯. মাছের আবাসস্থল উন্নয়ন: বিরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশ ও পলি জমে ভরাট হয়ে যাওয়ার কারণে সারাদেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পুকুর-ডোবা, খাল-বিল, বরোপিট, হাওর-বাঁওড় ও নদী-নালা মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ও অবাধ বিচরণের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এ সকল জলাশয় সংস্কার, পুনঃখনন ও খননের মাধ্যমে উন্নয়ন করে দেশীয় মাছের আবাসস্থল পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে সরকার ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২০১২-১৩ সালে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ১০টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশব্যাপী প্রায় ১,৯২০ হেক্টর জলাশয় উন্নয়ন করা হয়েছে।

চিত্র: সুফলভোগী দল কর্তৃক আবাসস্থল উন্নয়ন

বিগত চার বছরে প্রায় ৫,৬২৭ হেক্টর অবক্ষয়িত জলাশয় মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় খনন করা হয়েছে। এ সকল জলাশয় উন্নয়নের ফলে বার্ষিক গড়ে প্রায় ৩,০০০ মে.টন অতিরিক্ত মাছ উৎপাদিত হবে বলে আশা করা যায়। এছাড়া একটি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় গোপালগঞ্জ জেলাধীন মৎস্যভাণ্ডার হিসেবে পরিচিত মধুমতি বাঁওড়ের (দৈর্ঘ্য ৯.৩ কিমি) আবাসস্থল পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে দেশীয় প্রজাতির মাছের প্রাচুর্য বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১২-১৩ বছরে এ বাঁওড়ে মোট প্রায় ১.৬৫ লক্ষ ঘনমিটার মাটি খনন করা হয়।

খননকৃত জলাশয়ে দরিদ্র সুফলভোগীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে সংশ্লিষ্ট সুফলভোগীদের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ হাতে নেয়া হয়েছে। তাছাড়া বর্ষি বাঁওড়ের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নয়নকৃত জলাশয়ে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক পোনা অবমুক্তি কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। দেশব্যাপি অন্যান্য অবক্ষয়িত জলাশয়সহ ঐতিহ্যবাহী হুরা সাগর নদী পুনঃখননের মাধ্যমে মৎস্যচাষ সম্প্রসারণের পরিকল্পনা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

১০. সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা: বাংলাদেশে সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন মূলত আহরণ নির্ভর। উপকূলব্যাপী ৭১০ কিমি দীর্ঘ তটরেখা থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত একান্ত অর্থনৈতিক এলাকায় সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের বিশাল সুযোগ রয়েছে। অভ্যন্তরীণ মৎস্যসম্পদের ন্যায় সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মৎস্যজীবীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক নৌযানে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত প্রায় ২.৭০ লক্ষ মৎস্যজীবীর পরিবারের অন্যূন ১৩.৫০ লক্ষ মানুষের জীবিকা নির্বাহ হচ্ছে উপকূলীয় সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের মাধ্যমে। অতি সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক আদালত (ITLOS)-এর মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সীমানা নির্ধারিত হওয়ায় ১,১১,৬৩১ বর্গ কিমি এলাকায় মৎস্য আহরণে আইনগত ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর ফলে নতুন নতুন মৎস্য আহরণক্ষেত্র চিহ্নিত করে তলদেশীয় ও ভাসমান মৎস্য আহরণের এক নবদিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। এ সম্পদ প্রত্যক্ষ জরিপের মাধ্যমে ভবিষ্যতে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য ফিসিং গ্রাউন্ড চিহ্নিতকরণ, মৎস্যসম্পদের প্রজাতিভিত্তিক মজুদ নিরূপণ এবং সর্বোচ্চ সহনশীল মৎস্য আহরণমাত্রা নির্ণয় করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

চিত্র: সুফলভোগীদের মাঝে পরিবেশবান্ধব এফআরপি নৌকা বিতরণ

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের উন্নয়নের লক্ষ্যে চলমান বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্পের মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের মজুদ নির্ণয় করে সর্বোচ্চ সহনশীল আহরণ-মাত্রা নির্ধারণের নিমিত্ত পেলাজিক, ডিমারসেল এবং ল্যান্ডবেইজড জরিপ পরিচালনা করার লক্ষ্যে একটি গবেষণা ও জরিপ জাহাজ ক্রয় প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। উক্ত প্রকল্প হতে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি কার্যক্রম জোরদারকরণের নিমিত্ত স্যাটেলাইট প্রযুক্তি নির্ভর Vessel Tracking Monitoring System (VTMS) স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তাছাড়া বর্তমান সরকারের সময়ে দেশের উপকূলীয় জেলেদের মাঝে পরীক্ষামূলকভাবে জীবণ রক্ষাকারী সামগ্রী ও মাছ ধরার সরঞ্জামসহ মোট ৬০টি Fiber Re-enforced Plastic (FRP) নৌকা বিতরণ করা হয়েছে এবং আরও ৫৮টি নৌকা বিতরণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এসব আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব নৌকার বিভিন্ন সুবিধা বিবেচনা করে পরবর্তীতে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে উপকূলীয় জেলেদের মাঝে আরও অধিক সংখ্যায় নৌকা সরবরাহ করা হবে।

চিত্র: সুফলভোগীদের মাঝে বিতরণকৃত এফআরপি নৌকা

আইইউইউ ফিসিং এর ক্ষেত্রেও মৎস্য অধিদপ্তর কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে আইইউইউ ক্যাচ সার্টিফিকেটের মাধ্যমে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশে মাছ রপ্তানি করা হচ্ছে। ইউরোপীয় কমিশন হতে আইইউইউ ফিসিং এক্সপার্ট মিশন ২০ এপ্রিল থেকে ১২ মে ২০১২ বাংলাদেশ সফর করে স্টেকহোল্ডারদের সাথে সভা/আলোচনা করেন এবং মৎস্য অধিদপ্তরের গৃহীত পদক্ষেপে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

১১. মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি এবং স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ মাছ সরবরাহ: আন্তর্জাতিক বাজারে স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করা হয়েছে তিনটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার। এ সমস্ত পরীক্ষাগারে LC-MS/MS মেশিনসহ ELISA, AAS ও PCR মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও ঢাকার সাভারে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন একটি অত্যাধুনিক রেফারেন্স ল্যাবরেটরি স্থাপনের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। মাছ ও চিংড়ির মাননিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান কার্যক্রমের সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১১ সালের মার্চ মাসে ইইউ মিশন-এর সুপারিশে মৎস্য পণ্য রপ্তানিতে আরোপিত ২০% বাধ্যতামূলক পরীক্ষা করার বিধান প্রত্যাহার করা হয়েছে। চিংড়ি সেক্টরে ট্রেসিবিলিটি সিস্টেম কার্যকর করার অংশ হিসেবে ইতোমধ্যেই প্রায় ২.০৭ লক্ষ চিংড়ি খামার ও প্রায় ১০ হাজার রপ্তানিযোগ্য ফিনফিস (প্রধানত পাঙ্গাস, কৈ, তেলাপিয়া ও শিং-মাগুর)-এর খামার রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে।

বর্তমানে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের নির্ধারিত মাননিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের আওতায় চিংড়ি উৎপাদন থেকে ভোক্তা পর্যন্ত সকল স্তরে হ্যাসাপ ও ট্রেসিবিলিটি রেগুলেশন কার্যকর করার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিশ্ববাজারে আর্থিক মন্দাবস্থা থাকা সত্ত্বেও বর্তমান সরকারের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের ফলে ২০১১-১২ অর্থবছরে ৯২,৪৭৯ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে দেশ আয় করেছে ৪,৭০৩.৯৫ কোটি টাকা। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ২০০২-০৩ সালে ৪৭.৩৭ হাজার মে.টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে দেশ ১,৯৪২ কোটি টাকা আয় করে, সেখানে ১০ বছরের ব্যবধানে ২০১১-১২ সালে রপ্তানির পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে ৯২.৪৮ হাজার মে.টনে দাঁড়িয়েছে এবং এ থেকে আয় প্রায় আড়াইগুণ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে প্রায় ৪,৭০৪ কোটি টাকা।

চিত্র: ইইউ টিম কর্তৃক এফআইকিউসি ল্যাব, ঢাকা-এর পারফরমেন্স অডিটিং

অভ্যন্তরীণ বাজারে স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ মাছ সংরক্ষণ এবং বিপণনের বিষয়েও সরকার বিশেষভাবে সচেষ্ট রয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তর নিরাপদ মাছ প্রাপ্তির লক্ষ্যে মাছে ফরমালিনের অপব্যবহার রোধে গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে সরকার একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। যার মাধ্যমে প্রতিটি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মৎস্য বাজার ও আড়তগুলোতে সচেতনতা সভা করার পাশাপাশি আইন প্রয়োগ করছে। মৎস্য ব্যবসায়ী, মৎস্যজীবী ও মৎস্য আড়ত ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে ৮০টি ফরমালিন ডিটেকটিং ডিজিটাল কিট বিতরণ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে প্রতিটি উপজেলায় এ ডিটেকটিং কিট সরবরাহ করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

১২. জলবায়ু পরিবর্তন ও মৎস্যসম্পদ: জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাবে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের পানি শুকিয়ে গিয়ে মাছের আবাসস্থল কমে যাচ্ছে, সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ছে মাছের বংশবিস্তার। নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড় ও সাগরের মাছের ওপর নির্ভরশীল জেলেদের বেশির ভাগ ভূমিহীন ও হতদরিদ্র এবং নদী ও সাগরের অতি নিকটে দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় বাস করার কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগে তারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সাগর এখন দীর্ঘ সময় ধরে উত্তাল থাকে, ফলে জেলেদের মাছ ধরার সুযোগ ও সময়ে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণসহ ধরনও পরিবর্তিত হচ্ছে- এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে মৎস্য প্রজনন ও উৎপাদনে। এমতাবস্থায় জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মৎস্য সেক্টরের ওপর নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় মৎস্য অধিদপ্তর বিভিন্ন সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মৎস্যসম্পদের সহনশীল প্রবৃদ্ধি ধরে রাখার লক্ষ্যে জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য বিবেচনাধীন রয়েছে।

১৩. প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র সংরক্ষণ: রুই-কাতলা জাতীয় মাছের অন্যতম প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র হালদা নদী, লবণাক্ত ও আধা-লবণাক্ত মাছের অন্যতম চারণক্ষেত্র (nursery ground) সুন্দরবন এবং মৎস্যসম্পদে সমৃদ্ধ বাঁওড় অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে মৎস্য অধিদপ্তর নিবিড় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। বর্তমান সরকার প্রাকৃতিক পোনার উৎসস্থল হালদা নদী রক্ষায় ১,৩২১.৩২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নানামুখী কর্মকাণ্ড গ্রহণ করেছে। এর ফলে ২০১২ সালে বিগত ১০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ ১,৫৬৯ কেজি রেণু আহরিত হয়েছে। ২০১৩ সালে প্রথম ধাপে (৪-৫ মে ২০১৩ খ্রি.) ইতোমধ্যেই ৬২৫ কেজি রেণু সংগৃহীত হয়েছে। আশা করা যায় প্রতিবারের ন্যায় দ্বিতীয় ধাপেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রেণু সংগৃহীত হবে। তাছাড়া মৎস্য অধিদপ্তর ৭টি জেলার হাওর অঞ্চল চিহ্নিত করে ডেটাবেইজ তৈরির মাধ্যমে পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে ২০ বছরের জন্য এক উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

১৪. মানব সম্পদ উন্নয়ন: মৎস্য সেক্টরে নিয়োজিত সকল উন্নয়ন কর্মীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০১২-১৩ বছরে ২.৪৩ লক্ষ জনকে অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে ও ১০৩ জনকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র: মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউটে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী

মৎস্য অধিদপ্তরে জনবল সঙ্কট এবং মৎস্য সেবা কার্যক্রমের বর্ধিত চাহিদার প্রেক্ষিতে বর্তমান সরকারের সময়ে দু'টি প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ২,৭১৪ জন স্থানীয় মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মী বা লিফ উন্নয়ন করা হয়েছে, যার মধ্যে ১১০ জন মহিলা। বিগত চার বছরে এ অধিদপ্তরে ৯৭টি ১ম শ্রেণির পদে জনবল নিয়োগ করাসহ ৩য় শ্রেণির পদে ২৪৬ জন ও ৪র্থ শ্রেণির পদে ৩৮৯ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

তাছাড়া বিগত চার বছরে ৭১১ জন কর্মচারির স্থায়ীকরণসহ ১,৫৫৬ জনকে নিয়মিতকরণ করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে বিগত চার বছরে বিভিন্ন পদে ১,৩১৮ জন জনবল পদায়ন করা হয়েছে। সর্বোপরি সরকারের রূপকল্প ২০২১-এর অর্জিতব্য লক্ষ্যসমূহ অর্জনের নিমিত্ত মৎস্য অধিদপ্তরে বিদ্যমান মোট ৪,৮৪৬টি রাজস্বখাতের পদের সাথে অতিরিক্ত আরও ২,৪৫৭টি পদ রাজস্বখাতে সৃজন করার প্রস্তাব গত ১৯ এপ্রিল ২০১২ খ্রি. তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রস্তাবিত জনবল কাঠামো অর্থ মন্ত্রণালয় হতে চূড়ান্ত অনুমোদন পেলে মৎস্য সেক্টরের কর্মকাণ্ডে ব্যাপক গতির সঞ্চার হবে।

চিত্র: নির্মানাধীন মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউটের একাডেমিক ভবন

ডিপ্লোমা-ইন-ফিসারিজ কোর্স সম্পন্ন করার মাধ্যমে মৎস্য সেক্টরে মধ্য পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, মৎস্য হ্যাচারি, মৎস্য খামার, মৎস্য খাদ্য কারখানা, মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা, এনজিও ইত্যাদিতে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে দক্ষ প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন জনশক্তি সৃষ্টি করার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় চাঁদপুরে মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট চালু করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতি বছর ২৫ জন করে বিগত চার বছরে মোট ১০০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে। আশা করা যায় বর্তমান সরকারের সময়েই ডিসেম্বর ২০১৩-এ প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থীগণ ডিপ্লোমা-ইন-ফিসারিজ ডিগ্রি অর্জনে সক্ষম হবে। ক্রমবর্ধিষ্ণু এ মৎস্য সেক্টরের মধ্য পর্যায়ে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনবলের ব্যাপক চাহিদার বিষয়টি বিবেচনায় এনে বর্তমান সরকার কর্তৃক গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ এবং সিরাজগঞ্জ জেলায় আরও তিনটি মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট স্থাপন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী চারটি মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট-এ প্রতি বছর ৪০ জন করে মোট ১৬০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা সম্ভব হবে।

১৫. তথ্যপ্রযুক্তি সেবা প্রদান: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সুবিধা কাজে লাগিয়ে মাছ ও চিংড়ি চাষিদের চাহিদাভিত্তিক প্রযুক্তি সেবা তাৎক্ষণিকভাবে প্রদানের লক্ষ্যে দেশের ১০টি জেলার ১০টি উপজেলার ১০টি গ্রামে ই-এক্সটেনশন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি প্রকল্পের মাধ্যমে ৭০০টি চাষি পরামর্শ কেন্দ্র (ফিয়াক) ইউনিয়ন পর্যায়ে নির্মিত হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মহাসড়কে গ্রামীণ চাষিদের সম্পৃক্তকরণ বর্তমান সরকারের এটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। দেশব্যাপী মৎস্যজীবী-জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদানের নিমিত্ত ডেটাবেইজ তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আশা করা যায় এ কর্মসূচি দেশে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে কাঙ্ক্ষিত অবদান রাখার পাশাপাশি স্থানীয় জনগণকে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে অধিকতর সামর্থ্যবান করে তুলবে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

১৬. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি: মৎস্যসম্পদের কাঙ্ক্ষিত ও সহনশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার প্রথম থেকেই বিনিয়োগ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ২০১২-১৩ বছরে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মোট ২৭টি উন্নয়ন প্রকল্প ও একটি কর্মসূচির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় প্রায় ১,২২৯.১৪ কোটি টাকা। এছাড়াও ২০১২-১৩ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য ২০টি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত পশ্চাদপদ এলাকার মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে এসকল বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এসব প্রকল্পের মাধ্যমে অবক্ষয়িত জলাশয় সংস্কার, মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা, জলাভূমির জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পোনা অবমুক্তি ও বিল নার্সারি স্থাপন, বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

উপসংহার (Conclusion)

চলমান বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রসমূহের যথাযথ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র সংরক্ষণ, খাস জলাশয়সমূহ জৈবিক ব্যবস্থাপনার আওতায় আনয়ন, আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে চাষ পদ্ধতি নিবিড়করণ ও বহুমুখী-করণ, সকল ধরনের জলজ সম্পদ ও তথ্য প্রযুক্তি কার্যকরভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন আগামী ২০১৪-১৫ সাল নাগাদ ৩৬.৯৬ লক্ষ মে.টন এবং ২০২০-২১ সাল নাগাদ ৪৫.৫২ লক্ষ মে.টনে উন্নীত করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। এর ফলে মাছ ও চিংড়িসহ অন্যান্য জলজ সম্পদের দায়িত্বশীল উৎপাদন নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি দেশিয় খাদ্য নিরাপত্তা বিধান, আপামর জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণ, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি ও অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত হবে। একটি আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক, প্রযুক্তি নির্ভর, ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত সমৃদ্ধ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে মৎস্য অধিদপ্তর তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ (dg@fisheries.gov.bd)

মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে গবেষণাভিত্তিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ

Research-Based Technology Innovation and Extention to Enhance Fish Production

প্রফেসর ড. সুভাষ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

Abstract

Fisheries research has made a significant contribution to sustainable growth of aquaculture through generating a number of economically viable, socially acceptable and environmentally compatible technologies. In accordance with the government vision, development plan, demand from the stakeholders and priority for the development of fisheries sector, the Bangladesh Fisheries Research Institute (BFRI) has been imparting significant role in developing country's fisheries resources. BFRI so far developed about 50 improved aquaculture and management technologies with a view to increase fisheries production. Moreover, the institute is conducting research for biodiversity conservation of the threatened fish species like Pabdah catfish, Mystus, climbing perch, Stinging catfish, Walking catfish, Putitor mohaseer, Gangetic leaffish etc. and to promote the culture of small indigenous species. In accordance with Vision-2021, BFRI's main goal of research is to increase fish production through development and adoption of scientific fish farming and suitable open water fishery management practices in the country. To achieve the potential, it is very essential to develop and adopt proper policy, strategy and programs, research investment and approach on the part of the government and concerned agencies.

মাছ প্রাণিজ আমিষের সহজলভ্য উৎস। আমাদের দেশে প্রাণিজ আমিষের ৬০ ভাগ যোগান দেয় মাছ। দেশের রপ্তানি আয়ে মানবসম্পদ, পোশাক শিল্প ও পাটজাত দ্রব্যের পরই মৎস্য সেক্টরের অবদান। জাতীয় আয়ের ৪.৪৩ শতাংশ আসে মৎস্য সেক্টর থেকে। রপ্তানি আয়ের এক বিরাট উৎস মৎস্যসম্পদ এবং এ আয়ের শতকরা ২.৭৩ ভাগ আসে মৎস্য খাত থেকে। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০.৫ শতাংশ মাছ ও চিংড়ি চাষ, পরিবহন, বিপণন এবং প্রক্রিয়াজাতকরণে সরাসরি জড়িত। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট জাতীয় চাহিদার নিরিখে নিবিড় গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে ইতোমধ্যে মৎস্য প্রজনন, চাষ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ৫০টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের অধিকাংশই মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে যৌথভাবে সম্প্রসারণ, প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী কার্যক্রমের মাধ্যমে সফলভাবে সারাদেশে চাষি ও উদ্যোক্তা পর্যায়ে হস্তান্তর করা হয়েছে। গবেষণালব্ধ প্রযুক্তিসমূহ মৎস্যচাষিসহ উদ্যোক্তা শ্রেণিকে উৎসাহী করে তোলে। মৎস্যসম্পদে সমৃদ্ধ এদেশে পরিবেশের পরিবর্তন, আবাসভূমির সংকোচন ও মনুষ্যসৃষ্ট নানবিধ কারণে অনেক প্রজাতির মাছ আজ বিপন্ন হতে চলেছে।

ইনস্টিটিউটের গবেষণায় এযাবত প্রায় ১৫টি বিপন্ন মৎস্য প্রজাতির কৃত্রিম প্রজনন ও চাষ পদ্ধতি উদ্ভাবন হয়েছে যা বিপন্ন প্রজাতি সংরক্ষণে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। মাছ চাষের সম্ভাব্য অর্থনৈতিক ও পুষ্টিমানের দিকগুলো এর মধ্যেই আলোচিত ও বোধগম্য হয়ে ওঠেছে। তাই মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির কর্মসূচিকে প্রযুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত করতে পারলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি আমিষ যোগান ত্বরান্বিত হবে।

প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রমিতকরণ
(Innovation of technology and standardization)

পদ্ধতিগত মাছ চাষের ধারণা এদেশে শুরু হয় আশির দশকে। তবে মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পর হতেই মাছ চাষে লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন প্রক্রিয়া ও মাঠ পর্যায়ে এর প্রয়োগ গতি লাভ করে। ইনস্টিটিউটের গবেষণালব্ধ প্রযুক্তিসমূহ হলো- ছোট মাছের চাষ, রুই মাছের মিশ্রচাষ, উন্নত নার্সারি ব্যবস্থাপনা, পাঙ্গাস মাছের চাষ, হাঁস/মুরগির সাথে মাছের সমন্বিত চাষ, ধানক্ষেতে মাছ চাষ, গৃহাঙ্গন হ্যাচারিতে গলদা চিংড়ির পোনা উৎপাদন, বাগদা চিংড়ির উন্নত চাষ ব্যবস্থাপনা, কাঁকড়া চাষ প্রভৃতি।

ইনস্টিটিউটের প্রযুক্তি উদ্ভাবন ধাপ
(Steps of technology innovation)

ইনস্টিটিউটের প্রযুক্তি উদ্ভাবন ধাপ মূলত ৪টি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যথা-

প্রথম পর্যায় ১৯৮৮-১৯৯৬ (First phase: 1988-1996)

এ পর্যায়ে ছোট জাতের মাছ বিশেষ করে মৌসুমী পুকুরে গিফট তেলাপিয়া ও রাজপুঁটির প্রজনন ও চাষ, রুই জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ, পুকুরে হাঁস-মুরগির সাথে মাছ চাষ, ধানক্ষেতে মাছ চাষ, পুকুরে পাঙ্গাস মাছের চাষ, গৃহাঙ্গন হ্যাচারিতে গলদা চিংড়ির পোনা উৎপাদন ও রুই জাতীয় মাছের উন্নত হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবনের পর তা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ এবং পরবর্তীতে চাষিদের পুকুরে প্রযুক্তিসমূহ প্রদর্শনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

এরই ফলশ্রুতিতে বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যক্তি মালিকানায় ছোট বড় মৎস্য হ্যাচারি ও খামার প্রতিষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় পর্যায় ১৯৯৭-২০০২ (Second phase: 1997-2002)

ইনস্টিটিউটের নদীকেন্দ্রের গবেষণায় মেঘনা নদীর ষাটনল হতে চাঁদপুর, হাজিমারার নীলকমল ও উপকূলীয় দুবলার চর হতে কুয়াকাটা পর্যন্ত জাটকা ইলিশের দুটি বৃহৎ বিচরণক্ষেত্র শনাক্ত করা হয়। একই সময়ে ইনস্টিটিউটের লোনাপানি কেন্দ্রের উদ্ভাবিত প্রযুক্তিতে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে ঘেরে উন্নত পদ্ধতিতে বাগদা চিংড়ি চাষ শুরু হয়। সে সাথে গবেষণালব্ধ ফলাফলের আলোকে চিংড়ি পোনা ধরার ফলে উপকূলীয় জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয় পর্যায় ২০০৩-২০০৮ (Third phase: 2003-2008)

এই সময়কালে কৈ, মাগুর ও শিং মাছের পোনা উৎপাদন ও চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে ব্যাপক সংখ্যক চাষি এসব মাছের চাষ শুরু করে। মুক্ত জলাশয়ে পেনে ও খাঁচায় মাছ চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে অনেকে এ প্রযুক্তি ব্যবহারে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এক গবেষণা সমীক্ষায় দেখা যায়, বুড়িগঙ্গা নদীর পানি মারাত্মকভাবে দূষিত ও মাছের আবাসস্থলের অনুপযোগী। দক্ষিণাঞ্চলে কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ (crab fattening) পদ্ধতি ও চিংড়ি রোগের প্রাদুর্ভাবের কারণে মৎস্য-চিংড়ি বহুমুখীকরণ চাষ পদ্ধতি ও ফসল চক্রভিত্তিক চিংড়ি চাষ শুরু হয়।

সাম্প্রতিক সময় ২০০৯-২০১২ (Recent 2009-2012)

বিএফআরআই সুপার গিফট মনোসেক্স তেলাপিয়ার হ্যাচারি স্থাপন ও চাষ ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বাণিজ্যিকভিত্তিতে উৎপাদিত মৎস্য খাদ্যের গুণগতমান নির্ধারণের মাধ্যমে মাছ চাষে উন্নত খাদ্য ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। দেশে ইতোপূর্বে আনীত থাই পাঙ্গাস ও কৈ মাছের বর্তমান স্টক থেকে অব্যবস্থাপনা ও অন্তঃপ্রজনন সমস্যার কারণে আশানুরূপ উৎপাদন না পাওয়ায় ইনস্টিটিউটের ব্যবস্থাপনায় থাইল্যান্ড হতে নতুন ও বিশুদ্ধ জাতের থাই পাঙ্গাস ও কৈ মাছের পোনা সংগ্রহ করে ব্রুড উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বাদুপানি কেন্দ্রে লালন-পালন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে থাই কৈ মাছের নতুন স্টকের পোনা মৎস্য অধিদপ্তর ও আগ্রহী মৎস্য চাষিদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া চীন হতে ৫ প্রজাতির চাইনিজ কার্পের উন্নতজাত সংগ্রহ করে ইনস্টিটিউটের স্বাদুপানি কেন্দ্রের পুকুরে লালন করা হচ্ছে যা পরবর্তীতে সরকারি ও বেসরকারি হ্যাচারিতে বিতরণ করা হবে।

উল্লেখযোগ্য গবেষণা সাফল্য (Remarkable research)

১. কার্প ও তেলাপিয়ার উন্নত জাত উদ্ভাবন (Improve strain innovation of carp and tilapia)

দেশে বেসরকারি হ্যাচারিসমূহে ব্রুড মাছের অব্যবস্থাপনা ও অন্তঃপ্রজনন সমস্যা দূরীকরণে উন্নত ব্রুড মাছের প্রাপ্যতা ও ব্যবহার অতীব জরুরি। জেনেটিক গবেষণার মাধ্যমে ইনস্টিটিউট তিনটি মাছের উন্নতজাত উদ্ভাবন করেছে। রুই মাছের জেনেটিক জাত উন্নয়ন গবেষণার জন্য দেশের বিভিন্ন নদী উৎস থেকে বন্যজাত সংগ্রহ করে ক্রস ব্রিডিং পদ্ধতিতে প্রথম প্রজন্মের উন্নত রুই-এর জাত উদ্ভাবন করা হয় যা স্থানীয় জাতের তুলনায় ১৫ ভাগ অধিক ফলনশীল। জেনেটিক সিলেকশন পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে তেলাপিয়া নাইলোটিকার উন্নতজাত উদ্ভাবন করে; যা স্থানীয় গিফট জাতের তেলাপিয়ার তুলনায় বিএফআরআই গিফট জাত প্রায় ৪০ ভাগ বেশি উৎপাদনশীল। এছাড়া বিএফআরআই রাজপুঁটির জাত বিদ্যমান রাজপুঁটির চেয়ে শতকরা ৩০ ভাগ অধিক উৎপাদনশীল। ইনস্টিটিউটের কারিগরি সহায়তায় দেশব্যাপী ১০০টি মনোসেক্স তেলাপিয়া হ্যাচারি গড়ে উঠেছে।

২. বিপন্ন প্রজাতির মাছের পোনা উৎপাদন ও জীনপুল সংরক্ষণ (Fingerling production and genepool preservation of endangered species)

মিঠাপানির প্রায় ২৬০টি মৎস্য প্রজাতির মধ্যে ৫৬টি প্রজাতি বিপন্ন বলে চিহ্নিত। ইনস্টিটিউট এসব বিপন্ন প্রজাতির মধ্যে প্রণোদিত প্রজননে সাম্প্রতিক সময়ে দেশী পাঙ্গাস, গুজি আইড় ও চিতল মাছের পোনা উৎপাদনে প্রাথমিক সফলতা লাভ করেছে। ইতোপূর্বে ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা ৭ প্রজাতির বিপন্ন কার্প মাছ যথা- বাটা, সরপুঁটি, ভাঙ্গনা, মেনি, কালিবাউস, গণিয়া ও মহাশোল; ৪ প্রজাতির ক্যাটফিস যথা- পাবদা, গুলশা, শিং, মাগুর মাছের কৃত্রিম প্রজননে পোনা উৎপাদনে সফলতা অর্জন করে। নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন কেন্দ্রে এসব মাছের লাইভ জীনব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে।

চিত্র: বিপন্ন মহাশোল মাছের পোনা অবমুক্তকরণ

বিপন্ন মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষণের লক্ষ্যে নেত্রকোণা জেলার সোমেশ্বরী নদীতে সম্প্রতি ৫,০০০টি মহাশোল মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে।

প্লাস্টিক বরফ-বাক্স প্রবর্তন (Introduction of FRP box):

বর্তমানে বাংলাদেশে পরিবহনকালে সঠিক পরিচর্যা এবং যথার্থ সংরক্ষণের অভাবে বিপুল পরিমাণ মাছের গুণগতমান নষ্ট হয়ে যায়। মাছের এ বিপুল ক্ষতি কমিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংগঠন কর্তৃক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ প্রচেষ্টা ও উদ্যোগকে কার্যকর ও অগ্রগামী করার জন্য বিওবিপি-আইজিও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিসারিজ টেকনোলজি বিভাগকে ফাইবার রি-ইনফোর্সড প্লাস্টিক (FRP) এর তৈরি টেকসই ও সাশ্রয়ী বরফ বাক্সের নমুনা সরবরাহ করেছে।

প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ (Developing documentary film):

বিওবিপি-আইজিও বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য ক্ষেত্রে আহরিত মাছ সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ ও সাগরে নিরাপত্তা বিষয়ক শিক্ষামূলক প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণের কাজ শুরু করেছে।

প্রামাণ্যচিত্রটির নির্মাণকাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে এবং অচিরেই সম্পন্ন হবে।

বাংলাদেশের ক্ষুদ্রায়তন মৎস্য সেক্টরের উন্নয়নে প্রস্তাবনা (Recommendations for developing small-scale fisheries):

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের স্থায়িত্বশীল ব্যবহার এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন মৎস্যসম্পদের যথাযথ সংরক্ষণ ও পরিকল্পিত আহরণ। বাংলাদেশে আর্টিস্যানাল বা ক্ষুদ্রায়তন মৎস্য সেক্টরের মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণ প্রধানত সাগরের অগভীর অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং অনেক ক্ষেত্রেই মৎস্য সংরক্ষণ আইন সঠিকভাবে প্রতিপালিত হয় না। যাতে করে মৎস্য মজুদে কিশোর মাছ প্রবেশন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। উল্লেখ্য, অদ্যাবধি আধুনিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রলার কর্তৃক মৎস্য আহরণ ৪টি ফিসিং গ্রাউন্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এমতাবস্থায় সরকারি উদ্যোগে নতুন ফিসিং গ্রাউন্ড চিহ্নিতকরণ -সহ প্রয়োজন মৎস্য আহরণের পদ্ধতি ও লক্ষিত প্রজাতি পরিবর্তন করে আর্ন্তজাতিক বাজারে অধিক চাহিদা সম্পন্ন এবং মূল্যবান অতি অভিপ্রয়াণশীল (highly migratory) প্রজাতি যেমন- টুনা জাতীয় মাছ আহরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা। এতে করে নতুন প্রজাতির উচ্চ বাজারমূল্যের মাছ আহরিত হয়ে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় হবে এবং কম অভিপ্রয়াণশীল (straddling species) মৎস্য প্রজাতির প্রবেশন বৃদ্ধি পাবে। এক্ষেত্রে বিওবিপি-আইজিও এর সদস্যরাষ্ট্র পার্শ্ববর্তী দেশ শ্রীলংকার অভিজ্ঞতাকে বিবেচনা করা যেতে পারে। বর্তমানে শ্রীলংকার ক্ষুদ্রায়তন মৎস্য নৌযানের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তাদের মৎস্য আহরণের প্রকৃতি পরিবর্তন করে গভীর সমুদ্রে টুনা মাছ আহরণ করছে এবং সেদেশে সামুদ্রিক মৎস্য ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ আহরণে নিয়োজিত নৌযানসমূহের পরিবীক্ষণ (vessel monitoring system) ব্যবস্থা না থাকলেও মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বাংলাদেশ মেরিন ফিসারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্পের আওতায় নৌযানগুলোকে পরিবীক্ষণ পদ্ধতির আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে যা খুবই সময়োপোযোগী সিদ্ধান্ত এবং যুগান্তকারী পদক্ষেপ। তবে এই পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রারম্ভেই একটি বিষয় বিবেচনায় রাখা আবশ্যক তা হলো নৌযানে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং সে জন্য নৌযানের ইঞ্জিন সার্বক্ষণিক চালু রাখা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বাংলাদেশের সামুদ্রিক যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান মৎস্য আহরণ কালে মৎস্য সরঞ্জাম যেমন- জাল বা বড়শি স্থাপন করার পর একটি নির্দিষ্ট স্থানেই স্থিরাবস্থায় ভাসতে থাকে। ফলে এ সমস্ত নৌযানকে পরিবীক্ষণ পদ্ধতির আওতায় নিরবচ্ছিন্নভাবে রাখতে হলে ইঞ্জিন চালুর জন্য জ্বালানি খরচ বেড়ে যাবে এবং অনেক ক্ষেত্রেই মৎস্যজীবীরা দ্বিধাগ্রস্ততায় পড়বে। এমতাবস্থায় ভাসমান বা স্থির নৌযানে ইঞ্জিন চালু রাখার পাশাপাশি বিকল্প শক্তি হিসেবে নৌযানে সৌরশক্তির ব্যবহারের সুযোগ রাখার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী দেশ বিওবিপি-আইজিও এর সদস্যরাষ্ট্র ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের **অ্যাসোসিয়েশন অব টুথ্রু ডীপ সী গোয়িং ফিসারিজ** এর অভিজ্ঞতাকে কাজে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এতে করে মৎস্য নৌযানে ব্যবহৃত জ্বালানি খরচের সাশ্রয় হবে এবং সামুদ্রিক পরিবেশ দূষণমুক্ত থাকবে।

চিত্র: ঢাকাস্থ মৎস্যবাজারে পরিচালিত জরিপ কার্যক্রম

উপসংহার (Conclusion)

বিওবিপি-আইজিও বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী দেশসমূহের মাঝে সমন্বয়ের মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্য সেক্টরের স্থিতিশীল উন্নয়ন এবং উপকূলীয় মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিতকরণসহ পরিবেশগত নিরাপত্তা প্রদানে দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণ পদ্ধতির প্রতিষ্ঠায় সদস্য দেশসমূহকে সহায়তাকরণের কাজ করে যাচ্ছে এবং ইতোমধ্যেই বেশ কিছু প্রভাব দৃশ্যমান হয়েছে। উপকূলীয় এলাকার মৎস্যজীবীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে কার্যকর ও ফলপ্রসূ উদ্যোগ গ্রহণের জন্য চলমান এ কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা জরুরি এবং আশা করা যায় সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে চলমান এ কার্যক্রমটি স্থায়িত্বশীল হবে।

[১] পরিচালক, বে অব বেঙ্গল প্রোগ্রাম ইন্টার-গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন, চেন্নাই, ভারত (yugrajyadava@bobpigo.org)
[২] ফিসারিজ রিসোর্স অফিসার, বিওবিপি-আইজিও, চেন্নাই, ভারত
[৩] পলিসি অ্যানালিস্ট, বিওবিপি-আইজিও, চেন্নাই, ভারত

অতিআহরণ : সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় একটি অন্তরায়

Overfishing of Marine Fisheries : A Threat to Sustainable Conservation and Management

নাসিরউদ্দিন মোঃ হুমায়ূন[১] ও বিক্রম জীৎ রায়[২]

Abstract

Overfishing occurs when fish and other marine species exploited faster than they can reproduce. According to FAO, a total of almost 80% of the world's fisheries are over-exploited, depleted or in a state of collapse due to overfishing and excessive fishing capacity. Overfishing can reduce the spawning biomass below desired levels affecting maximum sustainable or economic yield vis-à-vis destroying biodiversity. Overfishing increases the vulnerability of ocean ecosystems and may contribute to the decline of other marine species including birds and mammals. This situation aggravates with growing demand for seafood globally and together with dearth of science based conservation and management approach in place. In Bangladesh, growth and recruitment overfishing are severely impacts in replenishing most valued species into marine ecosystem. Reduction of active fishing days by commercial fishing boats and industrial trawlers along with restricting the fishing capacity can minimize overfishing. Management measures like the Monitoring, Control and Surveillance (MCS) system needs to be strengthened engaging all concerned stakes to restrict illegal and overfishing in view to restore and improve the resilience capacity of valued fish stocks. Through sustainable conservation and management of marine ecosystem the livelihoods of the teeming fishers' dependent on marine fisheries can be improved.

অতিমাত্রায় মৎস্য আহরণ (overfising) পৃথিবীর সামুদ্রিক পরিবেশের জন্য একটি অশনিসংকেত। ২০০২ সালে পৃথিবীর ৭২ ভাগ সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ আহরিত হয়েছে পুনরোৎপাদনের (reproduce) আগে অথচ সামুদ্রিক মৎস্য-সম্পদ সংরক্ষণের জন্য প্রতিটি মাছ কমপক্ষে একবার প্রজনন করার পর আহরিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সামুদ্রিক বাস্তুসংস্থানের (marine ecosystem) ওপর মৎস্য আহরণ কার্যক্রমের অনেক ঋণাত্মক প্রভাব রয়েছে। বাণিজ্যিকভাবে ব্যাপকহারে মৎস্য আহরণের ফলে মৎস্য মজুদ দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর সর্বমোট আহরণের এক চতুর্থাংশই অর্জিতব্য (targeted) প্রজাতি নয়, যার অধিকাংশই অপচয় হয়।

মজুদ বলতে কোনো একটি প্রজাতির এক গুচ্ছ মাছকে (subset of one species) বুঝায় যাদের বৃদ্ধি, মৃত্যুহার, প্রজনন এবং অন্যান্য শ্রেণিকরণ (taxonomic) বৈশিষ্ট্য একই রকম এবং এক বা একাধিক ভৌগোলিক এলাকায় বসবাস করে। একটি মজুদে সকল প্রজাতির মাছের সাধারণ কিছু বংশগত বৈশিষ্ট্য থাকে। ক্লাসিং (১৯৬৮)-এর মতে, মজুদ হচ্ছে কোনো একটি প্রজাতির একগুচ্ছ মাছ, যাদের একটি প্রজনন গ্রুপ (single spawning group) থাকে এবং পরিণত বয়সে বছরের পর বছর প্রবেশনে (recruit) অংশগ্রহণ করে থাকে।

জলাশয়ে মাছের প্রাকৃতিক এবং আহরণজনিত মৃত্যুর কারণে মাছের মজুদ কমে যায়। মাছের প্রাকৃতিক মৃত্যুহার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হলেও আহরণজনিত মৃত্যুহার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। মাছের প্রবেশন এবং মৃত্যুর (mortality) মধ্যে সমতা রক্ষা না করে অতিরিক্ত আহরণ করা হলে যে কোনো স্টক বা পপুলেশন ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। অন্যদিকে সমতা রক্ষা করে যে কোনো স্টক হতে বছরের পর বছর সর্বোচ্চ সহনশীল উৎপাদন (MSY) লাভ করা সম্ভব এবং অনন্তকাল ধরে এ সম্পদ আহরণ সম্ভব। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য মজুদ নিরূপণ অত্যাবশ্যক। মাছের মজুদ নিরূপণের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে আহরণজনিত মৃত্যুহার ও প্রবেশনের মধ্যে সমতা রক্ষা করা; স্টক হতে সর্বোচ্চ সহনশীল পর্যায়ে উৎপাদন লাভ এবং ঐ স্টকের ব্যবস্থাপনা কৌশল নির্ধারণ।

FAO এর হিসেব মতে, অতিআহরণের ফলে পৃথিবীর মৎস্য মজুদের প্রায় ৮০ শতাংশ মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন। দীর্ঘদিন যাবৎ অধিক চাহিদাসম্পন্ন বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য প্রজাতিসমূহ (high demand species) অপরিণত অবস্থায় অতিমাত্রায় আহরিত হওয়ার ফলে পৃথিবীর মৎস্য প্রজাতির বিন্যাসে (composition) বড় রকমের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। আকারে ছোট এবং কম অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পন্ন প্রজাতির প্রাচুর্যতার আধিক্য পরিলক্ষিত হলেও গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতির প্রাচুর্যতা কমে যাচ্ছে এবং প্রাপ্ত প্রজাতির আকারও ছোট হয়ে যাচ্ছে। বঙ্গোপসাগরে প্রাপ্ত রূপচান্দা, দাতিনা, লাক্ষা, রাঙা-চউখ্যা, গুটি পোয়া, বাগদা চিংড়ি ইত্যাদি বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন প্রজাতির উপস্থিতি বর্তমানে স্বল্প এবং আকারেও ছোট। বর্তমানে সারডিন জাতীয় কম বাণিজ্যিক গুরুত্ব সম্পন্ন মাছের আধিক্য দেখা যাচ্ছে। অথচ আশির দশকে বাণিজ্যিক মৎস্য ট্রলারসমূহে ক্লুপিডি পরিবারভুক্ত সারডিন মাছের উপস্থিতি মাত্র ৩.৫৩ থেকে ৬.২৭ ভাগ (অনুসন্ধানী ক্রুজ রিপোর্ট ২ ও ৩) থাকলেও বর্তমানে এদের আহরণ হার প্রায় ৪৭-৫৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে যা অবশ্যই গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় এনে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাপনা কৌশল গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অতিআহরণ (overfising)

অতিরিক্ত মৎস্য আহরণ প্রচেষ্টা কিংবা অন্য কোনো কারণে কোনো মজুদ হতে ছোট-বড় সকল আকারের মাছের নির্বিচার আহরণই হলো অতিআহরণ। এর ফলে গতিশীল একটি মৎস্য মজুদের অধঃপাত (degradation) ঘটে। এক কথায় বলা যায়, অতিমাত্রায় আহরণ হলো সাগরের সহনশীল মাত্রার অধিক মৎস্য আহরণ।

চিত্র: মৎস্য ট্রলার কর্তৃক আহরিত বিভিন্ন প্রজাতির মাছ

একটি বাণিজ্যিক এবং অবাণিজ্যিক ফিসারি হতে অনেক বেশি মাত্রায় মাছ কিংবা ডিমওয়ালা মাছ আহরণের ফলে ঐ ফিসারিতে মৎস্য মজুদ কমে যায় কিংবা মৎস্য শূন্য হয়ে পড়ে। যার ফলে প্রজননের মাধ্যমে মূল মজুদ ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয় না। অতিআহরণ একটা ফিসারিকে সর্বোচ্চ ধারণ ক্ষমতায় (carrying capacity) পৌঁছাতে বাধার সৃষ্টি করে। অতিআহরণের ফলে মৎস্য প্রজাতি তাদের সংখ্যা ও ওজনে সহনশীল পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে না। ফলে মাছের মজুদ দিন দিন কমতে থাকে।

অতিআহরণের প্রকারভেদ (Types of overfishing)

সামুদ্রিক পরিবেশে নিম্নবর্ণিত অতিআহরণ হয়ে থাকে:

১. বর্ধন অতিআহরণ (Growth overfishing);
২. প্রবেশন অতিআহরণ (Recruitment overfishing);
৩. বাস্তুসংস্থান অতিআহরণ (Ecosystem overfishing);
৪. জৈবিক অতিআহরণ (Biological overfishing); এবং
৫. অর্থনৈতিক বা জৈব অর্থনৈতিক অতিআহরণ (Economic or bio-economic overfishing)।

১. বর্ধন অতিআহরণ (Growth overfishing): অতিরিক্ত মৎস্য আহরণ প্রচেষ্টা কিংবা ছোট ফাঁসের জাল/জালের কড প্রান্তে একাধিক জাল ব্যবহার করে বর্ধনশীল অবস্থায় অর্থাৎ আহরণযোগ্য আকারে পৌঁছার পূর্বেই নির্বিচারে অতিমাত্রায় মৎস্য আহরণই হলো বর্ধন অতিআহরণ। কোনো মৎস্যকূলে প্রতিবছর গড়ে একক পরিমাণ থেকে উৎপাদনে একটি নির্দিষ্ট আকারের যে পরিমাণ মৎস্য সংযোজন বা প্রবেশন ঘটে তার চেয়ে ছোট আকারের মৎস্য আহরণ করা হলে তাকে বর্ধন অতিআহরণ বলে। যখন বর্ধন অতিআহরণ ঘটে তখন মোট উৎপাদন কম হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জাটকা আহরণ ইলিশের জন্য বর্ধন অতিআহরণ।

২. প্রবেশন অতিআহরণ (Recruitment overfishing): কোনো মৎস্য মজুদ হতে মৎস্য আহরণের হার বৃদ্ধির ফলে ডিমওয়ালা মাছ নির্বিচারে অতিমাত্রায় আহরণই হলো প্রবেশন অতিআহরণ। প্রবেশন অতিআহরণ তখনই ঘটে যখন পূর্ণবয়স্ক মৎস্য সংখ্যা (spawning biomass) একটা পর্যায়ে কমতে থাকে অর্থাৎ এরা প্রজননক্ষম পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। পর্যাপ্ত পূর্ণবয়স্ক মাছ না থাকায় ছোট পোনা (offspring) উৎপাদন হয় না। একটা কাঙ্ক্ষিত (target) পর্যায় পর্যন্ত প্রজননক্ষম মাছের মজুদ সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে অতিআহরিত সংখ্যা পুনঃমজুদ হয়ে থাকে। প্রবেশন অতিআহরণ আইন প্রয়োগ করে কিংবা আনুপাতিক কোটায় (quotas) আহরণ নির্ধারণ করে কিংবা সর্বনিম্ন আহরণ দ্বারা পুনঃমজুদে ফিরিয়ে আনা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মা মাছ (brood) আহরণ হলো প্রবেশন অতিআহরণ।

৩. বাস্তুসংস্থান অতিআহরণ (Ecosystem overfishing): বাস্তুসংস্থান অতিআহরণ তখনই ঘটে যখন অতিআহরণের ফলে বাস্তুসংস্থানের ভারসাম্য নষ্ট হয়। বর্তমানে চিংড়ি ট্রলার দ্বারা বটম ট্রলিং এর ফলে সাগরের তলদেশ সমান হয়ে যাওয়ার কারণে চিংড়ি/মাছের প্রজনন ও আশ্রয়স্থল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বড় শিকারী প্রজাতির প্রাচুর্যতা হ্রাস পাওয়া ও ছোট প্রাণিকূলের (forage) প্রাচুর্যতা বৃদ্ধির ফলে বাস্তুসংস্থানের ভারসাম্য নষ্ট (ecosystem imbalance) হয় যার কারণে ছোট মৎস্য প্রজাতিসমূহ প্রভাবিত হয়।

৪. জৈবিক অতিআহরণ (Biological overfishing): জৈবিক অতিআহরণ তখনই ঘটে যখন আহরণজনিত মৃত্যুহার এমন একটা স্তরে পৌঁছে, যেখানে মজুদ বায়োমাস এর বৃদ্ধির হার কমে যাওয়ার (negative marginal growth) সংকেত দেয়। ফলে মৎস্য প্রজাতির মজুদ থেকে দ্রুত অতিআহরণের কারণে মজুদে প্রজননের মাধ্যমে পুনঃপ্রবেশন হার হ্রাস পাবে। যদি পুনঃপ্রবেশনের এ অবস্থা দীর্ঘসময় চলতে থাকে তা হলে প্রবেশন হার কমে আসবে এবং মজুদ সংখ্যা হ্রাস পাবে।

৫. অর্থনৈতিক বা জৈব-অর্থনৈতিক অতিআহরণ (Economic or bio-economic overfishing): অর্থনৈতিক অতিআহরণকে বিবেচনা করা হয় মৎস্য আহরণের খরচ হিসেবে যখন আশানুরূপ বা সন্তোষজনক আহরণ না হয়। এ কাঠামোর অধীনে একটা ফিসারিকে বিবেচনা করা হয় অতিআহরণ হিসেবে (overfished) যখন আহরণ মাত্রা সর্বোচ্চ সহনশীল উৎপাদন অতিক্রম করে, যেখানে সম্পদ সংগ্রহের ব্যয় সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিদ্যমান থাকে। মৎস্যসমূহ যদি মৎস্য শিকার এলাকা (fishery) থেকে দ্রুততার সাথে সরিয়ে নেয়া হয় তবে লাভজনকভাবে ফিসারি অনুকূল অবস্থায় থাকবে।

বঙ্গোপসাগরে মাছের মজুদ ও সর্বোচ্চ সহনশীল আহরণ (Fish stock and its MSY in the Bay of Bengal)

বঙ্গোপসাগরে সামুদ্রিক মৎস্য বা চিংড়িসম্পদ মজুদের পরিমাণ ও সর্বোচ্চ আহরণ মাত্রা নিরূপণের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে গৃহীত মজুদ নিরূপণ কার্যক্রমের মাধ্যমে কিছুটা ধারণা পাওয়া গেলেও বিভিন্ন জরিপের ফলাফলে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়েছে। এসব জরিপ ফলাফলে মজুদ ও সর্বোচ্চ আহরণের পরিমাণ বিষয়ে নিম্নসারণি হতে ধারণা পাওয়া যায়:

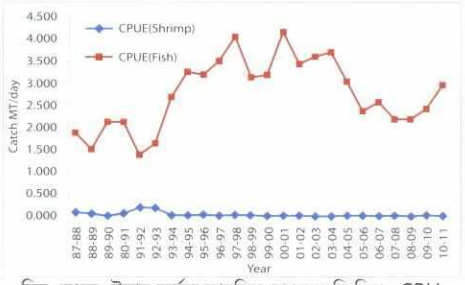

চিত্র: মৎস্য ট্রলার কর্তৃক আহরিত মৎস্য ও চিংড়ির CPU

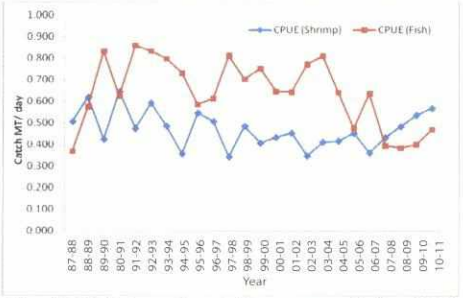

চিত্র: চিংড়ি ট্রলার কর্তৃক আহরিত মৎস্য ও চিংড়ির CPU

উল্লিখিত জরিপসমূহের ফলাফল পূর্বের এবং সামুদ্রিক মাছের মজুদ ও সর্বোচ্চ আহরণের পরিমাণ বিষয়ে হালনাগাদ কোনো জরিপ তথ্য নেই। কিন্তু সাগরে মৎস্য বা চিংড়ি আহরণের চাপ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী বঙ্গোপসাগরে ৩৫টি চিংড়ি ট্রলারসহ মোট ২০২টি ট্রলার এবং প্রায় ৪৬,০০০ যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক মৎস্য নৌযান মৎস্য/চিংড়ি আহরণে নিয়োজিত রয়েছে। ২০১০-১১ সালে আহরিত সামুদ্রিক মৎস্যের পরিমাণ ৫.৪৬ লক্ষ মে.টন। বর্তমানে সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদনের ৪৭-৫৫ ভাগ হচ্ছে সারডিন বা আইলা বা কাউয়া।

এ সব মাছ উচ্চ অভিপ্রয়াণশীল পেলাজিক মাছ। উপরে বর্ণিত জরিপকালীন তলদেশীয় মাছের প্রজাতিসমূহের প্রাচুর্যতা বর্তমানে চোখে পড়ার মত নেই। বর্তমানে প্রাপ্ত এসব মাছের আকার ছোট হলেও মাছের ঘন ঘন স্কুল পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং এগুলো বিলুপ্তপ্রায় এবং বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ মাছের প্রতিস্থাপন (replacement) কিনা, গবেষণা প্রয়োজন। তাছাড়া বিগত ২৪ বছরের আহরণ তথ্য-উপাত্ত থেকে দেখা যায়, ট্রলার বহরে আধুনিক ট্রলার সংযোজন, মৎস্য নৌযানের সংখ্যা বৃদ্ধি, মাছ ধরার দিনের সংখ্যা বৃদ্ধি ও সর্বোপরি ক্যাচ ইফোর্ট বৃদ্ধির কারণে উৎপাদনের গতি ঊর্ধ্বমুখী। সুতরাং হালনাগাদ মজুদ ও সর্বোচ্চ আহরণের পরিমাণ সংক্রান্ত জরিপ তথ্য না থাকায় নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না যে, বঙ্গোপসাগরে অতিআহরণ হচ্ছে কিন্তু আহরণ তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে অতিআহরণের লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতির প্রাপ্তি কমে যাওয়া, প্রাপ্ত প্রজাতির আকার ছোট হওয়া, বাণিজ্যিকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতির প্রাপ্তি বেড়ে যাওয়া, অর্জিতব্য প্রজাতির প্রাপ্তি কমে যাওয়া, প্রতিদিন মাছ/চিংড়ি প্রাপ্তির হার (CPUE) এর প্রবণতা নিম্নগামী হওয়া ইত্যাদি। মৎস্য ট্রলার কর্তৃক আহরণ ও CPUE বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি হতে CPUE বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ২০০০ সাল থেকে আধুনিক মৎস্য ট্রলার সংযোজনের ফলে CPUE আরও ঊর্ধ্বমুখী হতে থাকে। চিংড়ি ট্রলার কর্তৃক আহরণ ও CPUE বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, চিংড়ি আহরণ ও CPUE অনেকটা উঠানামা (CPUE) করছে।

সারণি: সামুদ্রিক মৎস্য মজুদ নিরূপণের জরীপ ফলাফল

বছর	জাহাজ/ এজেন্সি	মজুদ প্রকৃতি	মজুদ (লক্ষ মে.টন)	এমএসওয়াই (লক্ষ মে.টন)
১৯৭৩	ড. ওয়েস্ট	ডিমার্সাল মাছ	২.৬৪-৩.৭৩	১.৭৫
১৯৭৮-৭৯	ড. ফ্রিডজ্জফ নানসেন	ডিমার্সাল মাছ	১.৬০	১.০০
১৯৮১-৮৩	আরভি অনুসন্ধানী	ডিমার্সাল মাছ	১.৫২	০.৪০-০.৫০
১৯৮৪-৮৫	আরভি অনুসন্ধানী (ল্যাম্বুফ)	ডিমার্সাল মাছ	১.৮৮	০.৪৮-০.৮৯
১৯৭৮-৭৯	ড. ফ্রিডজ্জফ নানসেন	পেলাজিক মাছ	০.৬০-১.২০	-
১৯৮৩, ১৯৮৫	ড. পেন, রশিদ, হোয়াইট ও খান	চিংড়ি	০.০৩-০.০৪	০.০৬-০.০৭

কাজেই অতি আহরণের লক্ষণসমূহ বিবেচনায় এনে হালনাগাদ মজুদ ও সর্বোচ্চ আহরণ মাত্রা নিরূপণ সংক্রান্ত জরিপ কার্যক্রমের ফলাফলের ভিত্তিতে অতিআহরণ হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত হয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া অতীব জরুরি।

অতিআহরণের সম্ভাব্য প্রভাব (Impacts of overfishing)

বিশ্বব্যাপী সামুদ্রিক পরিবেশে অতিমাত্রায় আহরণ একটি বড় ধরনের সমস্যা। বিশ্বের অনেক দেশ অতিআহরণ করে সমুদ্রের মৎস্যভাণ্ডার শূন্য করে ফেলেছে। আমাদের বঙ্গোপসাগর অতিআহরণের সর্বগ্রাসী শিকারে পরিণত হওয়ার আগেই আমাদেরকে সতর্ক হতে হবে। অতিআহরণের কারণে তাৎক্ষণিক এবং দীর্ঘমেয়াদী যেসব প্রভাব পড়তে পারে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- অতিআহরণের কারণে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীগণ (small-scale fishers) জীবিকা হারিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

পরবর্তীতে আর্টেমিয়া খাবার হিসেবে দেয়া হয়। যেহেতু ভেটকি এক প্রজনন মৌসুমে একাধিকবার ডিম দিয়ে থাকে সেহেতু একই ডিমওয়ালা মাছ ৫ থেকে ৬ মাস পর্যন্ত পূর্ণিমা এবং অমাবস্যায় ডিম সংগ্রহ করা যায়।

ভেটকি চাষ পদ্ধতি (Culture system of vetki)

ভেটকি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশেই মৃদু লোনা পানি, স্বাদুপানি ও সামুদ্রিক পানিতে খাঁচায় বাণিজ্যিকভাবে চাষ হচ্ছে। পানির পিএইচ ৭.৫ -৮.৫, দ্রবীভূত অক্সিজেন ৪-৯ পিপিএম, লবণাক্ততা ১০-৩০ পিপিটি এবং তাপমাত্রা ২৬-৩২° সেন্টিগ্রেড ভেটকি চাষের জন্য উপযুক্ত। সাধারণত ৬-২৪ মাস চাষের মাধ্যমে প্রতিটি মাছের গড় ওজন ৩৫০ গ্রাম থেকে ৩ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। ভেটকি মাংসাশী হওয়ায় মজুদকৃত মাছের ওজনের ৭-১০% হারে সকালে ও বিকালে কম দামি মাছ (ট্রাস ফিস) ব্যবহার করা হয়। স্বভোজী স্বভাবের জন্য মৃত্যুহার বেড়ে যায়। এ সমস্যা সমাধানে দু'ধাপে ছোট-বড় আলাদা করে ভেটকি চাষ করা বাঞ্ছনীয়, যেমন- নার্সারি ধাপ এবং গ্রো-আউট ধাপ।

১. **নার্সারি ধাপ** (Nursery stage): এ ধাপে ১-২.৫ সেমি আকারের রেণুকে জুভেনাইল মাপের তৈরি করা হয়। নার্সিং এর পরে জুভেনাইলগুলোকে বিভিন্ন গ্রেড অনুসারে বিভিন্ন পুকুরে মজুদ করা যেতে পারে। যে সব জুভেনাইলকে লালন করা হয় তাদের বৃদ্ধি এবং বেঁচে থাকার হার, যাদেরকে সরাসরি গ্রো-আউট পুকুরে রাখা হয়েছিল তাদের চেয়ে বেশি।

২. **গ্রো-আউট ধাপ** (Grow-out stage): ভেটকি জুভেনাইল থেকে বাজারজাতকরণযোগ্য আকার করা পর্যন্ত গ্রো-আউট ধাপের বিস্তৃতি। আন্তর্জাতিক বাজারে ৭০০-১,২০০ গ্রাম মাছের চাহিদা সর্বাধিক।

পুকুরে চাষ পদ্ধতি (Pond culture system)

যদিও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়ায় ২০ বছর ধরে পুকুরে ভেটকি চাষ করা হচ্ছে কিন্তু এখনও বাণিজ্যিকভাবে এর প্রসার হয়নি। বাজারে চাহিদা থাকায় এবং লাভজনক হওয়ায় বর্তমানে কিছু দেশে ঈষৎ লবণাক্ত জলের পুকুরে ভেটকি চাষের প্রচলন শুরু হয়েছে। পুকুরে চাষের ক্ষেত্রে মজুদ ঘনত্ব ৩০,০০০ পোনা/হেক্টর এবং ৬ মাছের চাষে প্রতিটি মাছ গড়ে ৩৫০-৫০০ গ্রাম ওজনের হয়ে থাকে। চাষ ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে হেক্টর প্রতি ৫-৬ মে.টন মাছ উৎপাদন সম্ভব এবং মোট বিনিয়োগের দেড় থেকে দ্বিগুণ মুনাফা অর্জন করা যায়। রেণু সরবরাহ বৃদ্ধি, সুবিধাজনক জায়গা, পরিকল্পিত খামার ও উন্নত চাষ পদ্ধতি পুকুরে ভেটকি চাষকে সফলতার মুখ দেখাতে পারে। ভেটকি পুকুরে দু'ভাবে চাষ করা হয়। যথা-

ক. **একক চাষ পদ্ধতি** (Monoculture system): একক চাষ সম্পূর্ণভাবে সম্পূরক খাদ্যের ওপর নির্ভরশীল। সম্পূরক খাদ্য হিসেবে তাজা মাছের (ট্রাস ফিস) সরবরাহ কম এবং মূল্য অনেক বেশি হওয়ায় মুনাফা সর্বনিম্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

খ. **মিশ্রচাষ পদ্ধতি** (Polyculture system): এক্ষেত্রে ভেটকি মাছ খাবার হিসেবে ব্যবহার করতে পারে এমন দ্রুত প্রজননক্ষম ও বর্ধনশীল মাছ চাষ করে কৃষকের ট্রাস ফিসের নির্ভরতা কমিয়ে সফলতা অর্জন করা যায়। যে সব মাছ পুকুরে উৎপাদিত খাদ্য ব্যবহার করতে পারে ও অবিরতভাবে বংশবৃদ্ধি করার ক্ষমতা আছে এবং ভেটকির সাথে খাদ্যের জন্য প্রতিযোগিতা করে না, সে সব মাছকে বিশেষ করে তেলাপিয়া ও নাইলোটিকা মিশ্রচাষের জন্য নির্বাচিত করা হয়।

খাঁচায় চাষ পদ্ধতি (Cage culture system)

থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, হংকং ও সিঙ্গাপুরে ব্যাপক হারে খাঁচায় ভেটকি মাছ চাষ করা হয়। সাধারণত ২০-১০০ ঘনমিটারের বর্গাকার বা আয়তাকার খাঁচা পছন্দসই। কারণ এগুলো বানানো, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সহজ। ভেটকির খাঁচা সাধারণত ২-৮ সেমি ফাঁস বিশিষ্ট পলিথিন নেট দ্বারা তৈরি। প্রতি ঘনমিটারে মজুদ ঘনত্ব সাধারণত ২০-৪০টি। জোয়ার ভাটা, পানি প্রবাহ ও ঢেউ এর প্রভাব কম, রক্ষণাবেক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ সহজ, শিল্প-কারখানার বর্জ্য ও রাসায়নিক দ্রব্য, কীটনাশকের প্রভাবমুক্ত এমন স্থানে খাঁচা স্থাপন করা প্রয়োজন। ভেটকি চাষে দুই ধরনের খাঁচা ব্যবহৃত হয়। যথা-

ক. **ভাসমান খাঁচা** (Floating cage): সাধারণত ভাসমান পদার্থ যেমন- ধাতব, প্লাস্টিক, স্টাইরোফোম ড্রাম অথবা বাঁশ দ্বারা খাঁচাকে ভাসমান রাখা হয়। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য ৫০ ঘনমিটার আয়তনের খাঁচা সর্বাধিক উপযোগী।

চিত্র: ভাসমান খাঁচায় ভেটকি চাষ

খ. **স্থির খাঁচা** (Fixed cage): এ পদ্ধতিতে খাঁচাটি চারধারে অবস্থিত খুঁটির সাথে আবদ্ধ থাকে। সাধারণত অগভীর পানিতে এগুলো সহজে স্থাপন করা যায়। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে কম খরচে খাঁচায় চাষ এবং পেনকালচার করা সম্ভব। এক্ষেত্রে বর্তমানে চাঁদপুর জেলার ডাকাতিয়া নদীতে ব্যাপক হারে তেলাপিয়া চাষের মডেল অনুসরণ করা যেতে পারে।

- বৃদ্ধির হার বেশি হওয়ায় ৬ মাস থেকে ২ বছরে এটি বাজারজাতযোগ্য (৩৫০ গ্রাম- ৩ কেজি) হয়ে ওঠে;
- উচ্চ প্রজনন ক্ষমতার জন্য একটি মাঝারি আকারের হ্যাচারি পরিচালনার জন্য অল্প পরিমান ব্রুড মাছই যথেষ্ট;
- ভেটকির পোনা এবং প্রাপ্ত বয়স্ক মাছগুলো সহজেই বিভিন্ন ধরনের তৈরিকৃত খাবারে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে; এবং
- মাছটির স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য বেশি হওয়ায় চাষ করা অধিক লাভজনক।

ভেটকি মাছের জীবন বৃত্তান্ত (Life cycle of vetki)

ভেটকি মাছ মূলত ক্রাস্টাসিয়া, মোলাস্কা, ছোট মাছের পোনা (স্বজাতির পোনা) এবং জুপ্লাংকটন খাবার হিসেবে গ্রহণ করে। প্রাপ্ত বয়স্ক মাছগুলো মাংসাশী হলেও পোনা মাছগুলো সর্বভূক স্বভাবের। ভেটকির জীবনের বেশির ভাগ সময় (২-৩ বছর) সমুদ্রের সাথে সংযুক্ত নদীতে বা স্বাদুপানিতে বাস করে। পূর্ণবয়স্ক (৩-৪ বছর) মাছ জননাঙ্গের পরিপক্কতা এবং ডিমপাড়ার জন্য নদী থেকে সাগরের দিকে ৩০-৩২ পিপিটি লবণাক্ততার পানিতে অভিপ্রয়াণ করে। এরা প্রায় সারা বছর ডিম দিলেও (Kungvankij, ১৯৮১) এপ্রিল থেকে আগস্ট পর্যন্ত এদের মূল প্রজননকাল হিসেবে বিবেচিত হয়। কারণ এসময়ে ১ সেমি আকারের অসংখ্য পোনা ধরা পড়ে (Bhatia and Kungvankij, ১৯৭১)। বর্ষার শুরুতে পুরুষ মাছ স্ত্রী মাছের সাথে মিলনের জন্য নদীর নিম্ন অববাহিকায় আসে। ভরা পূর্ণিমা বা অমাবস্যার শুরুতে সন্ধ্যার দিকে জোয়ারের পানি আসার সময় ৫-১০ কেজি ওজনের প্রতিটি স্ত্রী মাছ প্রায় ২১-৭১ লক্ষ ডিম পাড়ে। জোয়ারের পানিতে ভেসে ডিম ও রেণু পোনা নদীর মোহনায় চলে আসে।

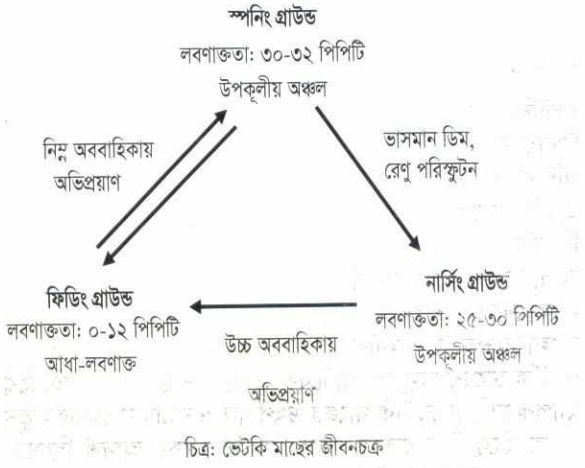

চিত্র: ভেটকি মাছের জীবনচক্র

মোহনা হতে রেণু পোনা নদীর উচ্চ অববাহিকার দিকে অভিপ্রয়াণ করে। পরবর্তীতে পূর্ণবয়স্ক অবস্থায় ডিম পাড়ার জন্য আবার সাগরের দিকে ফিরে যায়। এই মাছের একটি ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য হলো বেশির ভাগ মাছ পুরুষ মাছ হিসেবে প্রাপ্ত বয়স্ক হলেও স্ত্রী মাছের প্রাপ্যতা বা অনুপস্থিতিতে কমপক্ষে একটি প্রজনন ঋতুর পর লিঙ্গ পরিবর্তন করে স্ত্রী মাছ হিসেবে বহিঃপ্রকাশ করতে পারে (FAO, ১৯৯৯; Guiguen, ১৯৯৩)।

পোনা উৎপাদন প্রক্রিয়া (Fry production system)

ভেটকির পোনা প্রাকৃতিক উৎস-সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল এবং নদীর মোহনা থেকে সংগ্রহ করা যায়, কিন্তু বছরের বিভিন্ন সময়ে এদের প্রাপ্যতার তারতম্য হওয়ায় চাষ পদ্ধতি ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়াও প্রাকৃতিক পোনার স্বল্পতা মৎস্যচাষ পদ্ধতিকে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিতে পারে বিধায় কৃত্রিমভাবে পোনা উৎপাদন করা অতীব জরুরি। থাইল্যান্ডে ১৯৭১ সালে পরিপক্ক মাছের পেটে চাপ প্রয়োগে ডিম্ব সংগ্রহের মাধ্যমে সর্বপ্রথম ভেটকি মাছের কৃত্রিম প্রজনন করানো হয়। এরপর ১৯৭৩ সালে বদ্ধ পরিবেশে হরমোন ব্যবহারের মাধ্যমে বিজ্ঞানী Wongsonnuk ও Maneewongsa ভেটকি মাছের কৃত্রিম প্রজননে সফলতা অর্জন করেন। পরিবেশে বিভিন্ন নিয়ামকের প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে ১৯৮১ সালে বিজ্ঞানী Kungvankij কৃত্রিমভাবে পোনা উৎপাদন করতে সক্ষম হন।

কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি (Artificial breeding system)

ভেটকি মাছের কৃত্রিম প্রজনন প্রধানত দু'ভাবে সম্পন্ন করা হয়। যথা- (১) হরমোন ব্যবহার করে ও (২) পরিবেশের নিয়ামক পরিবর্তনের মাধ্যমে। সাধারণত যে হরমোন ব্যবহৃত হয় তা হলো নিম্নরূপ:

ক. পিউবারোজেন: পিউবারোজেন ৬৩ শতাংশ ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন (FSH) এবং ৩৪ শতাংশ লিউটেনাইজিং হরমোন (LH) দিয়ে গঠিত। পুরুষ ও স্ত্রী মাছকে যথাক্রমে ২০-৫০ ও ৫০-২০০ আইইউ/কেজি দেহ ওজনে ইনজেকশন প্রয়োগ করা হয়। স্ত্রী মাছকে প্রথম ইনজেকশনের ৪৮ ঘণ্টা পর দ্বিগুণ মাত্রায় দ্বিতীয় ইনজেকশন প্রয়োগ করা হয়।

খ. এইসসিজি (HCG) ও চাইনিজ কার্পের পিটুইটারি গ্লান্ড (PG): হিউম্যান কোরিওনিক গোনাডোট্রপিন (HCG) ২৫০-১০০০ আইইউইউ/কেজি ও চাইনিজ কার্পের পিজি ২-৩ মিলিগ্রাম/কেজি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ইনজেকশন প্রয়োগের বিরতিকাল পিউবারোজেন-এর অনুরূপ।

হরমোন প্রয়োগের ৩৬ ঘণ্টার মধ্যেই স্ত্রী মাছ ডিম দিয়ে থাকে এবং পরবর্তী ১৭-১৮ ঘণ্টার মধ্যে নিষিক্ত ডিম থেকে রেণু পোনা বের হয়। কুসুমথলি নিঃশেষিত হওয়ার পর প্রথম ৭ দিন রটিফার (*Brachionus plicatilis*) ও প্লাংকটন এবং

- সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের ওপর নির্ভরশীল শিল্প ও বাণিজ্য প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে দেশের সার্বিক অর্থনীতির ওপর বিরূপ প্রভাব পড়বে।
- মৎস্যখাতে জীবিকা নির্বাহে এত বিপুল সংখ্যক লোক কর্মহীন হয়ে শৃঙ্খলাবিহীন কর্মকাণ্ডে যুক্ত হলে বিভিন্ন সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে।
- অতিআহরণ অব্যাহত থাকলে সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতি ও জীববৈচিত্র্যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন বড় এবং দীর্ঘায়ু প্রজাতির মাছের প্রবেশন ও উৎপাদন কমে ছোট, স্বল্পায়ু ও কম দামী উপরিস্তরের মৎস্য প্রজাতির আধিক্য ঘটবে। এতে সামুদ্রিক মৎস্য সেক্টরে ট্রলিং শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
- দেশের বার্ষিক মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ২০ ভাগ আসে সমুদ্র হতে যার যোগান ব্যাহত হয়ে বাজারে মাছের সরবরাহ কমে যাবে এবং প্রাণিজ আমিষ ঘাটতি দেখা দিবে।
- অনির্বাচিত মৎস্য আহরণ সরঞ্জামের মাধ্যমে অতি-আহরণজনিত কারণে সামুদ্রিক কচ্ছপ, ডলফিন, সামুদ্রিক পাখি ইত্যাদি আক্রান্ত হয়ে সামগ্রিক ইকোসিস্টেমে বিরূপ প্রভাব ফেলবে।
- অতিআহরণজনিত কারণে সামুদ্রিক পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টিসহ মাছের জন্য অত্যাবশ্যকীয় প্রাকৃতিক খাদ্য শিকল নষ্ট করে উৎপাদন ব্যাহত করা।
- অতিআহরণে একটি ফিসারি প্রজননক্ষম মাছের সংখ্যা হ্রাস করে মাছের প্রবেশনে বিঘ্ন ঘটায় এবং স্থায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনায় অন্তরায় সৃষ্টি করে।

অতিআহরণ রোধে করণীয় (Measures require to reduce overfishing)

পৃথিবীর প্রায় ৫০ মিলিয়ন লোক (৩৫ মিলিয়ন জেলে গোষ্ঠীসহ) তাদের বাঁচার জন্য সরাসরি মৎস্য আহরণের ওপর নির্ভরশীল। জালের ফাঁস নিয়ন্ত্রণ আইন কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করে কিংবা ছোট ফাঁসের জাল ব্যবহার না করার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করলে কাঙ্ক্ষিত বা অনুমোদিত আকারের মাছ ধরা সম্ভব। এতে উৎপাদন ও রপ্তানি আয় অনেক বৃদ্ধি পাবে এবং জাল তৈরির খরচ, সময় ও মাছ ধরার সময় হ্রাস পাবে। বাজারে বড় মাছের সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে। মাছের আকার বড় হওয়ায় ডিম ধারণক্ষমতা বাড়বে, প্রজননের সুযোগ বাড়বে, প্রবেশন বৃদ্ধি পাবে এবং অধিক মাছ আহরণ করা সম্ভব হবে ফলশ্রুতিতে অতিআহরণ মাত্রা হ্রাস পাবে। সামগ্রিকভাবে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে:

- বাণিজ্যিক ট্রলার ও আর্টিস্যানাল বোটসমূহের মৎস্য আহরণ সময় (active fishing days) কমিয়ে আনা।
- জালের ফাঁসের আকার নিয়ন্ত্রণ আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়ন; কড প্রান্তে দুই বা ততোধিক স্তরের জাল ব্যবহার না করা।
- মৎস্য আহরণের ক্ষেত্রে কোটা (quotas) পদ্ধতি প্রণয়ন কিংবা বছরের কমপক্ষে তিন মাস মৎস্য আহরণ বন্ধ রাখা।
- ভরা প্রজনন মৌসুমে আহরণ বন্ধ রাখা, বিশেষ করে মধ্য জানুয়ারি থেকে মধ্য ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়ে চিংড়ি ট্রলার কর্তৃক আহরণ বন্ধ রাখা এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন মাছের বেলায়ও এটি প্রযোজ্য করা।
- ট্রলার ও আর্টিস্যানাল ফিসারিজের যান্ত্রিক নৌযানের সংখ্যা সীমিত রাখা।
- সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ ১৯৮৩ অনুযায়ী ট্রলার ও যান্ত্রিক নৌযানের জন্য নির্ধারিত এলাকায় মৎস্য আহরণ নিশ্চিত করা।
- আধুনিক ট্রলারবহরকে তাদের ট্রলার লাইসেন্সের শর্ত বা প্রকৃতি অনুযায়ী ফিসিং-এ বাধ্য করা।
- নিয়মিত বিরতিতে মজুদ নিরূপণের মাধ্যমে নিরাপদ পর্যায়ে মৎস্য আহরণ সীমাবদ্ধ করা।
- উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও নিয়ন্ত্রণ কৌশল প্রয়োগ করে বাই ক্যাচ রোধ করতে হবে।
- মাছের প্রজনন ও চারণক্ষেত্র, নাজুক সমুদ্রতল এবং অনন্য আবাসস্থল ক্ষতিকর হতে পারে এমন ক্ষতিকর পদ্ধতিতে মৎস্য আহরণ প্রতিরোধ করতে হবে।
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত উদ্যোগে এমসিএস (Monitoring, Control and Surveillance) পদ্ধতি জোরদারকরণপূর্বক আইইউইউ (Illegal, Unreported and Unregulated) ফিসিং নিয়ন্ত্রণ করা।

উপসংহার (Conclusion)

মৎস্যসম্পদ একটি জীবন্ত ও পরিবর্তনশীল এবং পুনর্ভরণ ও নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ। এ থেকে এমনভাবে সম্পদ আহরণ করতে হবে, যাতে পরবর্তী বংশবৃদ্ধি অব্যাহত রেখে স্থায়িত্বশীল মৎস্য আহরণ নিশ্চিত করা যায়। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের উন্নয়ন ও সংরক্ষণের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপুর্ণ বিষয় হলো সহনশীল পর্যায়ে আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা। সহনশীল আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার একটি অন্যতম টুল্‌স হলো মজুদ নিরূপণ ও সর্বোচ্চ কী পরিমাণ সম্পদ আহরণ (MSY) করা যায় তা নিরূপণের জন্য নিয়মিত জরিপ ও গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রয়োগ। অপরিকল্পিত আহরণ প্রক্রিয়ার ফলে সাগর মৎস্য শূন্য হয়ে যাওয়ার উদাহরণ পৃথিবীর অনেক দেশেই রয়েছে। আমাদের দেশেও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের বিগত ২৪/২৫ বছরের আহরণ তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করলে সাগরের মৎস্যসম্পদ অতিআহরণের প্রভাব সহজেই নিরূপণ করা যায়। আর সে আলোকে ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত হবে, কর্মসংস্থানের পরিসর বিস্তৃত হবে, আমিষ ঘাটতি পূরণ হবে এবং সর্বোপরি মৎস্য রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে।

[১] পরিচালক, সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ (nasir_dof@yahoo.com)
[২] বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

উপকূলীয় অঞ্চলে ভেটকি চাষ : সম্ভাবনার এক নতুন দিগন্ত

Vetki Culture in the Coast : A New Horizon in Aquaculture

ড. মোহাম্মদ নূরুল আবছার খান[১], মোঃ সাদেকুর রহমান খাঁন[২] ও মোঃ ফয়সাল[৩]

Abstract

The Sea bass, *Lates calcarifer* (Bloch, 1790), locally known as 'coral mach' in Bangladesh, is one of the most potential aquaculture species in Asia and Pacific countries. It is a catadromous fish having euryhaline and serially hermaphroditic in nature. Sea bass is an excellent source of high quality protein enriched with omega-3 and omega-6 fatty acids and good texture with less bone. Considering high market value and growth rate revealed its culture potentiality in wide range of habitats like freshwater ponds, brackish water and cage culture in coastal waters. It takes 6-24 months to gain 350-3000g body weight. Cannibalistic nature and demand for trash fish were found serious problems in Sea bass culture. In Bangladesh, Sea bass is usually harvested from estuaries, shrimp ghers and rivers in small amount. In spite of having high demand and congenial environment in Bangladesh, culture system has not yet developed. However, with the success of artificial propagation and development of culture technique, it can be a prospective candidate species for coastal aquaculture.

ভেটকি মাছ, *Lates calcarifer* (Bloch, ১৭৯০) এশিয়া অঞ্চলে Sea bass, অস্ট্রেলিয়ায় বারামুন্ডি এবং বাংলাদেশে 'কোরাল' ও 'ভেটকি' নামে পরিচিত। Latidae পরিবারের Perciformes বর্গের অন্তর্ভুক্ত এ মাছটির দেহ লম্বাটে, পার্শ্বীয়ভাবে চাপা, নিচের চোয়াল উপরের চোয়ালের তুলনায় সামান্য বড়, পিঠের দিক সবুজাভাব এবং পেটের অংশ রূপালি বর্ণের। ভেটকি মাছ উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চল বিশেষ করে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর এবং ভারত মহাসাগরের ৫০° পূর্ব থেকে ১৬০° পশ্চিম অক্ষাংশ এবং ২৪° উত্তর থেকে ২৫° দক্ষিণ দ্রাঘিমাংশে বিস্তৃত। এছাড়াও এশিয়ার উত্তরাঞ্চল, কুইন্সল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চল এবং পূর্ব আফ্রিকার পশ্চিমাঞ্চল জুড়েও এদের বিস্তৃতি রয়েছে (FAO, ১৯৭৪)। ভেটকির পুষ্টিগুণ, স্বাদ ও উচ্চ বাজার মূল্যের জন্য ভেটকি চাষ বড় ছোট সব ধরনের চাষিদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। এ বিবেচনায় প্রায় ৪০ বছর পূর্বেই থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, হংকং, অস্ট্রেলিয়া ও তাইওয়ানের উপকূলীয় ও স্বাদুপানির পুকুরে, নদীতে ও মোহনায় খাঁচা পদ্ধতিতে বাণিজ্যিকভাবে ভেটকি চাষাবাদ শুরু হয়েছে। আমাদের দেশে সাধারণত বেড় জাল, ফাঁস জাল, তলদেশীয় ট্রলনেট ব্যবহার করে বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকা যেমন- চট্টগ্রাম, বরিশাল, খুলনা, পটুয়াখালীর উপকূলীয় অঞ্চলের নদীর মোহনা (Rahman, ১৯৮৯), নদীতে এমনকি চিংড়ির ঘেরেও এই মাছ পাওয়া যায়।

ভেটকি মাছে উন্নতমানের আমিষ এবং ওমেগা-৩ ও ওমেগা-৬ ফ্যাটি এসিড বিদ্যমান যা আমাদের দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, হৃদরোগের ঝুঁকি কমায় এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে। মাছটিতে অতি প্রয়োজনীয় ভিটামিন এ, বি ও ডি; খনিজ পদার্থ যেমন- ক্যালসিয়াম, জিঙ্ক, লৌহ, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও সিলেনিয়াম পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে, যা দেহ গঠন ও শারীরবৃত্তীয় কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভেটকি মাছ উচ্চ প্রজননক্ষম হওয়ায় বছরে প্রায় ৬০-৭০ লক্ষ ডিম দেয়। এটি অভিপ্রয়াণশীল ও উচ্চলবণাক্ততা সহিষ্ণু প্রজাতির মাছ।

চিত্র: ভেটকি মাছ

বাংলাদেশে ভেটকি চাষের সম্ভাবনা
(Prospects of vetki culture in Bangladesh)

ভেটকি মাছের অতুলনীয় স্বাদ, পুষ্টিগুণ ও স্বল্প কাঁটার উপস্থিতির জন্য দেশে-বিদেশে এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্বাদু ও উপকূলীয় অঞ্চলে ভেটকির চাষ একটি ব্যাপক সম্ভাবনাময় ও লাভজনক পেশা হিসেবে বিবেচিত। এই মাছ যেহেতু স্বাদুপানি এবং উপকূলীয় আধা-লবণাক্ত ও লবণাক্ত অঞ্চলে চাষ করা সম্ভব, তাই বাংলাদেশে এর চাষাবাদ এলাকার পরিধিও বেশি। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে নদনদীর আধিক্য, ভেটকি চাষের অনুকূল পরিবেশ এবং অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বে ব্যাপক চাহিদা ভেটকি মাছের উৎপাদন ও রপ্তানির ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করতে পারে। মৎস্য চাষের আদর্শ হিসেবে ভেটকির কিছু অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো নিম্নরূপ:

- লবণ সহিষ্ণু হওয়ায় নদী, মোহনা ও উপকূলীয় জলাভূমিতে সহজে চাষযোগ্য;
- মাছটি বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশে সহজে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম এবং অত্যধিক ঘনত্বে চাষযোগ্য;

ভেটকি চাষে সমস্যা (Problems in vetki culture)

- প্রাকৃতিক উৎসে পোনার স্বল্পতা এবং ভেটকি মাছের কৃত্রিম প্রজননে অসফলতা;
- রাক্ষুসে এবং স্বজাতিভোজী বৈশিষ্ট্যের জন্য ভেটকি চাষের ক্ষেত্রে মৃত্যুর হার অনেক বেড়ে যায়; এবং
- ট্রাস ফিস সরবরাহ অপ্রতুল এবং ব্যয়বহুল।

চিত্র: স্থির খাঁচায় ভেটকি চাষ

সমস্যা সমাধানে করণীয় (Steps to solve problems)

ভেটকি চাষের অনেক সমস্যা থাকা সত্ত্বেও থাইল্যান্ডের মৎস্যবিজ্ঞানীগণ কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদনে সফলতা অর্জন করেছেন প্রায় চার দশক আগেই এবং হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনার মান প্রাকৃতিক উৎস হতে পোনার মানের সমতুল্য বলেও প্রমাণিত হয়েছে। ফলে পর্যাপ্ত পোনা সরবরাহ থাকায় ভেটকি মাছের চাষ থাইল্যান্ডসহ পৃথিবীর অনেক দেশেই বাণিজ্যিকভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এবং প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। বাংলাদেশে উপকূলীয় অঞ্চলে ভেটকি চাষের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদনে পিছিয়ে থাকায় ভেটকি চাষের সম্প্রসারণ সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ও ব্র্যাক ভেটকি মাছের পোনা উৎপাদন ও চাষের চেষ্টা করলেও এখন পর্যন্ত তা কাঙ্ক্ষিত সফলতা পায়নি। অমিত সম্ভাবনার এ মাছটির হ্যাচারিতে পোনা উৎপাদন এবং চাষ পদ্ধতি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য অতি শীঘ্রই গবেষণা ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত।

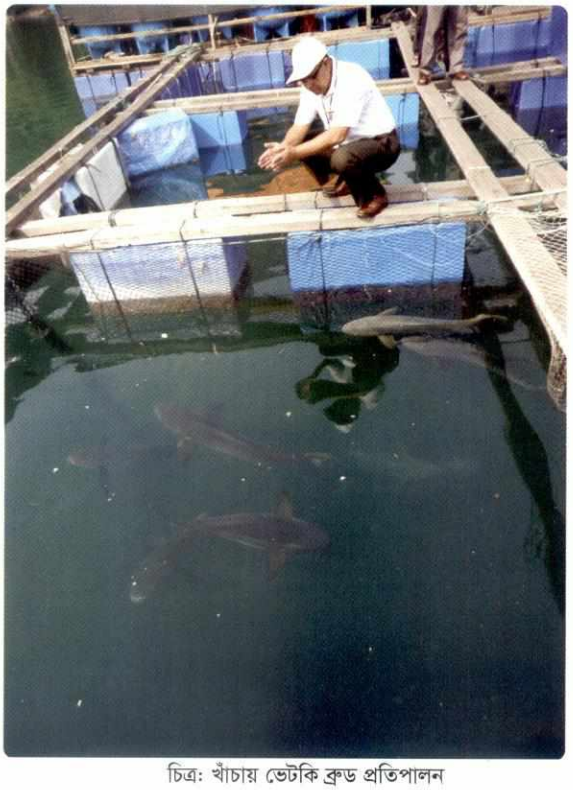

চিত্র: খাঁচায় ভেটকি ব্রুড প্রতিপালন

উপসংহার (Conclusion)

মাঠ পর্যায়ে ভেটকি মাছ চাষের ব্যাপক আগ্রহ থাকায় মৎস্য অধিদপ্তরাধীন সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর এবং বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের অভিজ্ঞতা ও সহযোগিতা কাজে লাগিয়ে ভেটকি চাষে অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে সম্ভাব্য সমস্যাদি চিহ্নিত করে চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদে ভবিষ্যতে নিম্নোক্ত গবেষণা পরিচালনার পরিকল্পনা করছে-

- ভেটকি মাছের কৃত্রিম প্রজননের পদ্ধতি উদ্ভাবন;
- বাংলাদেশের জন্য ভেটকি মাছের চাষ পদ্ধতি উদ্ভাবন;
- ট্রাস ফিসের পরিবর্তে অন্য কোনো তৈরিকৃত খাবার পদ্ধতি উদ্ভাবন।

[১] প্রফেসর ও ডীন, মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম (mnkabsar@yahoo.com)

[২] লেকচারার, মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

[৩] লেকচারার, মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

বাংলাদেশের নদ-নদী ও মোহনা অঞ্চলে চিংড়ির জীববৈচিত্র্য

Biodiversity of Shrimp and Prawn in the River and Estuary of Bangladesh

ড. মোস্তফা আলী রেজা হোসেন

Abstract

Shrimp and prawn have long been playing a major role in the diet and nutrition of Bangladeshi people and a key contributor in country's export earnings. Despite the fact that the sector faced a number of bottlenecks on its way to become an area to reckon, the culture has been intensified and total production has increased over the years. Though the culture of shrimp and prawn is a big issue in Bangladesh and has long been discussed/researched on, their biodiversity received very little attention. So far no countrywide survey has been carried out to identify the number of species, their abundance and present status of biodiversity. In this treatise, an attempt has been made to enlist all documented 62 shrimp/prawn species of the country with a hope that this would awake concerned stakeholders to take effective and sustainable measures to conserve the biodiversity of all shrimps and prawns of Bangladesh.

অনেক আগে থেকেই বাংলাদেশের মানুষের খাদ্য ও পুষ্টিতে এবং রপ্তানি পণ্যের তালিকায় চিংড়ি একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। নানা বাধাবিঘ্ন ও চড়াই উতরাই পেরিয়ে চিংড়ির উৎপাদন দিন দিন বেড়ে চলেছে। আমাদের দেশে বর্তমানে উপকূল জুড়ে প্রায় ২ লক্ষ ২০ হাজার হেক্টর জমিতে বাগদা ও গলদা চিংড়ির চাষ করা হয়ে থাকে এবং এর সাথে জড়িয়ে আছে প্রায় ১২ লক্ষ উপকূলবাসীর জীবন-জীবিকায়ন। বাংলাদেশে গলদার গড় উৎপাদন হেক্টর প্রতি ৫০০-৬০০ কেজি আর বাগদার উৎপাদন গলদার প্রায় অর্ধেক অর্থাৎ ২৫০-৩০০ কেজি/হেক্টর। উন্নত চাষ ও পানি ব্যবস্থাপনা, গুণগত মাণসম্পন্ন চিংড়ি পোনা এবং আহরণোত্তর মাননিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বাংলাদেশের চিংড়ির উৎপাদন কয়েক গুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। দীর্ঘদিন ধরেই আমাদের দেশে চিংড়ি চাষের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হলেও চিংড়ির জীববৈচিত্র্যের দিকটি ততোটা আলোচিত নয়। চিংড়ি অমেরুদণ্ডী জলজ প্রাণী। মিঠা পানি ও লবণাক্ত পানিতে বসবাসকারী চিংড়ি প্রজাতিসমূহের দৈহিক বৈশিষ্ট্য কিছুটা ভিন্ন। বাগদা, লইল্যা, সাদা চিংড়ি ইত্যাদি প্রধানত সমুদ্রে বসবাস করে। কিন্তু এদের ডিম পরিস্ফুটনের জন্য মোহনার কম লবণাক্ত পানিতে আসে এবং পরবর্তীতে জীবনচক্রের বিভিন্ন ধাপ (যেমন- জুইয়া, পোস্ট লার্ভা প্রভৃতি) পেরিয়ে আবার সমুদ্রে ফিরে যায়। তেমনি গলদা চিংড়ি মিঠাপানিতে বসবাস করলেও এদের ডিম পরিস্ফুটনের জন্য কিছুটা লবণাক্ত পানির পরিবেশ অনুকূল বিধায় নদ-নদীর মোহনায় চলে যায়। ডিম ফোটার পর শৈশব ও কৈশোর পেরিয়ে আবার নদ-নদী-খাল-বিলে ফিরে আসে।

জীববৈচিত্র্যের অবক্ষয়ের কারণ (Reasons for biodiversity loss)

কালের বিবর্তনে অন্য অসংখ্য জলজ প্রাণীর মতো বাংলাদেশের চিংড়ির অনেক প্রজাতিরও চরম বিপন্ন (critically endangered) প্রাণীর তালিকায় স্থান হয়েছে। চিংড়ির অনেক প্রজাতি আবার আমাদের জলাশয় থেকে একেবারেই বিলুপ্ত (extinct) হয়ে গেছে। বিলুপ্ত ও বিপন্ন হওয়ার কারণ বহুবিধ। জলবায়ুর বৈরী প্রভাব, নদ-নদী ভরাট, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, খরা, মোহনাঞ্চলে নদ-নদীতে মিঠাপানির ক্রমহ্রাসমান প্রবাহ, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, সিডর, আইলা, নার্গিস, মহাসেন এর মতো ঝড়-জলোচ্ছ্বাস ও প্রকৃতিগত অনেক কারণে চিংড়ির অনেক প্রজাতি আজ হারিয়ে যেতে বসেছে। এর সাথে মানবসৃষ্ট বিভিন্ন কারণ যেমন- মৎস্যের অতি আহরণ, মাছ ধরতে ক্ষতিকর জাল-সরঞ্জামাদির ব্যবহার, নদ-নদী ও অন্যান্য জলাভূমির বেআইনি দখল, যত্রতত্র বাঁধ, ব্রিজ ও কালভার্ট প্রভৃতি নির্মাণ, চলাচল পথে ফাঁদ পেতে মাছ ও চিংড়ি ধরা, জলাশয় শুকিয়ে ধান ও অন্যান্য ফসল চাষ এবং কীটনাশক-আগাছানাশকের যথেচ্ছা ও অপরিমিত ব্যবহার জলজ সকল জীবের বৈচিত্র্যকে আরও সঙ্কটাপন্ন করে তুলছে।

মোহনা অঞ্চলের মাছ, চিংড়ি কাঁকড়া, শামুক, ঝিনুক প্রভৃতির জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বড় কারণ হচ্ছে উপকূলীয় নদী ও মোহনায় অবৈধভাবে চিংড়ি পোনা আহরণ। প্রাকৃতিক উৎস হতে চিংড়ি পোনা আহরণ মৎস্য সংরক্ষণ আইনে নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও উপকূলীয় এলাকায় বাগদা ও গলদা চিংড়ির পোনা আহরণ পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। চিংড়ির পোনা আহরণকালে আহরণকারী শুধুমাত্র গলদা বা বাগদা পোনা (পিএল) সংগ্রহ করার পর জালে ধৃত অন্যান্য সামুদ্রিক মাছের ডিম ও পোনা, ছোট ছোট চিংড়ি ও এদের পোনা, শামুক, ঝিনুক ওয়েস্টার, জুপ্লাংকটন, ফাইটোপ্লাংকটন, লোনাপানির পোকা-মাকড় প্রভৃতিকে ডাঙ্গায় ফেলে দেয়। ফলে এ সমস্ত মূল্যবান প্রাণীগুলো কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা যায়। বিগত দু' দশকেরও বেশি সময় ধরে চলতে থাকা চিংড়ি পোনা সংগ্রহের এই মারাত্মক পদ্ধতির কারণে মোহনা অঞ্চলের বেশির ভাগ নদ-নদীই আজ প্রায় মাছ ও চিংড়ি শূন্য হতে চলেছে।

বিদ্যমান জীববৈচিত্র্য (Present biodiversity)

বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের নদ-নদী, মোহনাঞ্চল ও সমুদ্রে মৎস্যসম্পদ জরিপকালে এবং বিভিন্ন গবেষণা পরিচালনার সময় মৎস্য প্রজাতির পাশাপাশি চিংড়ি প্রজাতির পরিচিতি ও পরিমাণগত পরিসংখ্যান নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন

সময়ে বিক্ষিপ্তভাবে চিংড়ির প্রজাতিভিত্তিক তথ্যাদি বিভিন্ন প্রকাশনায়, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও বাংলাদেশে প্রাপ্য চিংড়ির প্রজাতির সংখ্যা ৪৫ থেকে ৫৫ এর মধ্যে রয়েছে বলে বলা হয়ে থাকে কিন্তু এখন পর্যন্ত প্রকাশিত বিভিন্ন বই-পুস্তক, বিজ্ঞানভিত্তিক প্রবন্ধ ও রিপোর্টে উল্লিখিত চিংড়ি প্রজাতিসমূহকে একীভূত করা হলে দেখা যাবে যে, বাংলাদেশের নদ-নদী, মোহনাঞ্চল ও সমুদ্রে ১টি বর্গের অন্তর্গত ১০টি পরিবারের মোট ৬২ প্রজাতির চিংড়ি রয়েছে, যা নিম্নের সারণিতে উপস্থাপন করা হলো। চিংড়ির সব প্রজাতিই পর্ব (Phylum) - Arthropoda, উপপর্ব (Subphylum) - Crustacea, শ্রেণী (Class) - Malacostraca ও বর্গ (Order)- Decapoda এর অন্তর্গত।

সারণি: বাংলাদেশের নদ-নদী ও মোহনা অঞ্চলের চিংড়ির তালিকা

(List of shrimp/prawn species in river and estuaries of Bangladesh)

ক্রমিক নম্বর	পরিবার	বৈজ্ঞানিক নাম	ইংরেজি (FAO) নাম	বাংলা নাম	*বাসস্থান	সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য (মিমি)
১	Alpheidae	*Alpheus euphrosyne* (De Man, 1897)	Nymph snapping shrimp	পিনা ইচা	B F	৫৮
২	Sergestidae	*Acetes chinensis* (Hansen, 1919)	Northern mauxia shrimp	গুড়া চিংড়ি সাদা ইচা	M	৪২
৩		*Acetes erythraeus* (Nobili, 1905)	Tsivakihini paste shrimp	ভর্তা চিংড়ি লাইল্যা চিংড়ি	B M	৩৩
৪		*Acetes indicus* (Milne-Edwards, 1830)	Jawla paste shrimp	ধইনা ইচা	B M	৪০
৫		*Acetes intermedius* (Omori, 1975)	Taiwan mauxia shrimp	-	M	২৬
৬		*Acetes japonicus* (Kishinouye, 1905)	Akiami paste shrimp	লাইল্যা ইচা	M	৩০
৭		*Acetes vulgaris* (Hansen, 1919)	Jembret shrimp	সাদা ইচা	M	৩৪
৮	Atyidae	*Caridina gracilirostris* (De Man, 1892)	Needlenose caridina	গুসা চিংড়ি	F B	৩৭
৯		*Caridina nilotica* (P. Roux, 1833)	Common caridina	গুসা চিংড়ি	F	৩৫
১০		*Caridina propinqua* (De Man, 1908)	Bengal caridina	চইন ইচা চইঙ্গা	F B	২০
১১	Hippolytidae	*Exhippolysmata ensirostris* (Kemp, 1914)	Hunter shrimp	শিকারি চিংড়ি	M	৭৯
১২		*Exopalaemon modestus* (C. Heller, 1862)	Siberian prawn	গুঁড়া চিংড়ি	F	৬০
১৩		*Exopalaemon styliferus* (H. Milne Edwards, 1840)	Roshna prawn	গারা ইচা	E F	৯০
১৪	Pandalidae	*Heterocarpus gibbosus* (Bate, 1888)	humpback nylon shrimp	নাইলন চিংড়ি	M	১৪০
১৫		*Heterocarpus woodmasoni* (Alcock, 1901)	Indian nylon shrimp	নাইলন চিংড়ি	M	১৪৯
১৬	Hippolytidae	*Lysmata vittata* (Stimpson, 1860)	Indian lined shrimp	লোনা চিংড়ি	M	৪৩

*M=Marine, E= Estuary, B= Brackish, F=Freshwater

ক্র.নম্বর	পরিবার	বৈজ্ঞানিক নাম	ইংরেজি (FAO) নাম	বাংলা নাম	*বাসস্থান	সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য (মিমি)
১৭	Palaemonidae	*Leptocarpus fluminicola* (Kemp, 1917)	Ganges delta prawn	গুড়া চিংড়ি	F B	৪৭
১৮		*Leptocarpus potamiscus* (Kemp, 1917)	Bombay prawn	লোনা চিংড়ি	B M	৫৯
১৯		*Macrobrachium choprai* (Tiwari, 1949)	Ganges River Prawn	চোপরাই চিংড়ি	F	১৮৩.৫
২০		*Macrobrachium dayanum* (Henderson, 1893)	Kaira river prawn	দাইয়া চিংড়ি কাইরা ইচা বিল চিংড়ি	F	৯২
২১		*Macrobrachium idea* (Heller, 1862)	Orana river prawn	গোদা ইচা	F B	১১০
২২		*Macrobrachium idella* (Hilgendorf, 1898)	Slender river prawn	চিকনা চিংড়ি	F	১১১
২৩		*Macrobrachium lamarrei* (H. Milne Edwards, 1837)	Kuncho river prawn	গুঁড়া চিংড়ি	F B	৬৯
২৪		*Macrobrachium lanchesteri* (De Man, 1911)	Riceland prawn	ধনুয়া চিংড়ি	F B	৫৫
২৫		*Macrobrachium malcolmsonii* (H. Milne-Edwards, 1844)	Birma river prawn	নাজারি ইচা	F B	৩১৫
২৬		*Macrobrachium mirabile* (Kemp, 1917)	Shortleg river prawn	লতিয়া ইচা	F B	৬০
২৭		*Macrobrachium palaemonoides* (Holt huis,1950)	-	-	F B	-
২৮		*Macrobrachium rosenbergii* (De Man, 1879)	Giant river prawn	গলদা চিংড়ি	F B M	৩২০
২৯		*Macrobrachium rude* (Heller, 1862)	Hairy river prawn	পাইট্টা ইচা গোদা চিংড়ি	F E	১৩০
৩০		*Macrobrachium scabriculum* (Heller, 1862)	Goda river prawn	ব্রাহ্মণী চিংড়ি	F E	৭০
৩১		*Macrobrachium villosimanus* (Tiwari, 1949)	Dimua river prawn	দিমুয়া ইচা	F	১৪৬
৩২		*Nematopalaemon tenuipes* (Henderson, 1893)	Spider prawn	লইট্যা ইচা গুঁড়া ইচা	B M	৭০
৩৩		*Palaemon karnafuliensis* (Khan Fincham & Mahmood, 1980)	Karnafuli prawn	গুঁড়া চিংড়ি, কর্ণফুলী চিংড়ি	BM	৫৭
৩৪		*Palaemon serrifer* (Stimpson, 1860)	Carpenter prawn		M	৩৬
৩৫	Penaeidae	*Metapenaeus affinis* (H. Milne Edwards, 1837)	Jinga shrimp	কেরানি চিংড়ি	M	১৭০
৩৬		*Metapenaeopsis andamanensis* (Wood-Mason, 1891)	Rice velvet shrimp	ধইনা ইচা	M	১৩৫
৩৭		*Metapenaeus brevicornis* (H. Milne Edwards, 1837)	Yellow shrimp	সাগা চিংড়ি হরিণা চিংড়ি	M F	১৩০
৩৮		*Metapenaeus dobsoni* (Miers, 1878)	Kadal shrimp	লোনা চিংড়ি গোসা চিংড়ি	M B	১৩০
৩৯		*Metapenaeus lysianassa* (De Man, 1888)	Bird shrimp	কাচু চিংড়ি	M	৮৮

ক্র.নম্বর	পরিবার	বৈজ্ঞানিক নাম	ইংরেজি (FAO) নাম	বাংলা নাম	*বাসস্থান	সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য (মিমি)
৪০	Penaeidae	*Metapenaeus monoceros* (Fabricius, 1798)	Speckled shrimp	হরিণা চিংড়ি খরখরে চিংড়ি	M E	১৯৫
৪১		*Metapenaeus spinulatus* (Kubo, 1949)	Stork shrimp	লাইল্যা চিংড়ি চামা চিংড়ি	M	৯৭
৪২		*Metapenaeopsis stridulans* (Alcock, 1905)	Fiddler shrimp	চামা চিংড়ি	M	১০০
৪৩		*Fenneropenaeus chinensis* (Osbeck, 1765)	Fleshy prawn	বড় চামা চিংড়ি চাপদা চিংড়ি	M	১৮৩
৪৪		*Parapenaeopsis cornuta* (Kishinouye, 1900)	Coral shrimp	টর্পেডো চিংড়ি	M	৮৩
৪৫		*Parapenaeopsis hardwickii* (Miers, 1878)	Spear shrimp	শুকনা চিংড়ি গোসা চিংড়ি	M	১৩৫
৪৬		*Parapenaeopsis sculptilis* (Heller, 1862)	Rainbow shrimp	বাগতারা চিংড়ি	M	১৭০
৪৭		*Parapenaeopsis stylifera stylifera* (H. Milne Edwards, 1837)	Kiddi shrimp	রুডা চিংড়ি	M	১৪৫
৪৮		*Parapenaeopsis stylifera coromandelica* (Alcock, 1906)	Coromandel shrimp	চামনা চিংড়ি	M	১২০
৪৯		*Parapenaeopsis tenella* (Bate, 1888)	Smoothshell shrimp	-	M	৬৭
৫০		*Parapenaeopsis uncta* (Alcock, 1905)	Uncta shrimp	খয়রা চিংড়ি	M	১২০
৫১		*Penaeus canaliculatus* (Olivier, 1811)	Witch prawn	ডোরাকাটা চিংড়ি	M	১২০
৫২		*Penaeus indicus* (H. Milne Edwards, 1837	Indian white prawn	চাপদা চিংড়ি সাদা ইচা	M B	২২০
৫৩		*Penaeus japonicus* (Bate, 1888)	Kuruma prawn	ডোরাকাটা জাপানি চিংড়ি	M	২২৫
৫৪		*Penaeus merguiensis* (De Man, 1888)	Banana prawn	কলা চিংড়ি, বাগচামা চিংড়ি	M B	২৪০
৫৫		*Penaeus monodon* (Fabricius, 1798)	Giant tiger prawn	বাগদা চিংড়ি	M B	৩৩৬
৫৬		*Penaeus penicillatus* (Alcock, 1905)	Redtail prawn	চামা ইচা লালচামা ইচা	M	১৬৩
৫৭		*Penaeus semisulcatus* (DeHaan, 1844)	Green tiger prawn	বাগতারা চিংড়ি সাদা ইচা	M	২২৮
৫৮		*Trachysalambria curvirostris* (Stimpson, 1860)	Southern rough shrimp	খসখসে চিংড়ি	M	৯৮
৫৯	Pandalidae	*Plesionika martia* (A. Milne Edwards, 1883)	Golden shrimp	সোনালি চিংড়ি	M	১৬৯
৬০	Solenoceridae	*Solenocera crassicornis* (H, Milne-Edwards, 1837)	Coastal mud shrimp	সোরা চিংড়ি	M	১২০
৬১		*Solenocera hextii* (Wood-Mason & Alcock, 1891)	Deep-sea mud shrimp	কাদা চিংড়ি	M	১৩৮
৬২		*Solenocera melantho* (De Man, 1907)	Chinese mud shrimp	কারা চামা চিংড়ি	M	৮৮

উপসংহার (Conclusion)

আমাদের দেশের জলাশয় থেকে প্রণীত তালিকায় উল্লিখিত চিংড়ির বেশ কিছু প্রজাতি চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং তালিকার অনেক চিংড়ির অস্তিত্বই আজ ভয়াবহ হুমকির সম্মুখীন। সামগ্রিক সচেতনতা ও কার্যকর পদক্ষেপ ব্যতীত সামনের দিনগুলোতে বিপন্ন ও বিলুপ্ত চিংড়ির তালিকা আরও দীর্ঘতর হতে পারে, যা কোনোভাবেই বাঞ্ছনীয় নয়। দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা প্রকল্পের অধীনে আমাদের অহংকার, অনন্য স্বাদ ও মূলবান পুষ্টির যোগানদাতা এ সব চিংড়ির সকল প্রজাতিকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করে এবং এদের প্রজাতিভিত্তিক জীববৈচিত্র্যের বর্তমান অবস্থাকে মূল্যায়িত করে চিংড়ি সংরক্ষণে এগিয়ে আসতে হবে। সরকারি-বেসরকারি সকল সংস্থা, আইন প্রণেতা, শিক্ষক, গবেষক, বিজ্ঞানী, ছাত্র-ছাত্রী, জেলে, চাষি ও সাধারণ জনতা সবারই নিজ নিজ অবস্থান থেকে চিংড়িসহ সকল জলজ জীবের জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য উদ্যোগ নেয়ার এখনি সময়।

বাংলাদেশের নদনদী ও মোহনা অঞ্চলে প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য চিংড়ি-

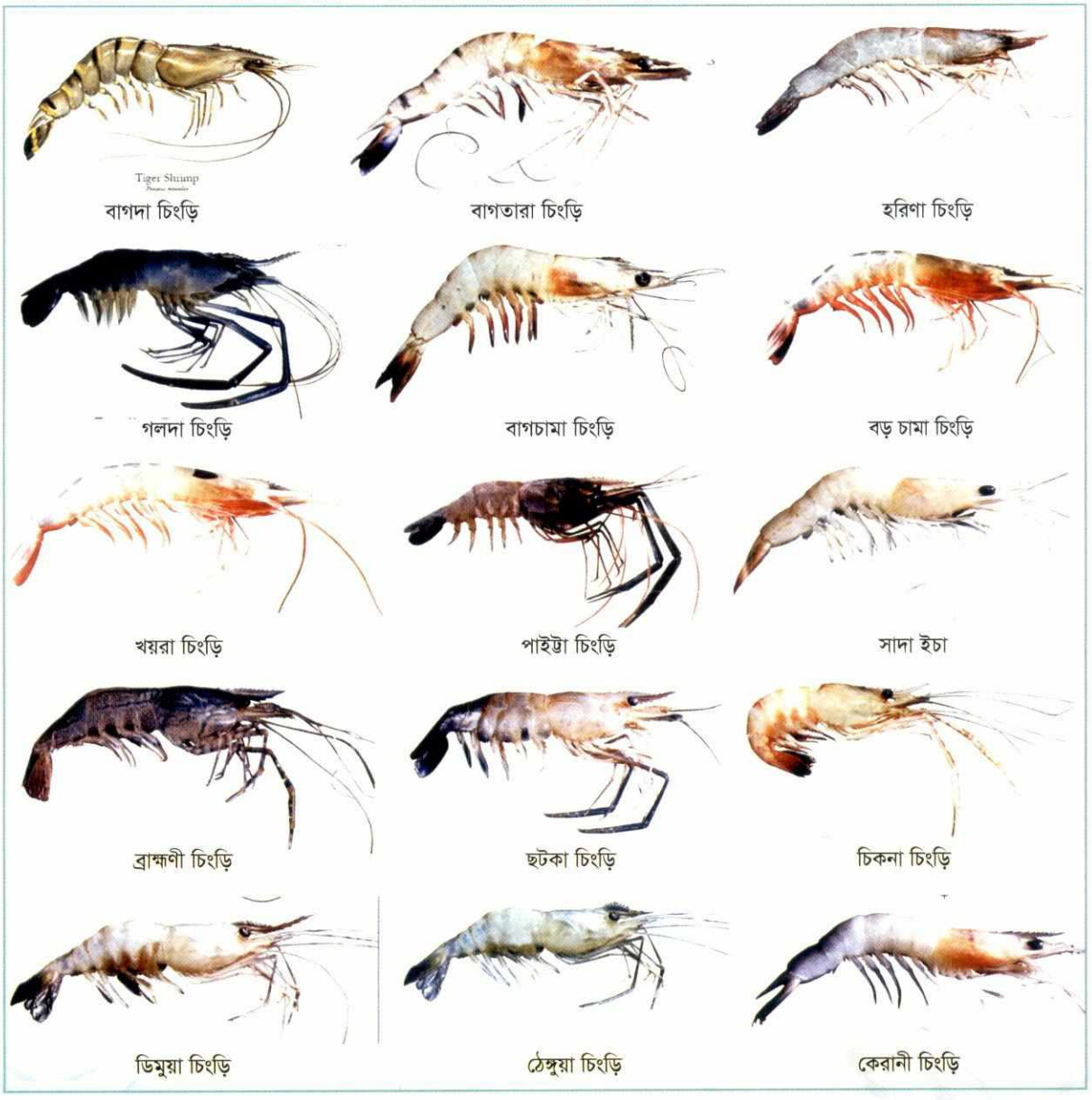

প্রফেসর, মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ (marhossain@yahoo.com)

পোনা মাছ না ধরতে পারে এজন্য মৎস্যজীবীদের সাথে সচেতনতামূলক সভা এবং এলাকাভিত্তিক ক্ষতিকর জালের ব্যবহার বন্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মৎস্যজীবীকে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং পুষ্টি সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়। জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ পালনকালে জেলা মৎস্য অফিস এবং উপজেলা মৎস্য অফিসের সহায়তায় জলাশয়ে

চিত্র: সোমানদী জলমহালে মাছ আহরণ

মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন এবং মাইকিং এর মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। অভয়াশ্রম পুনঃমেরামত এবং সংরক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা হয়। জলাশয়ে মৎস্য আহরণের বাড়তি চাপ কমানোর জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান হিসেবে মৎস্যজীবীদের মধ্যে কমিউনিটি ভিত্তিক হাপায় তেলাপিয়া মাছের পোনা উৎপাদন এবং ৩৬ জন দরিদ্র মহিলাকে খাঁচায় মাছ চাষের আওতায় আনা হয়েছে।

মাছ আহরণ ও ফলাফল (Harvesting and results)

প্রকল্প কর্তৃক বর্ষা মৌসুমে জুলাই-অক্টোবর এবং শুকনো মৌসুমে নভেম্বর-এপ্রিল মাসে মৎস্য আহরণ তথ্য সংগ্রহ করা হয়। শুকনো মৌসুমে মাছের মোট উৎপাদন, বিক্রয়মূল্য, প্রজাতির বৈচিত্র্যতা, ব্যবস্থাপনা খরচ ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

সোমানদী জলমহালের ৩টি জলাশয়- ৩৯ হেক্টর আয়তনের ফাইন্দা বিল, ১৯ হেক্টরের সোমা নদী ও ২ হেক্টরের চিতলা

চিত্র: মলা মাছ আহরণ

বিল এবং ৪টি খাড়া (outlet) যথা চিতলার খাড়া, দিয়ান্তরীর খাড়া, ভাটিলাউরঞ্জনী সুমার আগার ও ফাইন্দার খাড়ায় নমুনা-ভিত্তিক মৎস্য আহরণ তথ্য সংগ্রহ করা হয়। মৎস্য আহরণের জন্য সাধারণত যেসব জাল ব্যবহার করা হয় সেগুলো হলো গুড় জাল, ধর্ম জাল, ভেসাল জাল, ঠেলা জাল, বড় ফাঁসযুক্ত গিল নেট ও বেড় জাল।

২০১১-২০১২ সালে জলাশয়সমূহ হতে শুকনো মৌসুমে আহরণকৃত মোট মাছের পরিমাণ ছিল ২৯,৭৯৮ কেজি অর্থাৎ ৪৮৭ কেজি/হেক্টর। ধৃত মাছের মধ্যে মলা ছিল ১,৪৭০ কেজি অর্থাৎ ২৪ কেজি/হেক্টর। মলা মাছের হার ছিল মোট উৎপাদনের ৫ শতাংশ এবং এর অবস্থান ৫ নম্বরে। মোট প্রজাতি ছিল ৫৮টি। অপরদিকে ২০১২-২০১৩ সালে জলাশয়সমূহ হতে আহরণকৃত মোট মাছের উৎপাদন ৪৭,৮৭৮ কেজি অর্থাৎ ৭৮২ কেজি/হেক্টর। তন্মধ্যে মলা ছিল ৩,৮২৭ কেজি অর্থাৎ ৬২ কেজি/হেক্টর। মোট উৎপাদনের ৮ শতাংশ ছিল মলা মাছ এবং মোট ৬৮টি প্রজাতির মধ্যে মলার স্থান ছিল তিন নম্বর। উপাত্ত থেকে দেখা যায়, মলার উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে অন্যান্য মাছের উৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়েছে। উক্ত জলাশয়ে প্রকল্প শুরুর পূর্বে ২০১০-২০১১ সালে মোট মাছের উৎপাদন ছিল ১৯,৭৩৬ কেজি অর্থাৎ ৩২২ কেজি/হেক্টর এবং মলার পরিমান ছিল ৭ কেজি মাত্র।

এছাড়াও বর্ষা মৌসুমে জুলাই-অক্টোবর মাসে ৩টি বিল ফাইন্দার বিল, সোমা নদী ও চিতলা বিলে ২০১২-১৩ সালে মোট ১০,২২৪ কেজি মাছ উৎপাদন হয় তন্মধ্যে মলা ছিল ১,৪৮২ কেজি। ঐ বছর ৩টি বিলে মোট মাছের উৎপাদন ছিল ৫৮,১০১.৫ কেজি।

মাছের প্রজাতিভিত্তিক উৎপাদন (Specieswise production)

বর্ণিত জলাশয়ে বেইজলাইন এবং প্রকল্প কর্তৃক ২০১০-২০১১, ২০১১-২০১২ ও ২০১২-২০১৩ সালে যথাক্রমে ৪৯, ৫৮ ও ৬৮টি প্রজাতির মাছ ও চিংড়ি রেকর্ড করা হয়। ২০১০-২০১১ সালে বেইজলাইন জরিপে দেখা গেছে, বোয়াল, জাতপুঁটি, গুড়াইঁচা, বুজুরি টেংরা, তিতপুঁটি, গোলচান্দা, মেনি, গুচি বাইম, চাপিলা ও কই এ ১০টি প্রজাতির উৎপাদনের হার মোট উৎপাদনের ৬২ শতাংশ। ২০১১-২০১২ সালে বজুরি টেংরা, জাতপুঁটি, গুড়াইঁচা, মেনি, মলা, বোয়াল, বাইলা, গজার, কাকিলা ও গুলশার উৎপাদনের হার ৬৬ শতাংশ ও ২০১২-২০১৩ সালে গুড়াইঁচা, জাতপুঁটি, মলা, মেনি, বুজুরি টেংরা, টাটকিনি, বোয়াল, বাইলা ও গজার-এর উৎপাদনের হার মোট উৎপাদনের ৭৪ শতাংশ। উক্ত উৎপাদনের হার থেকে দেখা যায় যে, ১০টি প্রজাতির মধ্যে ২০১০-২০১১ সালে কোনো মলা মাছ ছিল না কিন্তু ২০১১-২০১২ সালে মলার অবস্থান দাঁড়ায় ৫ নম্বরে এবং ২০১২-২০১৩ সালে মলার অবস্থান

সারণি : বাৎসরিক মোট মাছের উৎপাদন, মলার উৎপাদন এবং মোট আয়

বছর	মোট মাছের উৎপাদন (কেজি)	মলা মাছের উৎপাদন (কেজি)	মোট মাছ থেকে আয় (টাকা)	মলা মাছ থেকে আয় (টাকা)
২০১০-২০১১	১৯,৭৩৬.৩	৭	১,৫৮,২২৪	১,৪০০
২০১১-২০১২	২৯,৭৯৮.০	১,৪৭০	৩০,৭৯,৩৬৯	১,১১,৮১৫
২০১২-২০১৩	৪৭,৮৭৭.৫	৩,৮২৭	৪৬,১৬,৪৮৫	৪,৮৬,৫৫৯

আসে ৩ নম্বরে। এই তথ্য থেকে বলা যায়, মলা মজুদের কারণে মলার উৎপাদনসহ অন্যান্য মাছের উৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়েছে।

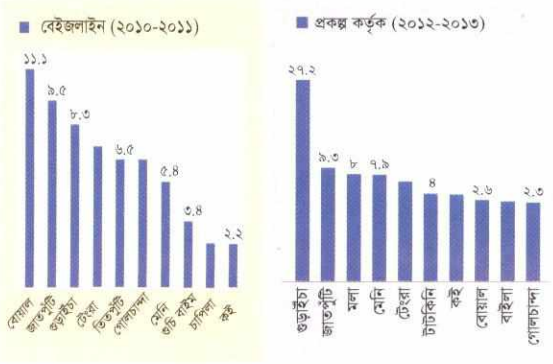

চিত্র: প্রজাতিভিত্তিক মাছের তুলনামূলক উৎপাদন হার

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর এবং জেলে সম্প্রদায়ের আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণ (Income generation, employment and fulfill of family nutrition demand of poor and fishermen community)

২০১১-২০১২ সালের শুকনো মৌসুমে উৎপাদিত মাছ মোট ৩০,৭৯,৩৬৯ টাকা বিক্রয় করা হয়েছিল যার মধ্যে মলা ছিল ১,১১,৮১৫ টাকার। ২০১২-২০১৩ সালে আহরণকৃত মাছ ৪৬,১৬,৪৮৫ টাকা বিক্রয় করা হয়েছিল এবং মলা বিক্রয় করা হয়েছিল ৪,৮৬,৫৫৯ টাকার। মৎস্যজীবীরা উক্ত আয় দিয়ে এলাকায় কিছু উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে যেমন-মাছের আবাসস্থল খনন, হিজল ও করচ গাছ রোপণ, পরিপক্ব ছোট মাছ মজুদ, অভয়াশ্রম পুনঃমেরামত, সমিতির ব্যবহারের জন্য নৌকা ক্রয় ইত্যাদি।

বর্ষা মৌসুমে ছোট মাছ আহরণ ও বিক্রি করে দরিদ্র জনগোষ্ঠী অর্থ উপার্জন ও জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। প্রকল্প কর্তৃক স্থানীয় জনগণের মধ্যে থেকে ১৫ জন লোককে সরাসরি প্রকল্পের কাজে সম্পৃক্ত করে তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়া সমিতির মাধ্যমে হাপায় তেলাপিয়ার পোনা মাছ প্রতিপালন এবং ৩৬ জন দরিদ্র মহিলাকে খাঁচায় মাছ চাষের আওতায় আনা হয়েছে। ছোট মাছ ও পুষ্টি প্রকল্পের মাধ্যমে অত্র এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠী পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত হয়েছেন। ফলে ছোট মাছের পুষ্টি বিষয়ে তারা বর্তমানে অনেক সচেতন। বিশেষ করে ছোট শিশু যাদের আগে কখনও ছোট মাছ খাওয়ানো হতো না তাদের মলা খিচুড়ি ও ভাতের সাথে মলা মাছ রান্না করে খাওয়ানো হচ্ছে। এতে ছোট শিশুরা পুষ্টি চাহিদা পূরণ করতে পারছে। ফলে তাদের মানসিক, শারীরিক এবং বুদ্ধির বিকাশ ঘটছে।

প্রযুক্তি গ্রহণ ও সম্প্রসারণ (Receiving technology and extension)

মৎস্যজীবীরা প্রকল্প কর্তৃক যে উৎপাদন প্রযুক্তি গ্রহণ করেছে তাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজে লাগিয়ে ২০১০ সালে ৪০ কেজি মলা, ২০১৩ সালে ১৭০ কেজি মলা এবং ৩০ কেজি অন্যান্য ছোট মাছ যেমন পুঁটি, দারকিনা ইত্যাদি মজুদ করেছে। প্রকল্পের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত এক মাঠ দিবসে SCBRMP (LGED) CBO কে প্রকল্পকৃত মৎস্য উৎপাদন কৌশল ও ফলাফল বর্ণনা করা হয়। এতে তাঁরা অনুপ্রাণিত হয়ে ২০১৩ সালে ১৫টি জলমহালে মলা ব্রুড মজুদের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

উপসংহার (Conclution)

প্লাবনভূমিতে শুকনো মৌসুমে যে সব ডোবা খালি পড়ে থাকে সেখানে মলা ও অন্যান্য ছোট মাছের ব্রুড মজুদ এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বহুলাংশে বাড়ানো সম্ভব। মাছ আহরণের সময় যাতে রেণু/পোনা মাছ জাল থেকে বেরিয়ে যেতে পারে এজন্য নির্দিষ্ট ফাঁসের জাল ব্যবহারের জন্য মৎস্যজীবীদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। মৎস্য আহরণের ওপর বাড়তি চাপ কমানোর জন্য জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান এবং মৎস্যজীবীদের মধ্যে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রদর্শনীমূলক ভিডিও, অডিও, পোস্টার, লিফলেট ইত্যাদির ব্যাপক প্রচারণার প্রয়োজন। বাজার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ ডিমওয়ালা মাছ ও পোনা মাছ আহরণ ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন জোরদার করতে হবে। এতে একদিকে যেমন হারিয়ে যাওয়া প্রজাতি রক্ষা পাবে, মাছের উৎপাদন বাড়বে অন্যদিকে জেলে সম্প্রদায়ের আয় বৃদ্ধি পাবে, কর্মসংস্থান হবে এবং সেই সাথে পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণে সহায়ক হবে।

[১] রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট, ওয়ার্ল্ডফিস-বাংলাদেশ ও সাউথ এশিয়া অফিস
[২] সিনিয়র সায়েন্টিস্ট, ওয়ার্ল্ডফিস-বাংলাদেশ ও সাউথ এশিয়া অফিস (B.Barman@cgiar.org)
[৩] সিনিয়র পুষ্টি বিশেষজ্ঞ, ওয়ার্ল্ডফিস-বাংলাদেশ ও সাউথ এশিয়া অফিস

সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনায় সতর্কতামূলক কৌশল অবলম্বন

Marine Fisheries Management : Precautionary Approaches

ড. মোঃ গিয়াসউদ্দিন খান

Abstract

The fish/shrimp fauna harvested by different players in the continental shelf are part of the same stocks. The combined effect of destructive fishing of non-selective shrimp fry collecting gears, estuarine behundi nets and shrimp/fish trawlers etc. has drastically reduced the resilience capacity of fish stocks. Information available on the nature and extent of destruction has been well captured in formulating the National Fisheries Strategy 2006. Time must not be wated for more information to come from exhaustive research but to take precautionary measures to manage our fishery with available knowledge. Grossly, the shallow water destructive fishing gears should be replaced with selective fishing gears e.g. trammel nets, improved croaker gill nets, in the short-term; and evacuate the upper part of the continental shelf, restricting the movement of trawlers, as far as approachable by the small-scale fishers and rehabilitate the artisanal fishers into the deeper waters with necessary support.

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের একটি সম্ভাবনাময় মজুদ আমাদের ছিল। কিন্তু দূরদর্শী ব্যবস্থাপনার প্রয়োগের অভাবে আমাদের এ সম্ভাবনাকে আমরা দেশ ও মানুষের সার্বিক কল্যাণে কাজে লাগাতে পারিনি। একদিকে গভীর সমুদ্র অঞ্চলে মৎস্যসম্পদ অনাহরিত থেকে যাচ্ছে ও অপরদিকে অগভীর সমুদ্রে ও মোহনা অঞ্চলে মাছের মজুদের ওপর বিভিন্ন উৎস হতে ক্রমাগত চাপ বেড়েই চলেছে। সনাতনী মৎস্যজীবীগণ ঘন ফাঁসের জাল দিয়ে অপরিণত বয়সী মাছ নিধনের ফলে এবং ট্রলার বহর দ্বারা প্রজনন মৌসুমে ডিমওয়ালা মাছের অতিআহরণের ফলে মাছের মজুদ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে ইতোমধ্যে অনেক প্রজাতির মাছের মজুদ বিলুপ্ত হতে চলেছে। এর প্রভাবে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীগণ মৎস্য আহরণের আয় হতে জীবিকা নির্বাহ করতে না পেরে মহাজনের দেনার দায়ে নিষ্পিষ্ট। এভাবে চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে, যেমনটি হয়েছে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ থাইল্যান্ডসহ আরও অনেক দেশে। আমাদের সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদনের ৯৩ শতাংশ অবদান রাখছে সনাতনী মৎস্যজীবীগণ, যারা প্রায় ৪৬ হাজার যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক নৌকা দ্বারা উপকূলীয় অঞ্চলে মাছ আহরণ করে থাকে। তাদের মৎস্য আহরণের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ এখনও পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এমনকি এক্ষেত্রে সরকারি কোনো বলিষ্ঠ কর্মসূচি এখনও অবর্তমান। তবে সঠিক কর্মসূচি প্রয়োগের মাধ্যমে এ অবস্থা থেকে এখনও উত্তরণ সম্ভব। এজন্য আর কাল বিলম্ব না করে প্রয়োজন একটি সতর্কতামূলক কৌশল অবলম্বন করা যা সম্পর্কে নিচে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো।

মৎস্য আহরণে সতর্কতামূলক কৌশল অবলম্বন (Precautionary measures in fisheries exploitation)

যখন মৎস্য মজুদের অবক্ষয় শুরু হয় তা মৎস্যজীবীদের ধৃত মাছের দৈনিক মাথাপিছু মৎস্য আহরণ বা আয়, প্রজাতির পরিবর্তন, আকার আকৃতির পরিবর্তনের ওপর সহজ ও নিয়মিত সমীক্ষার মাধ্যমে সহজেই জানা যায়। আর তা জানার সাথে সাথে বিষদ বৈজ্ঞানিক তথ্যের জন্য অপেক্ষা না করে সার্বিকভাবে গ্রহণযোগ্য ও সহজে অনুধাবনযোগ্য ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রবর্তন ও প্রয়োগ করাকে মৎস্য আহরণের সতর্কতামূলক কৌশল অবলম্বন নামে অভিহিত করা হয়।

অতিমাত্রায় এবং অপরিণামদর্শী মৎস্য আহরণের ফলে যেখানে মৎস্যসম্পদের মজুদ আশঙ্কাজনকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ও জলজ পরিবেশের ওপর মারাত্মক হুমকি দৃশ্যমানভাবে অনুমিত হয়েছে, সেখানে পরিপূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক বা গবেষণালব্ধ তথ্য ও ফলাফল প্রদর্শনের নিশ্চয়তার অভাবকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করে পরিবেশগত অবক্ষয় রোধের জন্য গৃহীত প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করা বা বাতিল করা মোটেই সমীচীন হবে না, বরং সীমিত তথ্যকে সামাজিক ব্যবস্থাপনা অভিজ্ঞতা এবং স্থানীয় জ্ঞানের সমন্বয়ে বিশ্লেষণ করে সংযতভাবে ও সতর্কতার সাথে ব্যবস্থাপনা কৌশল নির্ধারণ ও প্রয়োগ করতে হবে। এ কথা সবার জানা যে, মৎস্য সম্পদ ক্ষয়িষ্ণু ও নবায়নযোগ্য। বর্তমান মজুদকে বুদ্ধিভিত্তিক ও সহনশীলভাবে আহরণ করতে পারলে দীর্ঘমেয়াদীভাবে আমিষ চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান ও জীবিকা উন্নয়ন সর্বোপরি ভবিষ্যৎ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এর জন্য প্রয়োজন একটি যুগোপযোগী ও সহজে প্রণিধানযোগ্য মজুদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করা।

সাধারণ নীতি এবং ১৯৯৫ সালের এফএও অধিবেশনে গৃহীত দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণের আন্তর্জাতিক আচরণবিধি (FAO/UN Code of conduct for responsible fisheries) সকল মৎস্যাধারের, সকল জলাশয়ে সতর্কতামূলক কৌশল অবলম্বনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

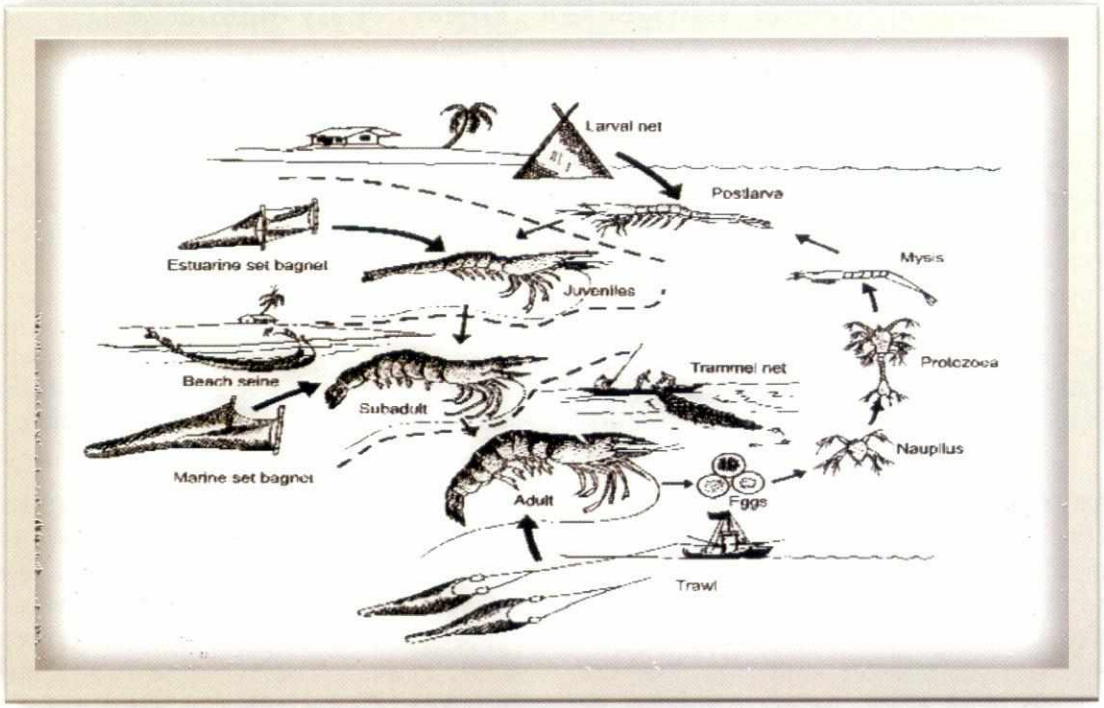

চিত্র: জীবনচক্রের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন প্রকার জাল দ্বারা চিংড়ি আহরণ প্রক্রিয়া

সতর্কতামূলক কৌশল অবলম্বন : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট
(Precautionary approach : Context Bangladesh)

বিদ্যমান অবস্থায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে আর কোনো প্রশ্নের অবতারণা করার সুযোগ নেই। কারণ স্থানীয় জ্ঞান, বিশেষজ্ঞ মতামত ছাড়াও, ইতোপূর্বে পরিচালিত অনেক কারণ প্রসূত সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থাকে সমর্থন ও উৎসাহিত করে। অনেক জলাধারে মৎস্যসম্পদ অতি আহরিত হয়েছে, যার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। বর্তমানে সহজলভ্য ঘন ফাঁসের ক্ষতিকারক জাল দ্বারা মৎস্য আহরণ মৎস্য মজুদ ভাণ্ডারকে এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে যার ফলে এ ক্ষেত্রটি মৎস্য উৎপাদনশীলতা ও প্রজাতি সংরক্ষণের ক্ষমতা অনেকাংশে হারিয়ে ফেলেছে। তবে এটিকে সম্পূর্ণভাবে অনুদ্ধারযোগ্য বলে বিবেচনা করা সমীচীন হবে না। অপরদিকে ব্যবস্থাপনার যথার্থ কাঠামোও ভেঙ্গে পড়েছে বলে মনে করে তথাকথিত উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ করে মৎস্য আহরণ সামর্থ্য আরো বৃদ্ধি করে ততোধিক হারে মৎস্য আহরণকে উৎসাহিত করা বা সমর্থন করা মোটেই সমীচীন হবে না। বরং জীবনচক্রের বিভিন্ন স্তরে ব্যবস্থাপনার প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এবং জেলে সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের মাধ্যমে চলমান সঙ্কট নিরসনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করাই হবে যুক্তিযুক্ত।

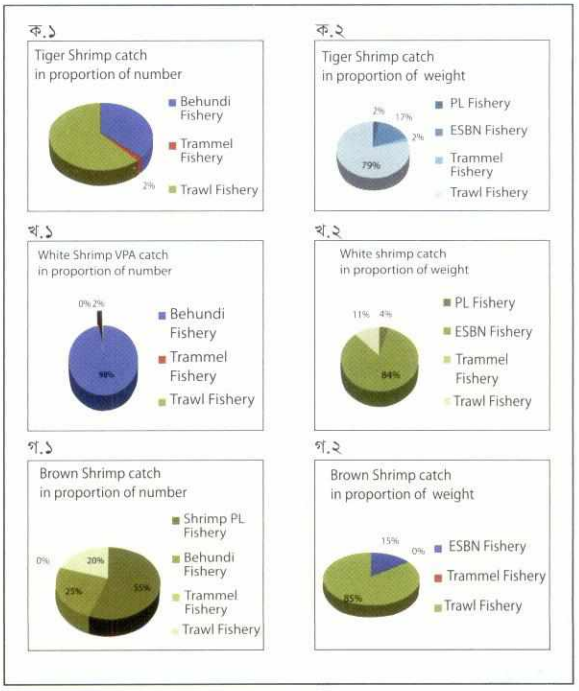

চিত্র: বিভিন্ন প্রকার জালে বিভিন্ন প্রকার সামুদ্রিক চিংড়ির সংখ্যা বনাম ওজনে আহরণের লাভ-ক্ষতির তুলনামূলক চিত্র

অধিক মাছের আশায় জেলেরা অন্য কোনো উপায় না থাকায় ক্ষতিকারক ঘন ফাঁসের জাল দিয়ে মাছ আহরণ করে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে সংখ্যায় অধিক মাছ ধরা পড়লেও তা ওজনে অনেক কম এবং বাজার মূল্য এতই কম যে জীবন ধারনের জন্য তা নিতান্তই অপ্রতুল। পক্ষান্তরে এ কর্মকাণ্ডের ফলে মৎস্যসম্পদের উৎপাদনশীলতা দ্রুত কমে যাচ্ছে, মাছের মজুদ কমে যাচ্ছে, জেলেদের আয় রোজগার প্রতিনিয়ত কমে যাচ্ছে এবং সাগর দিনে দিনে মৎস্যশূন্য হয়ে পড়ছে যা মোটেই সুখকর বিষয় নয়। তাই সম্পদ আহরণকারী সম্প্রদায় এবং আগামী প্রজন্মের জন্য মাছের যোগান নিশ্চিত করতে তথা দেশের সামগ্রিক স্বার্থে মৎস্যসম্পদ আহরণে কতিপয় নিয়ম মেনে চলা প্রয়োজন। সে কারণেই সরকার তথা মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক সার্বজনীন মঙ্গলের জন্য কতিপয় নিয়ম-নীতি জারী করা হয়েছে, যা মেনে চললে সম্পদ আহরণকারী সম্প্রদায়সহ সকলের সার্বিক উন্নতি ঘটবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। এসব আইন কানুন মেনে চলা তেমন কঠিন কিছু নয়। নিয়ম-নীতি পালনের মধ্যে মা মাছ, বাচ্চা-কিশোর ও অপরিণত বয়স্ক মাছ আহরণ হতে বিরত থাকা যাতে মাছের বংশ বৃদ্ধি নিশ্চিত হলে পরবর্তীতে মাছের মজুদ বৃদ্ধি পায় এবং জেলে সম্প্রদায়ের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায়। এসব আইন বা নিয়ম-নীতিই জেলেদের দীর্ঘমেয়াদী উপকারার্থে তৈরি করা হয়েছে, ক্ষতির জন্য নয়। অতএব নিজ প্রয়োজনেই জেলেদের তা মেনে চলা একান্ত আবশ্যক। তবে আইন প্রয়োগের পাশাপাশি মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক এসব বিষয় সম্পর্কে জেলেদের সচেতনতা বৃদ্ধি করার কার্যক্রম অব্যাহত রাখাও জরুরি।

যে সকল এলাকায় বেহুন্দি জাল পাতা হয় তা অগভীর পানির ছোট মাছ বা চিংড়ির আবাসস্থল এবং সামুদ্রিক চিংড়ি ও মাছের নার্সারি গ্রাউন্ড। এ জালের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। মোহনাঞ্চলে এ জালে সকল প্রজাতির কেবল বাচ্চা ও কিশোর মাছ ও চিংড়ি ধরা পড়ে। বেহুন্দি জালে আহরিত কিশোর বয়সী সামুদ্রিক চিংড়ির (পিনাইড) বাৎসরিক উৎপাদন ১০,০০০ হতে ১২,০০০ মে.টনের মধ্যে।

চিত্র: বেহুন্দি জালে ধৃত বাচ্চা মাছ ও চিংড়ি অবতরণ, বরগুনা

বেহুন্দি জালে আটকা না পড়লে প্রাকৃতিক মৃত্যুর সামান্য অংশ বাদ দিয়ে বাকিগুলো যদি সাগরে তাদের চারণভূমিতে ফিরে গিয়ে পরিপক্ব আকার ধারণ করার সুযোগ পেতো তা হলে অনেকগুণ বেশি ফলন হতে পারতো। বাচ্চা অবস্থায় ধরা পড়ছে বলে তারা সাগরের ফিরে গিয়ে প্রজননে অংশ নিতে পারছে না ও পরবর্তী বছরের বর্ধিত মজুদের জন্য প্রজন্মের যোগান দিয়ে যেতে পারছে না। উপরের চিত্রগুলো থেকে বোঝা যায় যে, অগভীর পানিতে পাতা এসব ক্ষতিকারক জাল দ্বারা যে মাছ ও চিংড়ি ধরা হয় তা সংখ্যায় অনেক বেশি হলেও ওজনে অনেক কম। পক্ষান্তরে হরিণা চিংড়ির একটি বড় অংশ সাগরে ফিরে যাবার সুযোগ পায় বলে ওজনে এর ফলন তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। এ থেকে এটা সহজেই অনুমেয় যে, অগভীর পানিতে পাতা জালগুলো অপসারণ করতে পারলে অন্যান্য মাছ ও চিংড়ি সাগরে ফিরে যেতে পারতো এবং অনেক গুণ বেশি মাছের উৎপাদন হতো। তবে এর জন্য প্রয়োজন সনাতনী জেলেদেরকে পরিবেশবান্ধব জাল দ্বারা পুনর্বাসন করা।

পূনর্বাসন (Rehabilitation)

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের মজুদকে স্থিতিশীলকরণ এবং মৎস্য আহরণ প্রক্রিয়াকে দীর্ঘমেয়াদীভাবে সহনশীল পর্যায়ে আনয়নের লক্ষ্যে অগভীর অঞ্চলে সনাতনী জেলেদের মৎস্য আহরণ মাত্রা অর্থাৎ নৌযান/জালের সংখ্যা সীমিতকরণে আর অধিক বিলম্ব না করে বাস্তবমুখী, যুগোপযোগী এবং সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এখানে উল্লেখ্য যে, এ পদক্ষেপ বাস্তবায়নে আহরণ প্রক্রিয়ার শ্রেণিবিন্যাস ও এলাকাভিত্তিক আহরণ ক্ষমতার পরিবর্তিত বরাদ্দ/বিন্যাসের সাথে সম্পৃক্ত করে পুনর্বাসন বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন। আর যেহেতু এই পুনর্বাসন প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত জটিল এটি একটি উন্নয়নধর্মী বিশাল কর্মকাণ্ড। অতএব এর বাস্তবায়ন পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করতে হবে। প্রাথমিকভাবে বিশ্লেষণ ও সম্ভাব্য ফলদায়ক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে মুক্ত চিন্তা-চেতনার উন্মেষ ঘটানোর প্রক্রিয়া সূচনা করতে হবে, যাতে সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়।

আমাদের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হবে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের মজুদকে স্থিতিশীল পর্যায়ে উন্নীত করা এবং দীর্ঘমেয়াদীভাবে সহনশীল মাত্রায় পরিচালনার জন্য উপযোগী ও সামাজিকভাবে লাভজনক ও গ্রহণযোগ্য মৎস্য আহরণ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার সূচনা করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, উপকূলীয় অঞ্চলে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত সনাতনী ক্ষুদ্র জেলে সম্প্রদায়ের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা। তৃতীয় উদ্দেশ্য হবে এ সেক্টর থেকে ভবিষ্যৎ খাদ্য নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করা। উপকূলীয় মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা দৃশ্যত যা হবে, তা বর্তমানে মৎস্য আহরণরত আর্টিস্যানাল ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের প্রয়োজনীয় অংশকে ক্ষতিকারক মৎস্য আহরণ পদ্ধতিসমূহ থেকে আংশিকভাবে সরিয়ে এনে প্রয়োজনীয় কারিগরি জ্ঞান, প্রশিক্ষণ ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে বিকল্প কৌশল

অবলম্বন করে স্থায়িত্বশীল ও লাভজনকভাবে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত করা। যা সত্যিকার অর্থে অত্যন্ত দুরূহ কাজ হলেও এর সফলতার জন্য সরকারি, বেসরকারি বিশেষ করে সুফলভোগী সম্প্রদায়ের একান্ত ইচ্ছা ও সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

নদী ও মোহনা অঞ্চলে পরিবেশবান্ধব জাল দ্বারা ক্ষতিকারক জাল অপসারণ (Replacement of destructive gears with eco-friendly fishing gears)

১. অগভীর পানিতে পোমা জালের ব্যবহার (Use of Poma jal in shallow water)

উপকূলীয় জেলেরা নিজেদের উদ্ভাবনী শক্তি দ্বারা ইতোমধ্যে বিভিন্ন প্রকার জাল তৈরি করে পরিচালন করছে। এর মধ্যে পোমা জালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। এটি ফাঁস জাল (gill net), এ জালের বর্তমান ফাঁস স্থানভেদে ৩০-৪০ মিমি ও এর প্রধান টার্গেট পোয়া মাছ ধরা। মাঠ পর্যায়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে যে, জালের ফাঁস ৪৫ মিমি (যা মৎস্য আইনে গ্রহণযোগ্য) এ উন্নীত করতে পারলে এটা ক্ষতিকারক জালের (যেমন- বেহুন্দি জাল) একটা ভাল বিকল্প হতে পারে। তবে জেলেদের মতে ফাঁস অধিক বৃদ্ধি করলে জাটকা ধরা পড়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে।

২. ট্রামেল জালকে বেহুন্দি জালের বিকল্প হিসেবে ব্যবহারের সম্ভাবনা (Prospect of use of trammel net as alternative to behundi jal)

এক সমীক্ষায় (খান ও অন্যান্য ১৯৯৪) দেখা গেছে যে, ট্রামেল জালে মাছ/ চিংড়ি আহরণ বেহুন্দি জালের চেয়ে দশ গুণ বেশি লাভজনক এবং মাছের মজুদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে টেকসই। অপর এক সমীক্ষায় (খান ও অন্যান্য সিইজিআইএস ২০০২) দেখা গেছে যে, এ ট্রামেল জাল নাফ নদী পথে মায়ানমার হতে আমাদের দেশে আসত বলে ট্রামেল জাল কেবল সীমিত পরিসরে টেকনাফ উপকূলীয় অগভীর সমুদ্রে ব্যবহার হত। ট্রামেল জালের প্রধান লক্ষ্য চাকা চিংড়ি আহরণ কিন্তু তার আধিক্য ঐ অঞ্চলে খুব কম (গোলাপি অংশ) থাকায় এতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি। অপরদিকে পটুয়াখালীর নিম্নাঞ্চলে (একই চিত্রে গোলাপি অংশ) চাকা চিংড়ির আধিক্য টেকনাফ অঞ্চল হতে অনেক গুণ বেশি। তাই আশা করা যায় যান্ত্রিক নৌকা দিয়ে কিছুটা গভীর সাগরে ট্রামেল জাল দিয়ে মাছ ধরার সূচনা করলে ক্ষুদ্র জেলেদের আর্থসামাজিক অবস্থায় একটি নতুন অধ্যায় রচিত হতে পারে। তবে এর জন্য ট্রামেল জালে পরীক্ষামূলক আহরণ পরিচালনা করা দরকার।

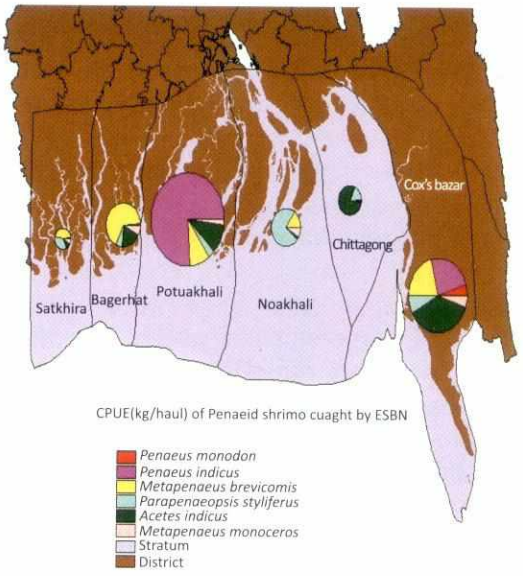

উপসংহার (Conclusion)

মৎস্য সেক্টরের কৌশলপত্রে (National Fisheries Strategy 2006: Marine Fisheries Sub-strategy and Action Plan) সনাতনী ও ক্ষুদ্রায়তন (Artisanal and small-scale fisheries) জেলেদের স্বার্থ সংরক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। একদিকে যেমন আলোচিত মতে অগভীর পানিতে পরিচালিত ক্ষতিকারক জালসমূহ অপসারণ করা দরকার, অপরদিকে মা মাছ ও চিংড়ি অতিআহরণকারী ট্রলার বহরকে এর সীমা লংঘন থেকে বিরত রাখা বাঞ্ছনীয়। কারণ একই মহীসোপান এলাকায় পরিচালিত বিভিন্ন প্রকার মৎস্য বহর একে অন্যের সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল, যেহেতু এরা একই প্রজাতির মাছের জীবনচক্রের বিভিন্ন বয়সে ও বিভিন্ন গভীরতায় আহরণ করে থাকে এবং বিভিন্নভাবে মাছের মজুদকে বিনষ্ট করে চলেছে। তাই সাগরের গভীরে যতদূর পর্যন্ত ক্ষুদ্র জেলেরা তাদের যান্ত্রিক নৌযান পরিচালনা করতে পারে ততদূর সমুদ্র এলাকা দেশের সার্বিক কল্যাণে তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া সমীচীন হবে। উল্লিখিত কৌশলপত্রের চাহিদামতে মোহনা ও অগভীর সমুদ্র এলাকা হতে ক্ষুদ্র জেলেদের সরিয়ে নিয়ে প্রযুক্তি হস্তান্তর ও প্রয়োজনীয় উপকরণ দিয়ে ক্ষমতায়ন করে গভীর পানিতে পুনর্বাসন করার উদ্যোগ গ্রহণ করলেই কেবল মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত জাতীয় এ কৌশলপত্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হবে যা গত সাত বছরে করা হয়নি। এক্ষেত্রে কৌশলপত্রের বাস্তবায়ন পর্যালোচনার বিষয়ে শীঘ্রই একটি পদক্ষেপ মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক গ্রহণ করা যেতে পারে।

ক্যাপচার ফিসারিজ ট্রেনিং স্পেশিয়ালিস্ট, ইসিআরআরপি, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, বাংলাদেশ (giasuddin.khan@fao.org)

বিপন্ন কুচিয়া মাছের প্রজননকাল নির্ণয়ে জিএসআই ও ফেকান্ডিটি নিরূপণ

Estimation of GSI and Fecundity to Determine the Spawning Season of Endangered Cuchia

সৈয়দ আরিফ আজাদ[১] ও বিনয় কুমার চক্রবর্ত্তী[২]

Abstract

Estimation of gonado-somatic index (GSI) of *Monopterus cuchia* (Hamilton, 1822) was investigated over a period of one year (January to December, 2004). Highest GSI value was found in the month of June and the GSI values began to fall gently from July to December in case of both male and female. The fecundity was measured by Von Vayer method and fecundity of Monopterus cuchia was recorded to range from 458.0±31.22 to 1116.0±11.31 from 62 samples having a total length of 54.25±1.71 to 66.05±0.71 cm, body weight from 256.33±45.14 to 492.50±2.50 g and gonad weight from 21.32±4.48 to 55.90±0.98 g. The relationship between body length and fecundity was found to be polynomial of second order of body weight and was expressed as: Y=0.2683X2-1.9383X+370.72. The regression equation established for fecundity on total body weight was Y=454.37X-692.8. The regression equation established for fecundity on total gonad weight was Y=19.602X-27.546. The above equation shows that the relationship between fecundity and total weight was curvilinear. A highly significant (P<0.01) linear relationship was found to exist between fecundity and gonadal weight.

কুচিয়া (*Monopterus cuchia*) বাংলাদেশে আদিবাসীদের জন্য একটি সুস্বাদু মাছ। আদিবাসী শিকারিগণ দেশের বিভিন্ন এলাকায় কুচিয়া শিকার করে তাদের জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করে। এ মাছটি ঔষধি মাছ হিসেবেও পরিচিত। এক সময় বাংলাদেশের সর্বত্র কুচিয়া মাছটির প্রাপ্যতা ছিল। Talwar ও Jhingran (১৯৯১) মতে, এ মাছটির বিস্তৃতি বাংলাদেশসহ ভারত, নেপাল ও পাকিস্তানে রয়েছে। এ মাছটির আবাসস্থল হলো অগভীর বিল ও বোরো ধান ক্ষেতের আইল, জলজ আগাছার ঝোপঝাড় পরিপূর্ণ পরিবেশ। বাংলাদেশে বিশেষ করে বৃহত্তর সিলেট, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলায় এর প্রাচুর্যতা বেশি। বর্তমানে এর প্রাপ্যতা খুবই অপ্রতুল। জলবায়ুর পরিবর্তন, অধিক আহরণ এবং মনুষ্যসৃষ্ট বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে জলজ পরিবেশ প্রাকৃতিক ভারসাম্যতা হারানোর ফলে বাংলাদেশের জলজ জীববৈচিত্র্য হুমকির সম্মুখীন। IUCN (২০০০) এর গবেষণায় দেখা গেছে যে, কুচিয়া মাছ বর্তমানে বিপন্ন তালিকাভুক্ত একটি মাছ।

আদিবাসি এলাকায় অনেক ছোট পুকুর ও জলাশয় (ধানক্ষেত) রয়েছে। কুচিয়ার আবাসস্থলের জন্য যা অত্যন্ত উপযোগী। এ সব জলাভূমিতে চাষ ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ঘটিয়ে কুচিয়ার উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। এজন্য কুচিয়ার ব্রিডিং বায়োলজি অর্থাৎ Gonado-Somatic Index (GSI) সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। যা এ প্রজাতির কৃত্রিম প্রজনন ঘটাতে সহায়তা করবে। এ ধরনের প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে আদিবাসী সমাজের খাদ্য নিরাপত্তায় সরাসরি ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। আদিবাসী সমাজ ছাড়াও সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অনেকেই কুচিয়া খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। আন্তর্জাতিক বাজারে এর যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। কুচিয়ার প্রাপ্যতা বৃদ্ধি এবং এর চাষ ব্যবস্থাপনায় আদিবাসী সমাজের অংশগ্রহণে একটি সফল ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। কুচিয়ার ফেকান্ডিটি ও প্রজননকাল নির্ণয়ের জন্য ২০০৯ সালে একটি প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। উক্ত গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে এ প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে। পরিচালিত গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ হলো:

১. কুচিয়ার ব্রিডিং বায়োলজি অর্থাৎ Gonado-Somatic Index (GSI) স্টাডি করে পোনা প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রজননে সহায়তাকরণ; এবং
২. অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রমের ভিত্তিতে ক্ষুদ্রাকার আবাসস্থল উন্নয়নের মাধ্যমে কুচিয়া চাষ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ঘটিয়ে এর উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ।

কর্মপদ্ধতি (Methodology)

এ গবেষণা কার্যক্রমে শেরপুর জেলাধীন ঝিনাইগাতি উপজেলার নওকুচি গ্রামের ধানক্ষেত থেকে ২০০৯ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত নমুনা সংগ্রহ করা হয়। উক্ত সময়ে সর্বমোট ৬২টি মাছের পৃথকভাবে মোট দৈর্ঘ্য ও ওজন সংগ্রহ করা হয়। তারপর স্ত্রী মাছের গোনাডগুলো সংগ্রহ করে ওজন দিয়ে নমুনাতে লেবেল করে পরবর্তী স্টাডির জন্য শতকরা ১০ ভাগ বাফার্ড ফরমালিনে সংরক্ষণ করা হয়। পরবর্তীতে Lagler (১৯৫৬) এর সূত্র (গোনাডের ওজন/সর্বমোট ওজন × ১০০) ব্যবহার করে জিএসআই মান নির্ণয় করা হয়। ফেকান্ডিটি নির্ণয়ের জন্য ৩টি পদ্ধতি রয়েছে। পদ্ধতিগুলো হলো- (ক) Volumetric method; (খ) Gravimetric method; এবং (গ) Von Vayer method (Lagler, ১৯৫৬)।

চিত্র: একটি পরিপক্ব স্ত্রী মাছ

চিত্র: একটি পরিপক্ব স্ত্রী মাছের ডিম্বাশয়

মাছের বড় ডিমের জন্য Volumetric method ও Von Vayer method ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে Von Vayer method ব্যবহার করা হয়েছে।

এ পদ্ধতিতে কাঁচি দিয়ে গোনাডকে খণ্ড খণ্ড করা হয়। গোনাডটির বাইরের কানেকটিভ টিস্যুর আবরণটি পরিষ্কার করা হয় এবং ব্লটিং পেপার দিয়ে গোনাডের আর্দ্রতা পরিষ্কার করা হয়। একটি ইলেকট্রনিক ব্যালান্স দিয়ে এর ওজন নির্ণয় করা হয়। তারপর ২০ গ্রাম ওজনের ৩ টি নমুনা প্রতিটি গোনাডের সামনের, মাঝের ও পিছনের লোব থেকে নিয়ে তা গণনা করা হয়। তারপর ২০ গ্রাম ওজনের নমুনার গড় সংখ্যা নির্ণয় করে মোট ওজনের সাথে সমন্বয় করে মোট ডিমের সংখ্যা বের করা হয়।

ফলাফল (Result)

কুচিয়া মাছের উদর পিণ্ডের পৃষ্ঠদেশে একটি মাত্র নলাকার লোব লম্বালম্বিভাবে বৃদ্ধি পায়। স্ত্রী-পুরুষ কুচিয়া মাছের জিএসআই-এর মানের হ্রাস/বৃদ্ধি চিত্রে দেখানো হলো। মাছের পরিপক্বতা বৃদ্ধির সাথে জিএসআই-এর মান বৃদ্ধি পায় এবং তা ডিমপাড়ার পর কমতে শুরু করে। পুরুষ মাছের গোনাডের ওজন জানুয়ারি থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে এবং তা গড়ে ৬.৬২ গ্রাম পর্যন্ত হয়ে থকে। পুরুষ মাছের গোনাডের ওজন আগস্ট থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে। কিন্তু স্ত্রী মাছের গোনাডের ওজন জানুয়ারি থেকে জুন মাস পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে এবং তা

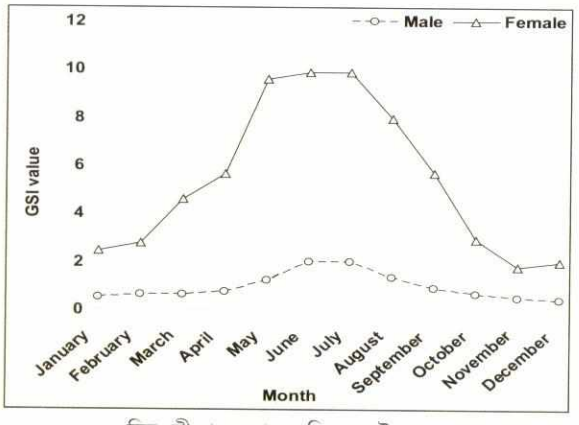

চিত্র: স্ত্রী-পুরুষ মাছের জিএসআই-এর মান

৪৮.৬২ গ্রাম পর্যন্ত হয়। স্ত্রী মাছের গোনাডের ওজন জুলাই থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে। পুরুষ ও স্ত্রী মাছের জিএসআই-এর মান ০.৪০±০.০১ থেকে ২.০০±০.১১ এবং ১.৯৯±০.০৩ থেকে ৯.৮৭±১.০৪ রেকর্ড করা হয়। স্ত্রী কুচিয়া মাছের ডিম উৎপাদন ক্ষমতা Von Vayer method এ নিরূপণ করা হয়। ৬২টি স্ত্রী কুচিয়া মাছের গড় দৈর্ঘ্য ছিল ৫৪.২৫±১.৭১ হতে ৬৬.০৫±০.৭১ সেমি, শারীরিক গড় ওজন ২৫৬.৩৩±৪৫.১৪ হতে ৪৯২.৫০±২.৫০ গ্রাম, ডিম্বাশয়ের গড় ওজন ২১.৩২±৪.৪৮ হতে ৫৫.৯০±০.৯৮ গ্রাম এবং গড় ডিম উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৪৫৮.০±৩১.২২ হতে ১১১৬.০±১১.৩১টি। দৈর্ঘ্যের সাথে ডিম ধারণক্ষমতার সংখ্যা (fecundity) সম্পর্কটি চিত্রে দেখানো হলো। দৈর্ঘ্যের সাথে ফেকান্ডিটির সম্পর্ক পলি-নমিয়াল, যা নিম্নবর্ণিত সমীকরণের মাধ্যমে দেখানো হলো:

$Y=0.2683X2-1.9383X+370.72$ (যেখানে $R^2=0.9473$)

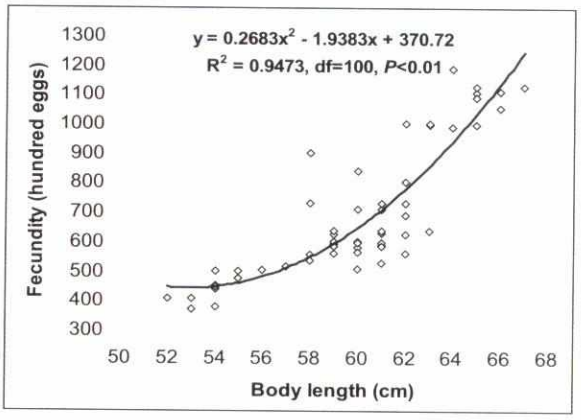

চিত্র: কুচিয়া মাছের দৈর্ঘ্যের সাথে ফেকান্ডিটির তুলনামূলক চিত্র

ওজনের সাথে ডিম ধারণক্ষমতার সংখ্যা সম্পর্কটি চিত্রে দেখানো হলো। কুচিয়া মাছের ওজনের সাথে ফেকান্ডিটির সম্পর্ক কার্ভিলিনিয়ার, যা উদ্ধৃত সমীকরণের মাধ্যমে দেখানো হলো:

$Y= 454.37X-692.8$ (যেখানে $R^2=0.6606$)।

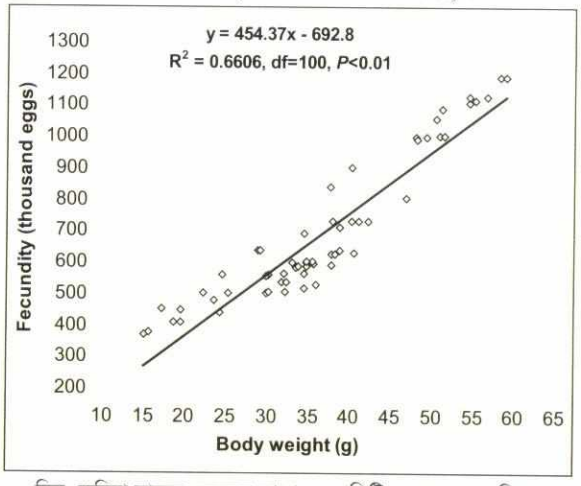

চিত্র: কুচিয়া মাছের ওজনের সাথে ফেকান্ডিটির তুলনামূলক চিত্র

গোনাড ওজনের সাথে ডিম ধারণক্ষমতার সংখ্যা (fecundity) সম্পর্কটি চিত্রে দেখানো হলো। গোনাড ওজনের সাথে

ফেকান্ডিটির সম্পর্ক কার্ভিলিনিয়ার, যা নিম্নোক্ত সমীকরণের মাধ্যমে দেখানো হলো:

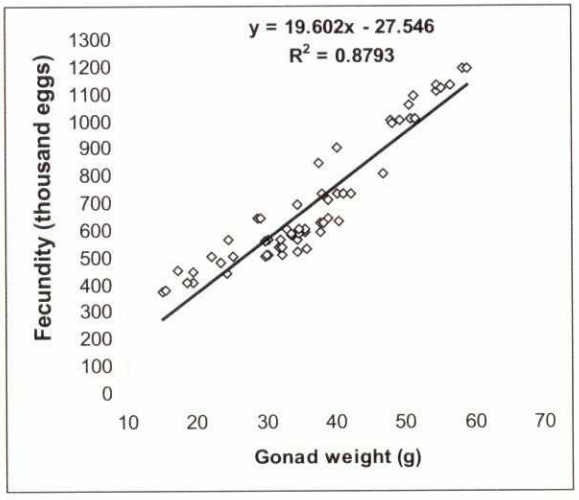

চিত্র: কুচিয়া মাছের ডিম্বাশয়ের সাথে ফেকান্ডিটির তুলনামূলক চিত্র

অংশগ্রহণমূলক আবাসস্থল উন্নয়ন (Participatory habitat improvement)

কুচিয়া মাছের প্রজননকাল নির্ণয়ের পর নওকুচি বিলের ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ঘটিয়ে কুচিয়া মাছের উৎপাদন শুরু করা হয়। গবেষক, মৎস্য অধিদপ্তর, ওয়াল্ডফিস-বাংলাদেশ এর উদ্যোগে সুফলভোগী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনা দল গঠন করা হয়। দলটি প্রতি পাক্ষিকে আদিবাসী সমাজের সংশ্লিষ্ট কুচিয়া চাষীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। কুচিয়া বসবাসের পরিবেশ উন্নয়নের জন্য আশ্রয়স্থলে জলজ আগাছা স্থাপন করা হয় এবং প্রজনন মৌসুমে কুচিয়া আহরণ বন্ধ রাখা হয়। দলটি কুচিয়া মাছের বাসস্থান ও খাবার সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে নিবিড় পর্যবেক্ষণ করে। এর ফলে নওকুচি বিলে কুচিয়া মাছের হেক্টর প্রতি ১,৪৫৫ কেজি বার্ষিক উৎপাদন পাওয়া যায়, যা কার্যক্রম গ্রহণের পূর্বে ছিল হেক্টর প্রতি ৪৮০ কেজি।

উপসংহার (Conclusion)

এ গবেষণার ফলাফল কুচিয়া মাছের প্রজননকাল নিরূপণে সহায়তা করবে। কুচিয়ার ডিম বড় হওয়ার কারণে এর ডিমের সংখ্যা কম এবং কিছু কিছু বড় মাছের ডিমের সংখ্যা ছোট মাছের ডিমের সংখ্যা থেকে কম। জিএসআই গবেষণার ফলে কুচিয়া মাছের প্রজননকাল নিরূপণে সহায়তা করবে। কুচিয়া মাছের প্রজননকাল নিরূপণ করে কুচিয়া মাছ আহরণ নিষিদ্ধকরণের পাশাপাশি জলজ পরিবেশ উন্নয়ন ঘটিয়ে আদিবাসী সমাজের অংশগ্রহণে সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কুচিয়া চাষ সম্প্রসারণ সহজ হবে। যা আদিবাসি জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকার সূচনা করবে। আন্তর্জাতিক বাজারে কুচিয়া মাছের যথেষ্ট চাহিদা থাকায় চাষের এলাকা বাড়িয়ে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

চিত্র: ক্ষুদ্রাকার আবাসস্থল উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদিত কুচিয়া

[১] মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
[২] প্রকল্প পরিচালক, মৎস্য ডিপ্লোমা কোর্স বাস্তবায়ন প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ (bborty@gmail.com)

ল্যাবরেটরি অ্যাক্রিডিটেশন : গুরুত্ব ও করণীয়
Laboratory Accreditation : Importance and Way Forward

নিত্যরঞ্জন বিশ্বাস[১] ও মোঃ বেলাল হোসেন[২]

Abstract

Exporting fish and fishery products of Bangladesh mostly destined to EU, USA and some Asian countries which has a vital contribution in the national economy of Bangladesh. Each importing entities require set of standards to comply with, so that the consumers are satisfied with what they consume in terms of its quality. The supply of reliable safe food can be ensured through the application of common food safety management system supported by credible laboratory testing services. The Department of Fisheries (DoF) act as competent authority and provides testing services for fishery products for some major contaminants to ensure the safety of the products intended for human consumption through the services of Fish Inspection and Quality Control (FIQC) laboratories. Credible laboratory services require accredited testing protocols. To get accreditation, laboratory must ensure the competence of its own services. Worldwide accepted guideline for laboratory accreditation is the ISO/IEC 17025:2005(E), i.e., General Requirement for the Competence of Testing and Calibration of laboratories. It covers testing and calibration performed using standard methods, non-standard methods and laboratory developed methods with all requirements of management and technical point of view. The laboratory accreditation procedure is described with specifying responsibilities of the personnel that help the interested laboratries to get accreditation by worldwide accreditation bodies. Meanwhile BAB with due recognition accredited Dhaka FIQC laboratory in this year.

প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাণিজ্যে টিকে থাকার জন্য পণ্যের গুণগত মানোন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ অন্যতম পূর্বশর্ত। এজন্য সবার আগে মাননির্ধারণী ল্যাবরেটরির গুণগতমান নিশ্চিত করা খুবই জরুরি। মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তরে স্থাপিত তিনটি ল্যাবরেটরির মাধ্যমে মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের গুণগতমান বজায় রেখে মৎস্য উৎপাদন ও রপ্তানিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রতি বছরই বাংলাদেশ চিংড়ি ও মাছ রপ্তানি করে দেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। উৎপাদিত চিংড়ির সিংহভাগ ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশসমূহে রপ্তানি হয়। ভোক্তার স্বাস্থ্য নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনা করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রায় প্রতিবছর বাংলাদেশের মৎস্যপণ্যের গুণগত মান যাচাইয়ের লক্ষ্যে মৎস্য উৎপাদন থেকে শুরু করে প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা ও ল্যাবরেটরিসমূহের সক্ষমতা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করে। বিগত ২০১১ সালে EU-FVO মিশন বাংলাদেশ পর্যবেক্ষণ করে ল্যাবরেটরিসমূহের কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্টি প্রকাশ করার পাশাপাশি পর্যাপ্ত অন্তঃ ও আন্তঃমাননিয়ন্ত্রণ (internal & external quality control) নিশ্চিত করার জন্য ISO ১৭০২৫ এর অধ্যায় ৫.৯ বাস্তবায়নে সুপারিশ করে। বর্তমানে দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞের সহায়তায় EU-FVO মিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন করে ল্যাবরেটরি অ্যাক্রিডিটেশন সনদ অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

অ্যাক্রিডিটেশন ও এর গুরুত্ব
(Accreditation and its importance)

অ্যাক্রিডিটেশন হলো তৃতীয় পক্ষ দ্বারা সাযুজ্য নিরূপণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে (Conformity Assessment Body) তাদের সক্ষমতা যাচাইয়ের মাধ্যমে প্রত্যয়ন করা। অ্যাক্রিডিটেশন সংস্থা হচ্ছে একটি কর্তৃত্বপূর্ণ কর্তৃপক্ষ যার আইনগত অধিকার সাধারণত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হয়। মৎস্যপণ্য ও সেবার মান নির্ধারণের জন্য পরীক্ষাগারের পরীক্ষণ (laboratory testing), সনদপ্রদান (certification), পরিমাপের সঠিকতা যাচাই (calibration) সুবিধা জোরদার করা এখন সময়ের দাবী। ভোক্তা পর্যায়ে আস্থা ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের ওপর পণ্য বিপণনের মূল সাফল্য নির্ভর করে। এটা সম্ভব হলে পণ্য ও সেবা সহজেই বাণিজ্যের কারিগরি বাধাগুলো অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনে সক্ষম হয় এবং সে সাথে নিম্নবর্ণিত সুবিধাসমূহ নিশ্চিতকরণ সহজতর হয়-

- পরীক্ষণের ফলাফল আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা পায়;
- একটি নির্দিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড (যেমন- ISO 17025) অনুসরণ করা হয় বিধায় সেবার মানকে ধরে রাখা সহজ হয়;
- প্রতিষ্ঠানের কাজের সক্ষমতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চয়তার মাধ্যমে সরকারি নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাজকে সহজ করে;

চিত্র: অত্যাধুনিক LC-MS/MS Quatro Premier XE মেশিন

- নিরাপদ পণ্য সরবরাহ ও সেবার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারের সুষম প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করা যায়;
- কারিগরি বাধা দূরীকরণের মাধ্যমে বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহায়তা করে; এবং
- পণ্যে দূষণ ও ভেজাল দ্রব্যের অপপ্রবেশ প্রতিরোধ করে খাদ্য ও পানীয়ের গুণগতমান সুরক্ষার মাধ্যমে ভোক্তার স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

বিশ্বের অ্যাক্রিডিটেশন সংস্থাসমূহ
(World accreditation agencies)

নতুন বিশ্ব ব্যবস্থায় গুণগতমান নিয়ন্ত্রণে ভোক্তার নিরাপত্তা, সন্তুষ্টি ও আস্থা অর্জনে বিশ্বে বেশ কয়েকটি সংস্থা অ্যাক্রিডিটেশনের কাজ করে যাচ্ছে। তন্মধ্যে আন্তর্জাতিক অ্যাক্রিডিটেশন ফোরাম (IAF), এশিয়া-প্যাসিফিক ল্যাবরেটরি অ্যাক্রিডিটেশন কো-অপারেশন (APLAC), আন্তর্জাতিক ল্যাবরেটরি অ্যাক্রিডিটেশন কো-অপারেশন (ILAC) এবং প্যাসিফিক অ্যাক্রিডিটেশন কো-অপারেশন (PAC) উল্লেখ্যযোগ্য। আমাদের দেশে বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড (BAB) আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য দেশীয় পণ্য ও সেবার মান বৃদ্ধি এবং গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, যা ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অ্যাক্রিডিটেশন সংস্থা সাধারণত বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক সংস্থার নিজস্ব ও জাতীয় স্ট্যান্ডার্ডস অনুযায়ী অ্যাক্রিডিটেশন প্রদান করে থাকে। সাযুজ্য নিরূপণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক (ল্যাবরেটরি, সনদ প্রদানকারী সংস্থা, পরিদর্শন সংস্থা) সাধারণত যেসব আন্তর্জাতিক মানের স্ট্যান্ডার্ডসমূহ ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে-ISO/IEC 17025, ISO 15189, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17024 উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড ISO/IEC 17025, ISO/IE17011 ও অন্যান্য সংস্থা ILAC, IAF এবং সরকারি সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানের আলোকে মান ব্যবস্থা পরিচালনা করে থাকে।

ল্যাবরেটরি অ্যাক্রিডিটেশন প্রক্রিয়া
(Laboratory accreditation procedure)

ল্যাবরেটরি অ্যাক্রিডিটেশন দক্ষতা ও সক্ষমতার পর্যায়ক্রমিক উন্নয়নের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি যা তুলনামূলক জটিল ও দীর্ঘ প্রক্রিয়া। একটি আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্য ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠার জন্য নির্মাণ কাঠামো থেকে শুরু করে দক্ষ জনবল, মানসম্মত যন্ত্রপাতি, ব্যবস্থাপনা, অন্তঃ এবং আন্তঃমাননিয়ন্ত্রণ কৌশল, ব্যবহৃত মেথডের বৈধতা (validity) যাচাই, প্রফিসিয়েন্সি টেস্টিং (proficiency test) এ সফলতা অর্জনসহ ডকুমেন্টেশন পদ্ধতি খুবই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হয়। সুষ্ঠুভাবে ল্যাবরেটরি পরিচালনার জন্য বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানই ISO/IEC 17025 নির্দেশিকা অনুসরণ করে।

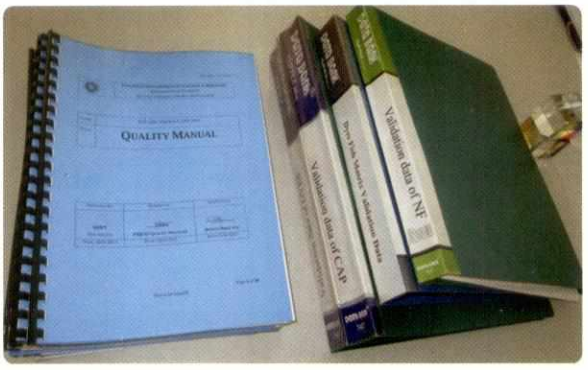

চিত্র: অ্যাক্রিডিটেশনের জন্য অপরিহার্য ডকুমেন্টস

ISO/IEC 17025 নির্দেশিকায় সুষ্ঠুভাবে ল্যাবরেটরি পরিচালনায় যেসব বিষয়াবলি বিধৃত রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অনুসরণীয় বিষয়সমূহ নিম্নরূপ:

ISO- 17025 এর অনুচ্ছেদ নং	বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ
1.0, 2.0, 3.0	পরিধি, রেফারেন্স ও সংজ্ঞা বিধৃত রয়েছে।
4.0	সুষ্ঠুভাবে ল্যাবরেটরি ব্যবস্থাপনার (management requirement) চাহিদাসমূহ বিধৃত আছে।
4.1	**প্রতিষ্ঠান** (organisation): এর আইনগত অবস্থা; ল্যাবরেটরি পরিচালনার জন্য কোয়ালিটি ম্যানেজার ও টেকনিক্যাল ম্যানেজার এর দায়িত্বাবলি বিধৃত হয়েছে।
4.2	কোয়ালিটি সিস্টেম (quality system) পলিসি এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ।
4.3	**ডকুমেন্ট কন্ট্রোল:** ল্যাবরেটরি পরিচালনার জন্য সকল প্রকার ডকুমেন্ট প্রস্তুত, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের বিষয়াদি।
4.4	সেবা গ্রহণকারীর চাহিদা সংক্রান্ত অনুরোধ (request), ক্রয় সংক্রান্ত টেন্ডার এবং চুক্তি (contract) সম্পর্কিত বিষয়াদি।
4.5	ল্যাবরেটরিতে কাজের আধিক্যের জন্য নমুনা পরীক্ষণে সাময়িক সমস্যার ক্ষেত্রে পরীক্ষণে ধারাবাহিকতা রক্ষার স্বার্থে স্বাভাবিক কাজকর্ম চালিয়ে নেয়ার জন্য অন্যান্য ল্যাবরেটরির সাথে চুক্তি পদ্ধতি (sub-contracting of test and calibration)।
4.6	ল্যাবরেটরিতে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় রিয়েজেন্ট, কেমিক্যালস, কনজিমিউবলস ক্রয় এবং সরবরাহ সংক্রান্ত নীতি ও পদ্ধতি।
4.7	কাস্টমারদের সেবা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়াদি (service to the client)।

4.8	কাস্টমারদের অভিযোগ (complaints) সংক্রান্ত বিষয়গুলো সমাধানের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতি ও পদ্ধতিসমূহ।
4.9	নন-কনফার্মিং কাজের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কৌশলসমূহ।
4.10	**কারেক্টিভ অ্যাকশন** (Corrective action): ত্রুটিপূর্ণ কাজের শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিসমূহ।
4.11	**প্রিভেন্টিভ অ্যাকশন** (Preventive action): কাজের গুণগতমান বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত নীতি ও কৌশলসমূহ।
4.12	ল্যাবরেটরিতে ব্যবহৃত সকল প্রকার কোয়ালিটি রেকর্ড (ইন্টারনাল অডিট, কারেক্টিভ এবং প্রিভেন্টিভ কার্যসম্পর্কিত রেকর্ড) সুষ্ঠুভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ, ফাইলিং এবং বিনষ্টকরণ পদ্ধতিসমূহ।
4.13	**ইন্টারনাল অডিট**: বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কোয়ালিটি ম্যানেজার কর্তৃক ইন্টারনাল অডিট টিমের মাধ্যমে অডিট সম্পন্ন ও নিষ্পত্তিকরণ সংক্রান্ত বিষয়াদি।
4.14	**ম্যানেজমেন্ট রিভিউ**: পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী ল্যাবরেটরির কাজের মান বিবেচনায় এনে বছরে একবার ম্যানেজমেন্ট রিভিউ করার গুরুত্ব ও পদ্ধতিসমূহ।
5.0	সুষ্ঠুভাবে ল্যাবরেটরি পরিচালনায় কারিগরি চাহিদাসমূহ(technical requirements)
5.1	নমুনা পরীক্ষণের সঠিকতা ও নির্ভরতায় যে সব বিষয়াবলি প্রভাবিত করতে পারে তা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।
5.2	**জনবল** (Personnel): ল্যাবরেটরিতে কর্মরত জনবলের শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা এবং কর্মবণ্টন সম্পর্কিত বিষয়াদি।
5.3	ল্যাবরেটরির অবস্থান ও পারিবেশিক অবস্থা সম্পর্কিত বিষয়াদি।
5.4	নমুনা পরীক্ষণ পদ্ধতি ও পদ্ধতির বৈধতা (method development and method validation) সম্পর্কিত বিষয়াদি।
5.5	**যন্ত্রপাতি** (Equipment): যন্ত্রপাতির ক্যালিব্রেশন, অ্যাকুরেসি, সফটওয়ার আপডেট, পরিবহন, সংরক্ষণ ও এর ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি।
5.6	**মেজারমেন্ট ট্রেসিবিলিটি**: পূর্বপরিকল্পিত পরিকল্পনা অনুসারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ইকুইপমেন্ট-এর ক্যালিব্রেশন নিশ্চিত করতে হবে। রেফারেন্স স্ট্যান্ডার্ডস ও রেফারেন্স ম্যাটেরিয়াল্স-এর ক্যালিব্রেশনের জন্য নির্ধারিত কর্মসূচি ও পদ্ধতিসমূহ।
5.7	**নমুনায়ন** (Sampling): নমুনায়নের জন্য নমুনায়ন পরিকল্পনা ও পদ্ধতিসমূহ।
5.8	**নমুনা হ্যান্ডলিং** (Handling of test and calibration items): নমুনা পরিবহন, গ্রহণ, হস্তান্তর, সংরক্ষণ ও নমুনা বিনষ্টকরণ (disposal) এর নীতি ও পদ্ধতিসমূহ।
5.9	নমুনা পরীক্ষা ফলাফলের গুণগত মান (quality control) যাচাই এর লক্ষ্যে আন্তঃল্যাবরেটরি পরীক্ষা, প্রফিসিয়েন্সি পরীক্ষা (proficiency test), সংরক্ষিত নমুনার পুনঃপরীক্ষা সংক্রান্ত নিয়ম ও নীতিসমূহ।
5.10	পরীক্ষণ ফলাফলের প্রতিবেদন উপস্থাপনের (reporting the results) যাবতীয় বিষয়াদি উপস্থাপিত হয়েছে।

(**তথ্যসূত্র**: ISO/IEC 17025: 2005(E) – General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories)

উপরে বর্ণিত নির্দেশিকা অনুসরণ করে যাবতীয় কার্যাদি সফলতার সাথে সম্পন্ন করতে সক্ষম হলে একটি টেস্টিং ল্যাবরেটরি অ্যাক্রিডিটেশন প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্তির জন্য আবেদন করতে পারে। আবেদনকারীর প্রতিষ্ঠান আবেদন করা থেকে শুরু করে অ্যাক্রিডিটেশন সনদ অর্জন পর্যন্ত সাধারণত ১২০ কর্মদিবস পর্যন্ত সময়ের প্রয়োজন হতে পারে (সারণি দ্রষ্টব্য)।

চিত্র: পিসিআর মেশিন

এফআইকিউসি ল্যাবরেটরিসমূহের অগ্রগতি
(Progress of FIQC laboratories)

মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তর ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় আধুনিক মানের তিনটি ল্যাবরেটরিতে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির

সারণি: অ্যাক্রিডিটেশন প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ

ধাপসমূহ		দায়িত্ব
অ্যাক্রিডিটেশনের জন্য আবেদন (Application)	→	আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান
আবেদনপত্র যাচাই (Application Verification)	→	কেইস অফিসার
লিড অ্যাসেসর নিয়োগ ও পর্যাপ্ততা যাচাই (Adequacy Audit)	→	কোয়ালিটি ম্যানজোর ও লিড অফিসার
মূল্যায়ন দল (Assessment Team) নির্বাচন	→	কোয়ালিটি ম্যানেজার
প্রাক মূল্যায়ন (Pre-assessment) এবং মূল্যায়ন (Assessment)	→	অ্যাসেসমেন্ট টিম
মূল্যায়ন রিপোর্ট (Assessment Report) ল্যাবরেটরিতে জমা দান	→	লিড অ্যাসেসর
মূল্যায়ন রিপোর্ট (Assessment Report) পর্যালোচনা	→	টেকনিক্যাল রিভিউ প্যানেল (TRP)
সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া যাচাই ও অ্যাক্রেডিটেশন সুপারিশ প্রণয়ন	→	টেকনিক্যাল কমিটি (TC)
অ্যাক্রিডিটেশন প্রদান (Awarding Accreditation)	→	অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ডের প্রধান

চিত্র: ল্যাবরেটরি অ্যাক্রিডিটেশনের অগ্রগতি পর্যালোচনায় আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী ড. গ্লেন কেনেডি ও মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

সহায়তায় মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের গুণগতমান যাচাইয়ের কাজ চলছে। ল্যাবরেটরি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত কোয়ালিটি ম্যানুয়েল এর মাধ্যমে ল্যাবরেটরি পরিচালনা কার্যাদি সম্পন্ন হচ্ছে। ইতোমধ্যে কর্তৃপক্ষ ISO 17025 অনুসারে সুষ্ঠুভাবে ল্যাবরেটরি পরিচালনার জন্য ডেজিগনেটেড কোয়ালিটি ম্যানেজার ও টেকনিক্যাল ম্যানেজার নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। ল্যাবরেটরিসমূহ সফলভাবে প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট (PT) সম্পন্ন করেছে। আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে অ্যাক্রিডিটেশনের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের ল্যাবরেটরিসমূহ কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড কর্তৃক ঢাকাস্থ মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিকে ২৮ মে ২০১৩ খ্রি. তারিখে ISO/IEC 17025: 2005 অনুসারে অ্যাক্রিডিটেশন সনদ প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র: ঢাকাস্থ মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরির অ্যাক্রিডিটেশন সনদ

উপসংহার (Conclusion)

নতুন বিশ্ব ব্যবস্থায় গুণগতমান নিয়ন্ত্রণের সর্বক্ষেত্রেই ল্যাবরেটরি অ্যাক্রিডিটেশন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে পৌঁছে দেয়া এবং ভোক্তার বিশ্বাসযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে ল্যাবরেটরি অ্যাক্রিডিটেশন সনদ গ্রহণের বিকল্প নেই। মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিসমূহ উক্ত গুরুত্বের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে অতিসত্বর আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অ্যাক্রিডিটেশন সনদ অর্জনের যাবতীয় কাজ সুসম্পন্ন করবে বলে আশা করা যায়।

[১] প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ (psofiqcdof@gmail.com)
[২] মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ (mbhossain03@yahoo.com)

চিংড়ি বিপণন ব্যবস্থাপনা: প্রতিবন্ধকতা ও উন্নয়ন দিক নির্দেশনা

Shrimp Supply Chain: Challenges and a Framework for Improvement

ড. টি এস শেঠি[১] ও মোঃ রফিকুল ইসলাম[২]

Abstract

Shrimp aquaculture is an exclusively export-oriented activity in Bangladesh. The structure and dynamics of the shrimp supply chain is very long and complex resulting in a lack of accountability and this raises many issues regarding food safety and sustainability. The players of supply chain not only exploit profit of shrimp price depriving the ultimate producer of shrimp also cause the damages of the qualities delaying supply and improper handling as well. From the bottom of the supply chain, actors are Farmer, Faria, Arat, Dipot, Paiker/Supplier, Commission Agent and Processor. In order to ensure the compliance of safety issues of importing entities this long supply chain is needed to be simplified which also can ensure the appropriate price of shrimp to the farmer's and make the product's traceability easier. A framework of simplified supply chain must have a Collection centre at the close vicinity of farms most preferably to the cluster of farms coordinated by a Dipot owner. Dipots actually will collect shrimp for particular processors through spot bidding. To enable this system a coordinated efforts from farmers, dipots, processors, financial institutions and government is essential.

চিংড়ি চাষ এবং উৎপাদনের গতিধারা (Shrimp farming and production trend)

বাংলাদেশে বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষ প্রধানত ব্ল্যাক টাইগার শ্রিম্প বা বাগদা চিংড়ি (*Penaeus monodon*) এবং মিঠা পানির গলদা চিংড়ি (*Macrobrachium rosenbergii*)-এর ওপর নির্ভরশীল। ১৯৮৩ সালে ৫২ হাজার হেক্টরে এ চিংড়ি চাষ হত তা বর্তমানে ২ লক্ষ ২০ হাজার হেক্টরে গিয়ে পৌঁছেছে এবং চিংড়ির উৎপাদন ১৯৮৩ সালের ২,২২০ মে.টন হতে ২০১১ সালে ১,২৫,০০০ মে.টন এ বৃদ্ধি পেয়েছে। সমুদ্র হতে ধৃত চিংড়ির পরিমাণও ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত ২০১০-১১ অর্থবছরে বাংলাদেশ মৎস্য সাব-সেক্টর প্রায় ৬৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি আয় করেছে, যার প্রায় ৮০ শতাংশ এককভাবে চিংড়ির অবদান (ইপিবি, ২০১১)।

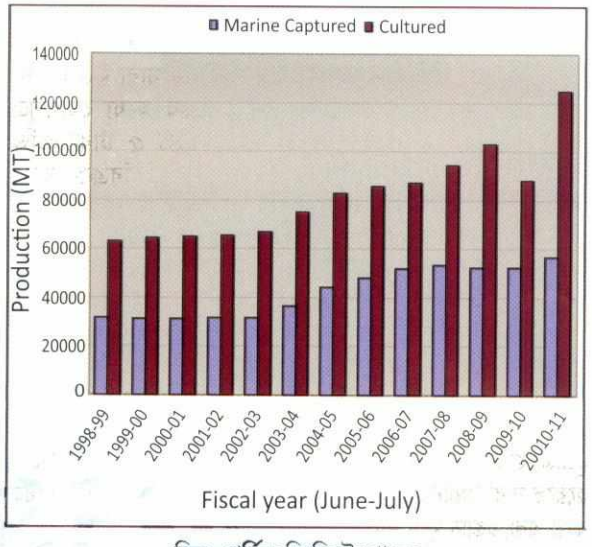

চিত্র: বার্ষিক চিংড়ি উৎপাদন

সারণি: ২০১০-২০১১ সালের জেলাভিত্তিক চিংড়ি চাষ এলাকা

জেলা	আয়তন (হেক্টর)		
	বাগদা চিংড়ি	গলদা চিংড়ি	মোট
খুলনা	৩৬৫৫৭.১৮	১৩৯৬০.৪২	৫০৫১৭.৬০
সাতক্ষীরা	৬০৩৪৮.০০	৭৬৬৪.০০	৬৮০১২.০০
বাগেরহাট	৪৭৯০০.০০	১৮৫৫৬.০৬	৬৬৪৫৬.০৬
চট্টগ্রাম	২০৭০.৯১	০	২০৭০.৯১
কক্সবাজার	৬২৯০৭.০০	০	৬২৯০৭.০০
অন্যান্য	৩৮৩৪.২	২২৬৯৬.৬৮	২৬৫৩০.৮৮
মোট	২১৩৬১৭.২৯	৬২৮৭৫.১৬	২৭৬৪৯২.৪৫

নিরাপদ চিংড়ি (Safe shrimp)

বর্তমান সময়ে ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী স্যানেটারি ও ফাইটোস্যানেটারি স্ট্যান্ডার্ড (SPS) এর অনুসরণীয় দিকসমূহ যথাযথ পালনপূর্বক বিদেশে নিরাপদ চিংড়ি রপ্তানি করতে হয়। যেমন মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক পণ্যের উৎস শনাক্তকরণ (traceability) এবং অনুজৈবিক (microbiological) ও রাসায়নিক (chemical) দূষণমুক্ততা নিশ্চিত করে যথাযথ প্রত্যয়নের মাধ্যমে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশে রপ্তানি করতে হয়। চিংড়ি শিল্প সরাসরি ১.২ মিলিয়ন লোকের কর্মসংস্থান করে এবং আরো ৪.৮ মিলিয়ন পরিবার এ খাতের সাথে সম্পৃক্ত।

চিংড়ি সরবরাহ ব্যবস্থা (Shrimp supply chain)

চিংড়ি সরবরাহ ও বিপণন ব্যবস্থায় সুবিধাভোগীর সংখ্যা ক্রমাগত আধিক্যের কারণে এসপিএস স্ট্যান্ডার্ড পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করা বেশ দুরূহ। এছাড়া চিংড়ি সরবরাহ ও বিপণন

পদ্ধতিতে বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী যেমন- পোনা, খাদ্য, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সরবরাহে নানা ধরনের মধ্যসত্বভোগী সংশ্লিষ্ট থাকায় সমষ্টিগতভাবে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য ও চিংড়ির মান অক্ষুণ্ন রাখা সম্ভব হয় না। চিংড়ি সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞানতা, চিংড়ি খামার হতে বিক্রয় কেন্দ্রের দূরত্ব, বাজার দরের তথ্য না পাওয়া, সর্বোপরি দাদন ব্যবসার শর্তের কারণে চাষি চিংড়ির ন্যায্য মূল্য পায় না। এ সমস্যা সমাধানকল্পে চিংড়ি চাষি, বিপণনকারী ও মৎস্যপণ্য প্রক্রিয়াকরণকারীদের মধ্যে কার্যকর সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে একটি নির্ভরযোগ্য চিংড়ি সরবরাহ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যেতে পারে।

চিংড়ি সরবরাহ ব্যবস্থার অবকাঠামো
(Framework of shrimp supply chain)

বাংলাদেশের চিংড়ি বিপণন ব্যবস্থা অধিক মধ্যসত্বভোগীর কারণে বেশ জটিল। এ ব্যবস্থায় চাষি পর্যায় থেকে ফড়িয়া, অতঃপর পর্যায়ক্রমে ছোট ডিপো, বড় ডিপো, আড়তদার, পাইকার, কমিশন এজেন্ট হয়ে সর্বশেষ প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় চিংড়ি সরবরাহ করা হয়ে থাকে। নিম্নে বাংলাদেশের চিংড়ি সরবরাহ পদ্ধতির ফ্লো-চার্ট দেখানো হলো।

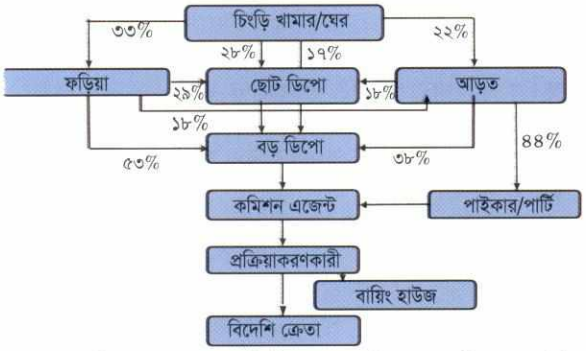

চিত্র: বাংলাদেশের চিংড়ি সরবারহ/বিপণন পদ্ধতির ফ্লো-চার্ট

চিংড়ি সরবরাহ ও বিপণন ব্যবস্থায় সুফলভোগীদের সম্পৃক্ততা
(Stakeholder involvement in shrimp supply chain)

চিংড়ি চাষি (Shrimp farmer): চিংড়ি সরবারহ/বিপণন ব্যবস্থায় প্রথম সংযোগকারী হলো চিংড়ি চাষি। চিংড়ি খামারের অবস্থান, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ওপর নির্ভর করে চাষিগণ সরাসরি খামারে ফড়িয়াদের নিকট অথবা ডিপো বা আড়তে চিংড়ি বিক্রয় করেন।

ফড়িয়া (Faria or collector): ফড়িয়াগণ চিংড়ি চাষিদের থেকে সরাসরি চিংড়ি ক্রয় করে ডিপোতে বিক্রয় করে থাকে। তারা খামার থেকে চিংড়ি ক্রয় করে একত্রিত করার সময় সাধারণত বরফ ব্যবহার করে না। গরিব ও প্রান্তিক চাষিগণ প্রায়শই চিংড়ি চাষের জন্য ফড়িয়াদের নিকট থেকে শর্তযুক্ত ঋণ (দাদন) গ্রহণ করে থাকে। ফলে চাষি চিংড়ির উচিত মূল্য হতে বঞ্চিত হন। ফড়িয়া ও ক্ষেত্র বিশেষ ডিপো পুশের মাধ্যমে রপ্তানিযোগ্য চিংড়ির মান ব্যাহত করে থাকে বলে ধারনা করা হয়।

আড়তদার (Auctioneer): চিংড়ি চাষি যারা ফড়িয়া বা আড়তদার এর নিকট থেকে দাদন গ্রহণ করে না বা চুক্তিবদ্ধ থাকে না, তারা তাদের উৎপাদিত চিংড়ি সরাসরি আড়ত বা নিলাম কেন্দ্রে বিক্রয় করতে পারেন। প্রত্যন্ত অঞ্চলে তা চাতাল হিসেবে পরিচিত। নিলামের মাধ্যমে চিংড়ি বিক্রয় করে চাষিগণ ডিপো অপেক্ষা বেশি মূল্য পেয়ে থাকেন এবং আড়তদারগণ কমিশন এজেন্ট হিসেবে কাজ করে।

ডিপো মালিক (Depot owner): ডিপো মালিকগণ ফড়িয়া এবং চিংড়ি চাষিদের নিকট থেকে চিংড়ি ক্রয় করে থাকেন। ডিপো মালিক তার নিকট চিংড়ি বিক্রয় করার মৌখিক শর্তে ফড়িয়া ও চিংড়ি চাষিগণকে ঋণ প্রদান করে থাকে। একইভাবে ডিপো মালিকগণ কমিশন এজেন্ট এর নিকট থেকে ঋণ নিয়ে থাকেন। ডিপো দুই প্রকারের যেমন- ছোট ডিপো এবং বড় ডিপো বা চালানি ডিপো। উভয় প্রকার ডিপো ফড়িয়া এবং চাষিদের নিকট থেকে চিংড়ি ক্রয় করে থাকে; কিন্তু বড় ডিপো ছোট ডিপো থেকেও চিংড়ি ক্রয় করে এবং চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় কমিশন এজেন্টের মাধ্যমে সরবরাহ করে থাকে। প্রত্যেক চিংড়ি ডিপো পরিচালনার জন্য সরকার থেকে লাইসেন্স নিয়ে থাকে এবং তাদের নির্দিষ্ট স্থাপনা থাকে। মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক আইন প্রয়োগ এর মাধ্যমে বিগত কয়েক বছরে ডিপোর মানোন্নয়নের কাজ করা হয়েছে ফলে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ইউএস বাজারে চিংড়ি রপ্তানির অনুসরণীয় মানদণ্ড বজায় রাখতে পারছে।

পাইকার/পার্টি (Whole saler): পাইকাররা বিপুল পরিমাণ চিংড়ি আড়তদারের নিকট থেকে সংগ্রহ করে থাকে। কোনো কোনো পাইকার কমিশন এজেন্টের প্রতিনিধি হিসেবেও কাজ করে থাকে। কোথাও এরা বেপারি হিসেবেও পরিচিত। তারা আড়তদারদের নিকট থেকে নিলামের মাধ্যমে বা ডিপো থেকে নমুনায়ন ও দর কষাকষির মাধ্যমে চিংড়ি ক্রয় করে প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় প্রেরণপূর্বক রিসিপ্ট নিয়ে কমিশন এজেন্ট থেকে টাকা সংগ্রহ করে থাকে।

কমিশন এজেন্ট (Commission agent): কমিশন এজেন্টগণ একাউন্ট হোল্ডার হিসেবে কাজ করে থাকেন যারা বড় ডিপো মালিক বা পাইকারের সাথে রপ্তানিকারকের মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করেন। কমিশন এজেন্টগণ সাধারণত ৫ টাকা প্রতি কেজি হিসেবে রপ্তানিকারকের নিকট চিংড়ি বিক্রয় করে কমিশন পেয়ে থাকেন। সর্বাধিক মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতের জন্য কমিশন এজেন্ট একাধিক প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার সাথে একাধিক একাউন্ট করে থাকেন।

প্রক্রিয়াকরণকারী/রপ্তানিকারক(Processor): প্রক্রিয়াকরণকারীরা কমিশন এজেন্টের মাধ্যমে পাইকার বা বড় ডিপো থেকে চিংড়ি ক্রয় করে প্রক্রিয়াজাত এবং রপ্তানি করে থাকে এবং তারা অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক রপ্তানি বাজারের মধ্যে চিংড়ি সরবরাহ/বিপণন ব্যবস্থার চূড়ান্ত ব্যক্তি। ইতোমধ্যে অন্য আরেক ধাপ বায়িং হাউজ আবির্ভূত হয়েছে যারা রপ্তানিকারকদের হয়ে বিদেশ থেকে রপ্তানি অর্ডার সংগ্রহ করে এবং রপ্তানি মূল্য নির্ধারণে ভূমিকা রাখে।

চিংড়ি সরবরাহ/বিপণনের দুইটি আকর্ষণীয় মডেল (Two effective models for supply chain)

OSP-BD মডেল: WAB Trading International এর Organic Shrimp Project (OSP) বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলায় ৩,৩০০ এর অধিক মালিকানাধীন ৪,৯০০ অধিক সংখ্যক খামারে প্রায় ৭,০০০ হেক্টর এলাকায় সংযোগ চাষির মাধ্যমে সমন্বিত পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ পরিচালনা করছে। সংযোগ চাষি জৈবিক (organic) পদ্ধতিতে তাদের খামারে চিংড়ি উৎপাদন করে এবং উৎপাদিত চিংড়ি OSP সরাসরি ক্রয় করে স্থানীয় চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় প্রক্রিয়াজাত করে। চিংড়ি চাষি ও OSP এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয় যে, চাষিরা বিনামূল্যে কারিগরি সহায়তা ও চিংড়ি সংগ্রহ কেন্দ্রে দ্রুত পরিবহনের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি পাবে। ফলে OSP দ্রুত ও দক্ষতার সাথে মানসম্পন্ন চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় স্থানান্তর করতে সক্ষম হয়।

চিত্র: OSP-BD এর চিংড়ি সরবরাহ পদ্ধতির ফ্লো চার্ট

প্রাণ (PRAN) এর দুগ্ধ সরবরাহ মডেল (Milk supply chain of Pran BD Ltd) : প্রাণের দুগ্ধ সরবরাহ চেইন এ শুধুমাত্র তিনটি ধাপ বিদ্যমান, যা খামারী, গ্রাম দুগ্ধ সংগ্রহ কেন্দ্র ও আঞ্চলিক দুগ্ধ সংগ্রহ কেন্দ্র। প্রাণের দুগ্ধ সরবরাহ মডেল নিচের চিত্রে দেখানো হলো:

চিত্র: প্রাণ পরিচালিত দুগ্ধ সরবরাহ চেইন

চিংড়ি সরবরাহ ব্যবস্থা সহজিকরণের সম্ভাব্য উপায় (Possible framework for simpler supply chain)

উপরে বর্ণিত দুটি উপযোগী সরবরাহ ব্যবস্থা থেকে অর্জিত জ্ঞানের আলোকে চিংড়ি শিল্পে লাগসই একটি মডেল সরবরাহ ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য BEST-BFQ প্রকল্প ফোকাল গ্রুপ ও সুফলভোগীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করে। মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা, সুফলভোগীদের মতামতের ওপর ভিত্তি করে চিংড়ি সরবরাহ চেইনের উপর যে সমন্বিত ব্যবস্থা ও করণীয় নির্ধারণ করা হয়েছে তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

চাষি	ডিপো	প্রক্রিয়াকারী
• নিবন্ধিত চাষিদল বা গুচ্ছ। • দলের সদস্যরা নিলাম কেন্দ্রে চিংড়ি আনবে। • চিংড়ির আকার অনুযায়ী বাজার মূল্যের তথ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরন।	• দেশি ও আর্ন্তজাতিক স্ট্যান্ডার্ডের অনুসরণ। • প্রত্যন্ত অঞ্চলে সংগ্রহ কেন্দ্র ও চাতাল গড়ে তোলা। • কেবল নিলামের মাধ্যমে চাষির চিংড়ি বিক্রয় ব্যবস্থা।	• নিয়ম পরিপালনকারী ডিপো বা সরাসরি চাষির নিকট হতে প্রক্রিয়াকারি কর্তৃক চিংড়ি সংগ্রহ। • দ্রুত ও নগদ মূল্য পরিশোধ। • বাস্তবায়ন ও উপকরণ যোগানে অগ্রণী দায়িত্ব পালন। • ট্রেসিবিলিটি অনুসরণ।

চিত্র: প্রস্তাবিত সরলিকৃত চিংড়ি সরবরাহ চেইন

চিংড়ি সরবরাহ চেইন সরলীকরণ বিষয়ে প্রস্তাবনা (Approaches for simplified supply chain)

সুফলভোগীদের মতামতের ভিত্তিতে দু'ধরনের ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতির প্রস্তাব করা হয়েছে। যথা- (১) স্থানীয়ভাবে তৎক্ষণাৎ ক্রয় (spot marketing) ও (২) উৎপত্তিস্থলভিত্তিক ক্রয় (direct sourcing)। লাইসেন্সধারী ডিপোর সহায়তায় নিলাম কেন্দ্র ও গ্রাম্য চাতালগুলো স্পট মার্কেটিং-এর ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে। অপরপক্ষে উৎসস্থল হতে সরাসরি ক্রয়ের ক্ষেত্রে গুচ্ছ (cluster) বা দলভিত্তিক চাষির মাধ্যমে চিংড়ি ক্রয় সম্পাদন করবে। চিংড়ি সরবরাহ চেইন সহজিকরণে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে:

১. চিংড়ি চাষ ঘন স্থানে চিংড়ি নিলাম কেন্দ্র স্থাপন করা হলে চাষি ও রপ্তানিকারক তৎক্ষণাৎ নিলাম কেন্দ্র থেকে ডিপোর সহায়তায় সরাসরি চিংড়ি ক্রয় বিক্রয় করতে পারেন। এতে মধ্যসত্বভোগীর সংখ্যা হ্রাস পাবে এবং চিংড়ির উচ্চমান রক্ষা ও ট্রেসিবিলিটি বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

২. অতি অল্প পরিমাণ চিংড়ি বিক্রয় ও নিলাম কেন্দ্রের দূরগম্যতার সমস্যা উত্তরণে ডিপো হিসেবে গ্রাম্য চাতাল প্রতিষ্ঠা করা।

৩. চিংড়ি খামারের উৎপাদনশীলতা ও রপ্তানিকারকদের অধিক চাহিদার বিষয়টি বিবেচনায় এনে সংযোগ চাষি পদ্ধতি প্রবর্তন করা যেতে পারে। এতে উৎপাদন বাড়বে এবং উৎপত্তিস্থল থেকে রপ্তানিকারক সরাসরি চিংড়ি ক্রয় করতে পারবে।

৪. বাংলাদেশের অধিকাংশ চিংড়ি চাষি ক্ষুদ্রাকৃতির হওয়ায় গুচ্ছ (cluster) বা দলভিত্তিক চাষ পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। এ বিষয়ে সাতক্ষীরা জেলায় OSP পরিচালিত গুচ্ছ চাষ পদ্ধতি বিবেচনায় আনা যেতে পারে।

৫. সরকার গুচ্ছভিত্তিক চিংড়ি চাষি সংগঠনগুলোকে একটি নীতিমালার আলোকে বৈধতা এবং গুড অ্যাকোয়াকালচার প্রাকটিস বাস্তবায়নে সার্বিক সহায়তা প্রদান করতে পারে।

৬. ক্ষুদ্র চিংড়ি চাষি এবং ডিপো মালিকদেরকে সহজ শর্তে (flexible) ঋণ এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৭. ঋণ প্রাপ্তির জন্য কারিগরি সহায়তা এবং ডিপো/খামার উন্নয়নে বন্ধকবিহীন ব্যক্তি ও দলভিত্তিক (group) ঋণ প্রদানের সুবিধা রাখতে হবে।

উপসংহার (Conclusion)

প্রান্তিক চাষির দলভিত্তিক চিংড়িচাষ ব্যবস্থা প্রবর্তন ভবিষ্যতে বাংলাদেশে ব্যাপক সাফল্য নিয়ে আসবে বলে আশা করা যায়। এতে নিরাপদ ও মানসম্মত অধিক চিংড়ি উৎপাদন ও চাষির আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। এছাড়া ক্ষুদ্র চাষিদের দক্ষতা বৃদ্ধি, অংশগ্রহণ নিশ্চিত ও সুফলভোগীদের মধ্যে অধিক সংযোগ ঘটবে। ফলে বাংলাদেশের উৎপাদিত চিংড়ির বাজার নিয়ন্ত্রণ ও তাদের চাহিদা পূরণে সহায়ক হবে।

[১] টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার, বেস্ট প্রজেক্ট, মৎস্য অধিদপ্তর (ts_shetty@yahoo.com)
[২] ন্যাশনাল কন্সালট্যান্ট, বেস্ট প্রজেক্ট, মৎস্য অধিদপ্তর

অনন্য বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ নদী : হালদা

The Halda : A River with Unique Characteristics

শেখ মুস্তাফিজুর রহমান

Abstract

Bangladesh is blessed with numerous natural gifts and river Halda is one of the best gifts of nature. From time immemorial, fishermen collect fertilized eggs of Indian major carps from this river. It is believed to be the richest natural spawning ground in this region and only in Bangladesh. It originates from Bangladesh and falls in another river of Bangladesh (Karnafuli). It is a sweet water river with unique biodiversity. Due to natural and manmade interventions, the production of Halda has considerably declined in the past days. The lowest production was recorded in 2004. The Government felt the potentials and contribution of the river and started a project entitled Restoration of Natural Breeding habitats of the Halda River. After that the spawning success is increasing trend comparing to the previous years. The interventions taken by the project is not enough to explore the potentiality of Halda. The river should be given more importance in national planning and should be handled more carefully. Natural factors are almost uncontrollable but we can stop or minimize manmade interferrence on it. This article has given some proposals to make Halda more productive and sustain the production at an optimum level.

পৃথিবীর সবচাইতে নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত দেশগুলোর অন্যতম বাংলাদেশ। কবির ভাষায়, এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি। অপার সৌন্দর্যের লীলাভূমি এ দেশটির প্রতিটি কোণে রয়েছে প্রকৃতির অকৃপণ দান। আমাদের জন্য দেশমাতৃকার অন্যতম উপহার হলো দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বয়ে চলা অনন্য বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ নদী হালদা। হালদার উৎপত্তি পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় উপজেলার বাদনাতলী পাহাড়শ্রেণি থেকে। অসংখ্য ছোট ছোট ছড়া, ঝিরি, নালা ক্রমাগত একত্রিত হয়ে হালদা নদীর সৃষ্টি। মোটামুটি ৮১ কিমি দৈর্ঘ্যের নদীটি চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি, হাটহাজারি ও রাউজান উপজেলা হয়ে চট্টগ্রাম শহরের কোতওয়ালী থানার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কর্ণফুলী নদীতে মিশেছে। এ নদীর প্রস্থ স্থানভেদে ৪৫ মিটার থেকে ২১৫ মিটার। বোয়ালিয়া, চ্যাংখালি, সোনাইমুখী, কাগতিয়া, পরালি, মোগদাই, কুমারখালি, মাদারি, বইজাখালি, কাটাখালি, খন্দকিয়া, সাকারদাসহ ১৮টি খাল, কাপ্তাই লেক ও জোয়ারভাটা হালদায় পানি সঞ্চালনে ভূমিকা পালন করে। কর্ণফুলী মোহনায় মৌসুমভেদে জোয়ারভাটা ২ থেকে ৪ মি পর্যন্ত পানি ওঠানামা করে। ভরা বর্ষায় পানির গভীরতা স্থানভেদে ৪ থেকে ১০ মি। হালদা স্থানীয় জনগণের জীবন-জীবিকায় তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। এটি বাংলাদেশের রুই জাতীয় মাছের একমাত্র বৃহৎ প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র এবং পৃথিবীতেও একমাত্র জোয়ার-ভাটার নদী যেখান থেকে রুই জাতীয় মাছের নিষিক্ত ডিম সংগ্রহ করা হয়। স্মরণাতীত কাল থেকে হালদা সংলগ্ন সাঙ্গু এবং চান্দখালী নদী স্থানীয় জেলেদের কাছে বৃহৎ আকারের রুই জাতীয় মাছের বিচরণক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত। প্রজনন সময়ে এ মাছ হালদা নদীতে ডিম ছাড়ে। ডিম সংগ্রহকারীগণ এ নিষিক্ত ডিম সংগ্রহ করে তা ফুটিয়ে রেণু করে মৎস্যচাষিদের নিকট বিক্রয় করে। নৌ পরিবহনের ক্ষেত্রে এ নদীর রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। বৃহৎ ও ক্ষুদ্রাকার নৌযানগুলো যথাক্রমে নাজিরহাট এবং নারায়ণহাট পর্যন্ত চলাচল করে। হালদা চট্টগ্রাম শহরের সুপেয় পানির চাহিদা মেটাতে প্রতিদিন প্রায় এক কোটি লিটার পানি সরবরাহ করছে। হালদার অতি উন্নতমানের বালু নির্মাণ শিল্পের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। অবৈধ হওয়া সত্ত্বেও হালদা থেকে বালু আহরণ থেমে নেই। জীববৈচিত্র্য রক্ষার্থেও এ নদীর রয়েছে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান।

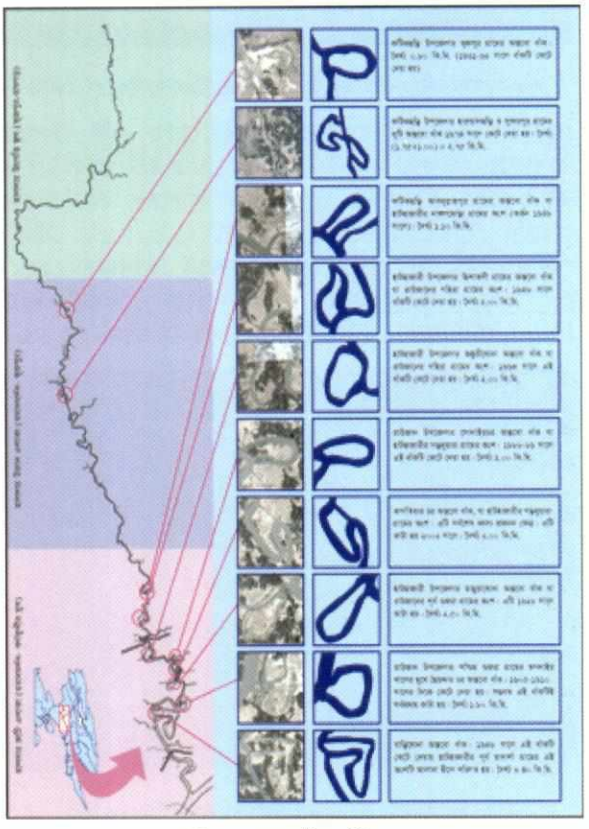

চিত্র: হালদা নদীর গতিপথ

প্রজননক্ষেত্র হিসেবে হালদার অনন্য বৈশিষ্ট্য
(Unique characteristics of Halda as breeding ground)

বাংলাদেশ এবং সন্নিহিত দেশসমূহ যথা- ভারত, মিয়ানমার, নেপাল ও পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য প্রজাতি হলো রুই, কাতলা, মৃগেল ও কালিবাউস। এদের বদ্ধ জলাশয়ে চাষ এবং পরিপক্ব করা সম্ভব হলেও এরা সেখানে প্রজনন করে না।

চিত্র: হালদা নদী থেকে রুই জাতীয় মাছের ডিম আহরণরত জেলে

প্রজননের জন্য এদের দরকার বাঁক, স্রোত, বৃষ্টি, উপযুক্ত তাপমাত্রা, ঘোলাত্ব ইত্যাদি। এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত হালদা নদীর ভৌত, রাসায়নিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ যথা- চাঁদের অবস্থান (পূর্ণিমা/অমাবস্যা), বৃষ্টিপাত (১.০-২.৮৮ সেমি), পানির স্রোত (১৬.৫-৮৫ সেমি/সেকেন্ড), তাপমাত্রা (২৫-২৮° সে), ঘোলাত্ব (৩০০-২১৫০ পিপিএম), পিএইচ মাত্রা (৭-৮), লবণাক্ততা (০ পিপিটি), দ্রবীভূত অক্সিজেন (+৬.৬

চিত্র: হালদা নদী থেকে আহরিত রুই জাতীয় মাছের ডিম

পিপিএম) ইত্যাদি সবগুলোই রুই জাতীয় মাছের প্রজননের জন্য অত্যন্ত উপযোগী হওয়ায় এরা এখানে ডিম ছাড়ে। কর্ণফুলীর পর হালদা চট্টগ্রাম অঞ্চলের দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী। বাংলাদেশের কার্প মাছের বিচরণক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত অন্যান্য নদী যথা-পদ্মা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র ইত্যাদির সাথে হালদার কোনো সংযোগ নেই বিধায় হালদা নদীর কার্প মাছের জীনগত স্টক সম্পূর্ণ অবিকৃত রয়েছে। হালদায় মোট ১১টি বাঁক ছিল কার্প জাতীয় মাছের প্রজননক্ষেত্র। নৌ-পথ কমানোর জন্য ইতোমধ্যে প্রায় সকল বাঁক কেটে নদীর গতিপথ পরিবর্তন করিয়ে দেয়ায় এক সময়ের স্বনামখ্যাত হালদার প্রজননক্ষেত্র আজ বিপদাপন্ন। সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে হালদা থেকে বিশুদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ জীনগত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন রুই জাতীয় মাছের রেণু প্রাপ্তি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যাবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বঞ্চিত হবে বাংলাদেশের প্রকৃতির অন্যতম একটি উপহার থেকে, যা হবে অত্যন্ত অনাকাঙ্ক্ষিত।

আহরিত রেণুর পরিমাণ কমার কারণসমূহ
(Reasons for decrease of egg production)

প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট নানা কারণে হালদা আজ আগের মত নেই। প্রধান হুমকির মধ্যে রয়েছে বিশ্বের অব্যাহত উষ্ণায়ন, এর ফলে সমুদ্রের উপরিতলের উচ্চতা বৃদ্ধি, অধিকতর মিষ্টি পানির এলাকায় লবণাক্ততা অনুপ্রবেশ, ঝড়, ঝঞ্ঝা, জলোচ্ছ্বাস, নদীর

চিত্র: হালদা নদীর পাড়ে নির্মিত অপরিকল্পিত ঘরবাড়ি

গভীরতা হ্রাস, গতিপথ পরিবর্তন, অব্যাহত ভাঙ্গন ইত্যাদি। মনুষ্যসৃষ্ট কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে নদীর বাঁক কর্তন, হালদা পাড়ে অসংখ্য কারখানা ও ইট ভাটা নির্মাণ, গৃহায়ন প্রকল্প গ্রহণ, নানা স্থানে ব্রীজ নির্মাণ, অপরিকল্পিত ড্রেজিং করে বালু আহরণ, সংযোগকারী খালগুলোর মুখে স্লুইস গেইট তৈরি, জাহাজ ও ইঞ্জিন বোটের শব্দ ও মাছের গায়ে প্রপেলারের আঘাত, নদীর উৎসমুখগুলোতে রাবার ড্যাম নির্মাণ, মা মাছ নিধন, কারখানার বর্জ্য নিক্ষেপ, ফসলের ক্ষেতে নির্বিচারে কীটনাশক ব্যবহার, জাল পেতে মা মাছদের বিচরণ সীমিতকরণ ও নিধন ইত্যাদি।

ডিম সংগ্রহের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এসব কারণে পূর্বের তুলনায় ডিম সংগ্রহের পরিমাণ ব্যাপকভাবে কমে গেছে, অপর পৃষ্ঠার সারণি থেকে এটা স্পষ্ট।

মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ
(Measures taken by DoF)

হালদা'র বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সরকার বিগত জুলাই ২০০৭ হতে জুন ২০১৩ মেয়াদে হালদা নদীর প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র পুনরুদ্ধার শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

সারণি: হালদা নদী হতে ডিম সংগ্রহের বিবরণ

বছর	সংগ্রহ	ডিম (কেজি)	রেণু (কেজি)	মন্তব্য
১৯৪৫	১২ এপ্রিল	১৩৬৫০০	৫০০০	
১৯৪৬	৩০ এপ্রিল	১৩৫৫০০	৪১১১	
১৯৪৭	২৩ এপ্রিল	১২৮৮০০	৪৯৬০	
১৯৫০	১৭ মে	৮৮৮৭০	৩৫৫০	
১৯৮৪	২০ মে	১৮৫৫০	৪৯৮	
১৯৯৭	২৯ মে	১১৭০০	৩০০	
১৯৯৮	১ জুন	৯৮০০	২৫৬	
২০০৩	২৩ মে	৫০০০	১৯৯	
২০০৪	২১ জুন	৭৮০	২০	সর্বনিম্ন
২০০৭	১৫ মে	১২৭০০	৩০৭	
২০০৮	১৯ মে	৫০০০	১২০	
২০০৯	২৪ মে	৭৫০০	১৮০	
২০১০	৩১ মে	৫৭০০	১৩৮	
২০১১	১৯ এপ্রিল ১৯ মে ১৬ জুন	১৩০৪০	৩২৬	
২০১২	৮ এপ্রিল ১ জুন	৩১০০০	১৫৬৯	
২০১৩	৪-৫ মে	১৩৫০০	৬২৫	মে পর্যন্ত

উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে ডিমের পরিস্ফুটন বৃদ্ধির জন্য হ্যাচিং ইউনিট তৈরি, হালদা হতে সংগৃহীত রেণু সংরক্ষিতভাবে লালন-পালনপূর্বক প্রজননক্ষম করে পুনরায় হালদায় অবমুক্তি, হালদার সুফলভোগীদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান, হালদা পাড়ে সরকারি খাস জায়গায় পুকুর পুনঃখনন করে হালদার সুফলভোগীদের মাধ্যমে হালদার মাছ প্রতিপালন করে হালদা নদীতে অবমুক্তকরণ, নাজিরহাট ব্রীজ হতে কালুরঘাট ব্রীজ পর্যন্ত অভয়াশ্রম ঘোষণা, বৃক্ষরোপণ, গবেষণা ও স্টাডি, প্রশিক্ষণ, গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা আয়োজন ইত্যাদি কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। এ প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত সুফল টেকসই রাখার জন্য ইতোমধ্যে হালদা নদী নিয়ে একটি নতুন প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া সারা দেশের জেলেদের চিহ্নিতকরণ ও পরিচয়পত্র প্রদানের অংশ হিসেবে হালদার প্রকৃত জেলেদের চিহ্নিত করে পরিচয়পত্র প্রদানের বিষয়টি সক্রিয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। মৎস্য সংরক্ষণ আইনকে সংশোধন করে ইতোমধ্যে নাজিরহাট ব্রীজ হতে কালুরঘাট ব্রীজ পর্যন্ত হালদার ৪০ কিমি অংশকে অভয়াশ্রম ঘোষণা করা হয়েছে।

হালদা রক্ষায় করণীয়

(Measures for protecting the Halda)

হালদা একটি মাল্টি ডাইমেনশনাল নদী এবং একে রক্ষাও সকলের সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমেই নিতে হবে। হালদা কীভাবে সর্বোচ্চ ক্ষমতায় ব্যবহৃত হতে পারে? শুধুমাত্র শস্য উৎপাদনে পানি সেচ? পানি সরবরাহ? নৌ পরিবহন? কলকারখানার বর্জ্য ফেলার উত্তম জায়গা? নাকি এশিয়ার একমাত্র জোয়ারভাটা সমৃদ্ধ বিশুদ্ধ জীনগত বৈশিষ্ট্যসম্বলিত রুই জাতীয় মাছের প্রজননক্ষেত্র হিসেবে সুরক্ষা?

জাতীয় পর্যায়ে করণীয়

(Measures to be taken at national level)

- হালদা নদীকে 'বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ' (ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট) ঘোষণার জন্য প্রাথমিকভাবে একে 'জাতীয় ঐতিহ্যের অংশ' (ন্যাশনাল হেরিটেজ সাইট) ঘোষণা করা।
- একে সংরক্ষণ করার জন্য 'হালদা নদী কমিশন' নামে একটি অতি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন, যার সদস্য থাকবে কৃষি, পরিবেশ, পানিসম্পদ, স্বরাষ্ট্র, শিল্পসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ, সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থাসমূহের প্রধানগণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিবৃন্দ, সুফলভোগী প্রতিনিধি, স্থানীয় সাংবাদিক প্রতিনিধিবৃন্দ প্রমুখ।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় পর্যায়ে করণীয়

(Measures to be taken at MoFL level)

হালদা যেহেতু মৎস্য সংক্রান্ত অনন্য বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ, তাই এ নদী রক্ষার বিস্তারিত পরিকল্পনা, কর্মসূচি প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত থাকা অধিকতর সঙ্গত। হালদা নদীর সাথে যেহেতু বেশ ক'টি মন্ত্রণালয় জড়িত তাই এ মন্ত্রণালয় হবে আন্তঃমন্ত্রণালয় কাজকর্ম সমন্বয়ের জন্য লিড মিনিস্ট্রি। এ মন্ত্রণালয় নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে:

- চলমান হালদা প্রকল্প ২০১২-১৩ অর্থবছরে সমাপ্ত হবে বিধায় নতুন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে হালদার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখা; এছাড়া বাজেটে রাজস্ব খাতে 'হালদা নদী সংরক্ষণ' শীর্ষক অর্থনৈতিক কোড খুলে তাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখা।
- হালদা রক্ষার জন্য প্রাপ্ত পরামর্শসমূহ বাস্তবায়নের জন্য একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা।
- হালদার পার্শ্ববর্তী খাস জমিসমূহ শুধুমাত্র হালদার উন্নয়নে ব্যবহারের জন্য সেগুলো মৎস্য অধিদপ্তরে ন্যস্ত করার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়কে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানানো।
- বিশেষজ্ঞ পরামর্শ অনুযায়ী হালদার প্রযোজ্য এলাকাসমূহে ড্রেজিং-এর ব্যবস্থা করার জন্য প্রকল্পে সংস্থান রাখা কিংবা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড-এর সহায়তা গ্রহণ করা।
- পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় অকেজো স্লুইস গেইটগুলো মেরামত করা এবং সকল স্লুইস গেইট মৎস্য ও জীববৈচিত্র্যবান্ধব করা এবং কেটে ফেলা বাঁকগুলোকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা, তা সম্ভব না হলে আর কোনো বাঁক যাতে ধ্বংস না হয় তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

- পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে হালদার পরিবেশ ধ্বংসকারী সকল কারণসমূহ চিহ্নিত করে তা অপসারণের ব্যবস্থা করা এবং অব্যাহত পরিবেশ ধ্বংসকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- হালদার উন্নয়নে গবেষণার ব্যবস্থা করা এবং মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে সেগুলো বাস্তবায়ন করা।
- জাতীয় সম্প্রচার সংস্থাসহ অন্যান্য সকল মিডিয়ায় হালদার গুরুত্ব সম্পর্কে নিয়মিত প্রচারের ব্যবস্থা করা।

মৎস্য অধিদপ্তরের করণীয়
(Measures to be taken by DoF)

- হালদা নদী ও এর বিগত সময় হতে এ পর্যন্ত যত তথ্য আছে সেগুলোকে সুসংহত করা ও হালদা সংক্রান্ত সকল তথ্যের মধ্যবর্তী স্তরের নির্ভরযোগ্য উৎস (সেকেন্ডারি সোর্স) হিসেবে কাজ করা।
- হালদার সুফলভোগীদের তালিকা সুনির্দিষ্ট করা এবং তাঁদের পরিচয়পত্র প্রদান ও বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
- মাছের প্রয়োজনীয় ঘনত্ব বজায় রাখার জন্য স্থানীয় সুফলভোগীদের মাধ্যমে হালদার শুদ্ধ জীনবৈশিষ্ট্য সম্পন্ন পোনা সুরক্ষিতভাবে লালনপূর্বক পরিণত (১ কেজির ওপরের সাইজের) করে হালদায় অবমুক্ত করা।
- উচ্চ শব্দ উৎপন্নকারী ও পানিতে প্রবল তাড়না সৃষ্টিকারী নৌযান চলাচল নিষিদ্ধ বা সীমিত করা। অগভীর পানিতে চলাচল উপযোগী হালকা নৌযান দিয়ে নিরবচ্ছিন্ন প্রহরার ব্যবস্থা করা। সংযোগ খালগুলোতেও কঠোর নজরদারী বজায় রাখা ও ঘন ঘন মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা।
- হালদায় ঝুলন্ত পায়খানা ব্যবহার সার্বিক নিষিদ্ধকরণ, পানিতে কোন বর্জ্য, কীটনাশক, ক্ষতিকর অপদ্রব্য নিক্ষিপ্ত হতে না পারে তার ব্যবস্থা নেয়া এবং এর কুফল সম্পর্কে সুফলভোগীদের অবহিত করা এবং এ বিষয়ে সময়ে সময়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা। হালদার দু'পাড়ের জমি ভূমি মন্ত্রণালয় হতে মৎস্য অধিদপ্তরে ন্যস্ত করার ব্যবস্থা করা এবং সেগুলোকে পুকুর তৈরির মাধ্যমে হালদা থেকে উৎপাদিত পোনা আবার হালদায় অবমুক্ত করার ব্যবস্থা করা এবং দেশের বিভিন্ন হ্যাচারিতে হালদার বিশুদ্ধ মাছের পোনা দিয়ে ব্রুড স্টক তৈরি অব্যাহত রাখা।
- হালদার দু'পাড়ে বনায়ন করা এবং হালদা থেকে অপরিকল্পিতভাবে বালি আহরণ বন্ধ করা।
- ছোট রুই জাতীয় পোনা রক্ষার্থে হালদার রাক্ষুসে মাছ বিজ্ঞানসম্মতভাবে এবং নিয়ন্ত্রিতভাবে অপসারণ করা।
- গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় পরিমাণ গভীরতায় খনন/পুনঃখনন করা এবং গড়দুয়ারা বাঁককে যতদূর সম্ভব পূর্বের অবস্থানে ফিরিয়ে আনা।
- হালদার পাড়ে অন্যান্য বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন মৎস্য প্রজাতির যথা গলদার হ্যাচারি স্থাপন করা।
- হালদার জন্য একটি সম্পদ ডেটাবেইজ তৈরি করা, এজন্য প্রয়োজনীয় স্টক অ্যাসেসমেন্ট করা এবং মাছের পরিমাণের সঙ্গে উৎপাদিত ডিম ও রেণুর পরিমাণ সাযুজ্যপূর্ণ কিনা তা খতিয়ে দেখা।
- সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সাথে সকল বিষয় সমন্বয় করা।

বিএফআরআই-এর করণীয়
(Measures to be taken by BFRI)

- হালদার জীববৈচিত্র্য, মৎস্য, হাইড্রোলজি, মাছের প্রজনন ও বিচরণক্ষেত্রের অভিপ্রয়াণ প্যাটার্ন, জলবায়ু পরিবর্তন ও মনুষ্যসৃষ্ট পরিবেশগত পরিবর্তনে মাছের ওপর প্রভাব, নৌযান চলাচলের ফলে এর শব্দ ও প্রপেলারের সম্ভাব্য আঘাতের প্রভাব, রাবার ড্যাম প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির প্রভাব সম্পর্কে গবেষণা করে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য মৎস্য অধিদপ্তরকে জ্ঞাত করা।
- হালদার বিশুদ্ধ স্টকের একটি মূল জীন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা।
- হালদায় মাছের বিচরণক্ষেত্র সুরক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা করে সম্ভাব্য ক্ষেত্র ও কী পরিমাণ খনন জীববৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকারক হবে না সে বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তরকে প্রতিবেদন পেশ ও পরামর্শ প্রদান।
- ট্যাগিংয়ের মাধ্যমে মাছের প্রজনন ও খাদ্যের অন্বেষণে অভিপ্রয়াণ রুট চিহ্নিতকরণ।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড-এর করণীয়
(Measures to be taken by BWDB)

- অকেজো ও ভরাট হয়ে যাওয়া স্লুইস গেইটগুলো পরিবর্তন করে মৎস্যবান্ধব করা। রাবার ড্যাম অপসারণ ও নতুন কোনো রাবার ড্যাম নির্মাণ না করা এবং উৎসমুখসহ নদীর পানির স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য পথের বাধাগুলো অপসারণ করা।
- মৎস্য অধিদপ্তর ও বিএফআরআই-এর সাথে সমন্বয়ক্রমে প্রযোজ্য স্থানে খনন করা।
- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে লবণাক্ততা বৃদ্ধির সম্ভাব্য দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব সম্পর্কে গবেষণা করা এবং প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী গৃহীতব্য কার্যক্রম সম্পর্কে মৎস্য অধিদপ্তরকে পরামর্শ প্রদান করা।

উপসংহার (Conclusion)

হালদা সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা হালদা রক্ষায় তাদের ওপর অর্পিত সকল দায়িত্ব সঠিকভাবে সম্পন্ন করার মাধ্যমে প্রকৃতির এ অনন্য দানের সুফল প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সঞ্চালিত করার মাধ্যমে হালদাকে বাঁচিয়ে রাখা অত্যন্ত জরুরি।

প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ (sumonazma@yahoo.com)

বাংলাদেশের মৎস্য সম্প্রসারণ কার্যক্রম: এর অপরিহার্য ভূমিকা ও চ্যালেঞ্জ

Bangladesh Fisheries Extension Activities : It's Indispensable Role and Challenges

মোঃ গোলজার হোসেন[১], খঃ মাহবুবুল হক[২] ও এ কে এম আমিনুল্লাহ ভূঞা[৩]

Abstract

The article, while introducing the Bangladesh Fisheries Extension Programme first articulates the evolutionary process it has experienced, since 1908, to reach the present stage. It is followed by the principles and the pillars upon which the programme is built. The introductory part ends with a listing of major activities carried out under the programme. The important contribution of the programme, in the form of sustained fish production increase, is then described elaborately. However, like all evolutionary processes, this one is also not without challenges. The continued success of this programme largely depends on successful meeting of the challenges. The article concludes with a way forward requiring reforming and strengthening of the present Extension Wing of the Department of Fisheries.

সম্প্রসারণ কর্মসূচির পরিচিতি (Introducing extension programme)

১. ক্রমবিবর্তন (The evolutionary process)

বাংলাদেশে মৎস্য সম্প্রসারণ কার্যক্রম বিগত প্রায় একশত বছরে বিভিন্ন সম্প্রসারণ পদ্ধতির (approach) বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় বর্তমান পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। এ সময়ে যে সব পদ্ধতি বা এপ্রোচ (approach) অবলম্বনে বর্তমানে অনুসৃত সম্প্রসারণ কর্মসূচি রূপ পেয়েছে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো :

ক. **সাধারণ সম্প্রসারণ পদ্ধতি:** এটি মূলত উপর থেকে নিচে (top-down) নির্দেশ/পরামর্শ চালিয়ে দেয়ার একটি সরকারি পদ্ধতি যেখানে সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের মতবিনিময়ের সুযোগ খুবই সীমিত।

খ. **পণ্যভিত্তিক বিশেষায়িত পদ্ধতি:** সরাসরি কিছু নির্দিষ্ট পণ্যের জন্য বিশেষায়িত সম্প্রসারণ পদ্ধতি যা মূলত ঐ পণ্যসমূহের প্রকৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এক্ষেত্রে সরকারের চেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করে থাকে ঐ পণ্যের উৎপাদক ও ব্যবসায়ী শ্রেণি। যেমন- চিংড়ি, পাঙ্গাস মাছ ইত্যাদি।

গ. **প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন ব্যবস্থা (Traning and visit system):** এটি মূলত উপরের ২নং পদ্ধতির সম্প্রসারিত রূপ যেখানে সরকারি ভূমিকা কিছুটা বেশি।

ঘ. **অংশগ্রহণমূলক সম্প্রসারণ পদ্ধতি:** এর মূলভিত্তি এই যে 'চাষিরাও অনেক কিছু জানেন'। তাদের অভিজ্ঞতা-অর্জিত জ্ঞানকে মূল্যায়িত করে সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি এটি। এ পদ্ধতিটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ঙ. **প্রকল্প পদ্ধতি:** সাধারণত সরকার বা/এবং দাতাসংস্থার আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত হয়। বিশেষ উৎপাদন প্রযুক্তি বা চাষ ব্যবস্থা নির্দিষ্ট সময়ে চাষির দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়াই এর প্রধান উদ্দেশ্য। বাংলাদেশের মত স্বল্পোন্নত দেশসমূহে যেখানে ব্যক্তিপুঁজির বিশেষ সীমাবদ্ধতা রয়েছে সেসব দেশে বিশেষভাবে কার্যকর। দৃষ্টান্তস্বরূপ মৎস্য অধিদপ্তরে চলমান প্রকল্প National Agricultural Technology Project (NATP), ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প, চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয় উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং দেশীয় প্রজাতির ছোট মৎস্য সংরক্ষণ প্রকল্প ইত্যাদি।

চ. **চাষব্যবস্থা উন্নয়ন পদ্ধতি:** ক্ষুদ্র চাষিদের উপযোগী, স্থানীয় প্রয়োজন-নির্ভর প্রযুক্তি সম্প্রসারণই মূল লক্ষ্য। মৎস্য অধিদপ্তরের চলমান 'অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাদপদ এলাকার জনগণের দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবিকা নির্বাহ নিশ্চিতকরণ প্রকল্প' এর একটি উদাহরণ।

২. সম্প্রসারণ কর্মসূচির নীতিমালা (Principles of extension programme)

বিবর্তনের ধারাবাহিকতার ফসল বর্তমান মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মসূচি প্রধানত নিম্নবর্ণিত ৫টি নীতি-নির্ভর :

ক. বিকেন্দ্রীকরণ (Decentralisation);
খ. সম্প্রসারণ সেবা লক্ষীকরণ (Targeting extension services);
গ. চাষির চাহিদা-অনুকূলতা বজায় রাখা (Responsiveness to farmer Needs);
ঘ. একগুচ্ছ সম্প্রসারণ পদ্ধতির সমাহার থেকে বাছাইকরণ (Selecting from a basket of approaches); এবং
ঙ. দলের সাথে কাজ করা (Working with groups)।

**বিগত ১৯০৮ সনে অবিভক্ত বাংলায় মৎস্য অধিদপ্তরের যাত্রা শুরু হলেও প্রথম দিকে কয়েক বৎসর বিভিন্ন কারণে এর কার্যক্রম বন্ধ থাকে। তাছাড়া প্রথমদিকে এর কার্যক্রম ছিল মূলত বাণিজ্যিক।*

সারণি: বিগত ১০ বৎসরের খাতওয়ারী মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি

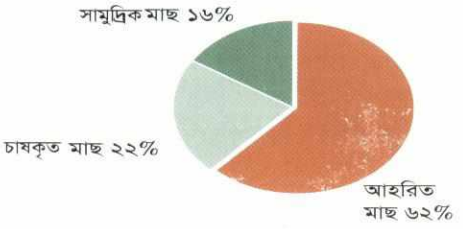

চিত্র: মৎস্য উৎপাদন ধারা: ১৯৮৩ - ৮৪
(মোট উৎপাদন ৭.৫৪ লক্ষ মে.টন)

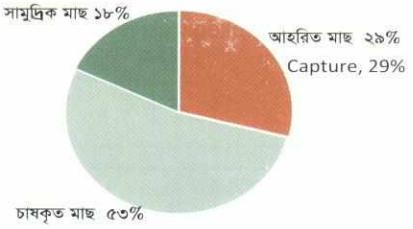

চিত্র: মৎস্য উৎপাদন ধারা: ২০১১ - ১২
(মোট উৎপাদন ৩২.৬০ লক্ষ মে.টন)

- ৬২ থেকে ২৯ শতাংশ (যদিও উৎপাদনের মোট পরিমাণ বেড়েছে)।
- মৎস্য উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রেই সম্প্রসারণ কর্মসূচি অবদান রেখেছে। যদিও তা প্রধান দুটি উৎসে বিপরীতধর্মী: আহরিত মাছের ক্ষেত্রে যা সংরক্ষণমূলক, চাষকৃত মাছের ক্ষেত্রে তা সরাসরি উৎপাদন বৃদ্ধিমূলক।

মৎস্য সম্প্রসারণের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ
(Major challenges of fisheries extension)

সময়ের দাবি মেনে নিয়ে সম্প্রসারণ কর্মসূচি এতদূর এগিয়েছে। মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মসূচি বর্তমানে যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী তা সার্থকভাবে অপনোদনের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর দৃঢ় প্রত্যয়ী। প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:

(১) বিকেন্দ্রীকরণে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ শক্তিশালীকরণ এবং ক্রমান্বয়ে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ।
(২) চাষির প্রয়োজন যথার্থভাবে নিরূপণ এবং তার প্রেক্ষিতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ।
(৩) সম্প্রসারণ সেবার মানোন্নয়ন এবং প্রয়োজন অনুসারে পরিসর বৃদ্ধিকরণ।
(৪) সম্প্রসারণের জন্য সম্ভাব্য সকল মাধ্যমের পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার (print, audio-visual, information and communication technology ইত্যাদি)।
(৫) বিশেষায়িত বিষয়াদি
- আহরিত মাছ (সংরক্ষণমূলক কার্যক্রমে জনসম্পৃক্ততা, বিশেষ করে জেলে সম্প্রদায়ের)
- চাষকৃত মাছ
  - নতুন জলাশয় অন্তর্ভুক্তকরণ (যেমন- হাওর, বাঁওড়, বিল, নিচু জলাশয়ের অংশবিশেষ ইত্যাদি)।
  - দেশি-বিদেশি নতুন প্রজাতি অন্তর্ভুক্তকরণ।
  - পরীক্ষিত ও প্রয়োজনীয় নতুন চাষ ব্যবস্থার প্রবর্তন, যেমন- খাঁচায় মাছ চাষ, বানায় মাছচাষ (pen culture), ছড়ায় মাছচাষ ইত্যাদি।
  - প্রচলিত চাষ ব্যবস্থাসমূহের নিবিড়করণ ইত্যাদি।
  - পরিবেশ রক্ষার প্রয়োজনে সকল ক্ষেত্রে Good Aquaculture Practices – GAPs, GMPs, HACCP এর প্রয়োগ।
- সামুদ্রিক মাছ - নতুন নতুন ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ, জেলে সম্প্রদায়কে অবহিতকরণ, মৎস্য আহরণ
  - আহরিত মাছের দেশি-বিদেশি বাজার সম্প্রসারণ।
- জেন্ডার বিবেচনা ও দারিদ্র্য বিমোচন।

(৬) উৎপাদন-পরবর্তী প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রসার - উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান বজায় রেখে ভোক্তার কাছে পৌছানো, সংশ্লিষ্ট জেলে, ব্যবসায়ী, ভোক্তাকে সংশ্লিষ্ট করে সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালন।
(৭) অর্থায়ন - সরকারি, বেসরকারি এবং অংশগ্রহণমূলক অর্থের যোগান ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।
(৮) সমন্বয়সাধন - দেশের সকল সম্প্রসারণ সেবাপ্রদানকারীর কার্যাবলির আন্তঃ সমন্বয়করণ এবং অধিদপ্তরের বিভিন্ন শাখার মাঝে অন্তঃসমন্বয়সাধন, বিশেষ করে Bangladesh Fisheries Policy - ১৯৯৮ এবং National Fisheries Strategy এর আলোকে সমন্বয়সাধন।

উপসংহার: সন্মুখপানে যাত্রায় প্রথম ধাপ
(Conclusion: The way forward)

উপরে বর্ণিত তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, টেকসই উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মৎস্য সম্প্রসারণ কার্যক্রমের গুরুত্ব অপরিহার্য এবং এ গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি সমন্বয় ও মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। চ্যালেঞ্জসমূহের কার্যকর মোকাবেলা করার জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন মৎস্য অধিদপ্তরের সম্প্রসারণ শাখার সংস্কার। সংস্কারের লক্ষ্য কেবল কর্মপরিসর বাড়ানোই নয়, এক্ষেত্রে অন্য যে বিষয়টি বিশেষ বিবেচনায় আনতে হবে তা হলো সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালনে পর্যাপ্ত সক্ষমতা অর্জন।

[১]উপপরিচালক (মৎস্যচাষ) এবং পরিচালক, প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রজেক্ট, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ (ddaqua@fisheries.gov.bd)
[২]সহকারী পরিচালক, প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রজেক্ট, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা
[৩]ট্রেনিং এন্ড কমিউনিকেশন এক্সপার্ট, প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রজেক্ট, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা

মৎস্য সেক্টর : জলবায়ু পরিবর্তন ও উন্নয়ন সম্ভাবনা

Fisheries Sector : Climate Change Impacts and Development Potential

ড. মোহাঃ সাইনার আলম[১] ও ড. আলী মুহাম্মদ ওমর ফারুক[২]

Abstract

Fisheries sector of Bangladesh has been playing a very significant role and deserves potential for future development in the agrarian economy of Bangladesh. Diversified fisheries ecosystems and fishing-based livelihoods are subjected to a wide range of climate-related variability, from extreme weather events such as- floods, droughts, changes in aquatic ecosystem structure and productivity to changing patterns and abundance of fish stocks. Human induced climate change is likely to cause major shifts in ocean system productivity and surface freshwater availability. The impact of long-term trends in climate change is less understood in fisheries sector. However, global ocean circulation patterns, sea level rise, changes in ocean salinity and pH, shifting coastline and rise in inland water and sea surface temperature and extreme event all of which would affect the enriched biological properties and distribution of aquatic species. Department of Fisheries has taken initiatives to address the climate change paradigm through intervening programmes, viz. habitat restoration, establishment and rehabilitation of fish sanctuary, introduction of saline tolerant and fast-growing species, expansion of aquaculture technologies suitable for flood/drought prone areas, expansion of cage and pen farming, beel nursery operation or fingerling stocking programme. Moreover, various social safety net programmes like introduction of VGF and AIGAs along with distributing eco-friendly fibre re-enforced plastic (FRP) boats, awareness and capacity enhancement at different stakes are initiated.

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য সেক্টরের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অনস্বীকার্য। যৌক্তিকভাবেই বলা যেতে পারে, এ দেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। ২০১১-১২ আর্থিক সালে ৩২.৬২ লক্ষ মে.টন মৎস্য উৎপাদন হয়েছে, যার চলতি মূল্যমান ন্যূনতম ৪০ হাজার কোটি টাকা। জাতীয় জিডিপিতে মৎস্য খাতের অবদান ৪.৩৯ শতাংশ এবং কৃষিতে মৎস্য খাতের অবদান প্রায় এক-চতুর্থাংশ (২২.৭৬ শতাংশ)। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৬০ শতাংশ যোগান দেয় মাছ, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত নিরাপদ, সহজলভ্য ও সস্তা প্রাণিজ আমিষ। দেশের জনগোষ্ঠীর ১১ শতাংশ তথা প্রায় ১৬৫ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ সেক্টরের বিভিন্ন কার্যক্রমে নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করে।

মৎস্যসম্পদ ও জলবায়ু পরিবর্তন
(Fisheries resources and climate change)

প্রকৃতি সব সময়ই পরিবর্তনশীল। এ পরিবর্তন বিভিন্নভাবে ঘটে। সূর্যের আলো ও তাপ বাড়া বা কমা এবং বৃষ্টি হওয়া বা না হওয়া এসব পরিবর্তন সহজে বোঝা যায়। এছাড়া বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা যেমন- বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, শৈত্যপ্রবাহ ইত্যাদি আমাদের জন্য আপদ। এ প্রাকৃতিক ঘটনাগুলো দেশের সকল খাতেই প্রভাব ফেলে। কখনও কখনও এ আপদগুলো দুর্যোগে পরিণত হয়, ক্ষতিগ্রস্ত করে দেশের প্রায় সকল মানুষকে, বিশেষ করে সেসব জায়গায় যেখানে দুর্যোগ প্রতিরোধের শক্ত ভিত গড়ে ওঠেনি। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বৈশ্বিক পর্যায়ে প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যেসব দেশ সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে তন্মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম।

ভৌগোলিক অবস্থান, নিচু সমতল ভূমি, অধিক জনসংখ্যা, দুর্বল অবকাঠামো, দুর্বল প্রশাসনিক কাঠামো, দারিদ্র্য এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর অধিক নির্ভরতার কারণে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ ও ঝুঁকির মাত্রা বেশি। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের উৎপাদনশীল প্রায় সকল খাতই কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশেষ করে কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, বাসস্থান, অবকাঠামো, স্বাস্থ্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশসহ জনকল্যাণমূলক সকল সেবা খাতের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে, যা ব্যাহত করবে আমাদের ধারাবাহিক আর্থ সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগের ফলে মৎস্যসম্পদের ওপর সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাবের বিষয়ে সম্যক ধারণা প্রদান করা হলো।

আইপিসিসি-এর চতুর্থ গবেষণা প্রতিবেদনে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যে সকল বিরূপ প্রভাবের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য এবং বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য কয়েকটি হলো:

ক. তাপমাত্রা বৃদ্ধি
খ. অতি বন্যা, অতিরিক্ত বৃষ্টি বা অসময়ে বৃষ্টি
গ. দীর্ঘমেয়াদী খরা তথা অনাবৃষ্টি
ঘ. সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি
ঙ. লোনা পানির অনুপ্রবেশ
চ. ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের প্রকোপ বৃদ্ধি

বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে, যেমন- ক. বদ্ধ জলাশয়, খ. অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয়, এবং গ. সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ। জলজসম্পদের সকল ক্ষেত্রেই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব আজ বেশ দৃশ্যমান। নানাবিধ প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট কারণে দেশের মৎস্যসম্পদ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে বা সংকটাপূর্ণ হচ্ছে দেশিয় মাছের প্রজাতি এবং সর্বোপরি

ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মাছের উৎপাদন ও সংশ্লিষ্ট সুফলভোগীদের জীবনমান। বিগত প্রায় তিন দশকে মৎস্য উৎপাদনের খাতওয়ারী উৎপাদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, ১৯৮৩-৮৪ সালে উন্মুক্ত জলাশয়ের অবদান ৬৩ শতাংশ হলেও ২০১১-১২ সালে এ খাতের অংশ দাঁড়িয়েছে মাত্র ২৯ শতাংশে।

আইইউসিএন-এর তথ্য মতে বাংলাদেশে ৫৪ প্রজাতির মিঠাপানির মাছের অবস্থা সংকটাপন্ন। ধারণা করা হচ্ছে, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে মৎস্যসম্পদের ওপর ঝুঁকি আরো বৃদ্ধি পাবে এবং ত্বরান্বিত হবে এ খাতের ক্রমাবনতি। নিম্নে মৎস্য সেক্টরে জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রভাব ও করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

ক. তাপমাত্রা ও খরার প্রকোপ বৃদ্ধি

জলাশয়ের ধরন	প্রভাব	করণীয়
বদ্ধ জলাশয়	▪ পুকুর শুকিয়ে যেতে পারে অথবা পুকুরে প্রয়োজনীয় পানির স্বল্পতা দেখা দিতে পারে। ▪ হ্যাচারিতে পোনা উৎপাদনে সমস্যা বেশ দৃশ্যমান এবং এ সমস্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে, ফলে মাছের পোনা প্রাপ্তিতে সংকট দেখা দেবে। ▪ পুকুরের পানিতে অতিরিক্ত উদ্ভিদ কণার স্তর জমে পানি দূষণ ঘটতে পারে, যেমন- তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে পুকুরে উর্বরতা অত্যধিক পরিমাণে বেড়ে গেলে ফাইটোপ্লাঙ্কটন ব্লুম দেখা দেয়। ▪ জৈবকণা পচনের মাত্রা বেড়ে পুকুর/ঘেরে অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। এর ফলে জলজজীবের স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যাহত হয়ে মাছের মড়ক দেখা দিতে পারে। ▪ মাছের নতুন নতুন রোগ দেখা দিতে পারে। ▪ দীর্ঘ সময় ধরে খরা থাকলে মাছের শুক্রাশয় বা ডিম্বাশয়ের সঠিক বৃদ্ধি ঘটে না, ফলে মাছের জৈবিক প্রক্রিয়ায় সমস্যা দেখা দিতে পারে।	▪ খননের মাধ্যমে পুকুরের গভীরতা বাড়ানো যেতে পারে। সাব-মার্সিবল টিউবওয়েল বসিয়ে ভূ-গর্ভ থেকে অথবা অন্যান্য উৎস থেকে পুকুরে পানি সরবরাহ করতে হবে। ▪ হ্যাচারির পানির তাপমাত্রা কমিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। ▪ পানির তাপমাত্রা সহনীয় পর্যায়ে রাখা এবং দূষিত গ্যাস বের করার জন্য পুকুরে নিয়মিত হররা টানা যেতে পারে। ▪ মাছ চাষের মৌসুমে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা যেতে পারে। ▪ শুষ্ক মৌসুমে কচুরিপানা দিয়ে পানির উপর শেড তৈরি করা যেতে পারে। ফলে পানি বেশি গরম হলে মাছ/চিংড়ি সেখানে আশ্রয় নিতে পারে। ▪ সম্ভব হলে জলাশয়ে অ্যারেটরের ব্যবস্থা করতে হবে। ▪ উচ্চতাপ সহিষ্ণু মাছের জাত উদ্ভাবনের পাশাপাশি দ্রুত বর্ধনশীল মাছ চাষ সম্প্রসারণ করা যেতে পারে। তাছাড়া বিরুপ পরিবেশে/অল্প পানিতে টিকে থাকতে পারে এ রকম মাছ চাষ করা যেতে পারে। ▪ পুকুরের পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। ▪ মাছের রোগাবালই প্রতিরোধের জন্য পুকুরের মাটি/ পানির গুণাগুণ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করার পাশাপাশি প্রয়োজনবোধে চুন প্রয়োগ করা যেতে পারে।
উন্মুক্ত জলাশয়	▪ খাল-বিল, নদী-নালা ও হাওর-বাঁওড়ের পানি শুকিয়ে যেতে পারে। ফলে শুষ্ক মৌসূমে পানির অভাবে মাছের আশ্রয়স্থল সংকুচিত হবে এবং প্রজননক্ষম মাছের পরিমাণ কমে যাবে। ▪ উন্মুক্ত জলাশয়ে বসবাসকারী কিছু প্রজাতির মাছ আবাসস্থল পরিবর্তন করতে পারে। ▪ মাছের প্রজনন ও অভিপ্রয়ানের সময় পরিবর্তন হলে প্রজাতি বৈচিত্র্য কমতে পারে। ▪ মাছের রোগ-ব্যাধির সংক্রমন বেড়ে যেতে পারে। ▪ কোন কোন মাছের প্রজাতি বিলুপ্ত হতে পারে অথবা আবাস পরিবর্তন করতে পারে। ফলে সার্বিকভাবে মাছের উৎপাদন কমে যেতে পারে। ▪ বিল, খাল ও নদীর শুকিয়ে যাওয়া অংশ কৃষি জমিতে রুপান্তরিত হতে পারে, ফলে মাছের আবাস সংকুচিত হতে পারে। ▪ মাছের প্রাকৃতিক ও আহরণজনিত মৃত্যুহার বাড়তে পারে।	▪ খাল-বিল, নদী-নালা ও হাওর-বাঁওড় খনন বা সংস্কারের মাধ্যমে মাছের অভয়াশ্রম স্থাপন করে শুষ্ক মৌসূমে মাছের মজুদ রক্ষা করতে হবে। তাছাড়া পরিবেশগতভাবে সংকটাপন্ন জলাশয়ে বিপন্ন প্রজাতির মাছের পোনা অবমুক্ত করা যেতে পারে। ▪ তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে জলজজীব তথা মৎস্যকুলের ওপর সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় লাগসই গবেষণা/জরিপ পরিচালনার পাশাপাশি এ সম্পদ রক্ষায় বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ নিতে হবে। ▪ মৎস্যজীবী তথা জলাশয়-সংশ্লিষ্ট সুফলভোগীদেরকে পরিবর্তিত ফিসিং গ্রাউন্ড সম্পর্কে ধারণা প্রদান ও তা সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। ▪ গবেষণার ফলাফল মৎস্যজীবীদের অবহিত করে তাদের দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। ▪ প্রজনন মৌসুমে মাছ ধরা বন্ধ রাখতে হবে এবং মাছের প্রজননক্ষেত্র রক্ষা করতে হবে। ক্ষতিকর জাল দিয়ে মাছ ধরা বন্ধ রাখতে হবে। ▪ রবি মৌসুমে কৃষি সেচের বিকল্প ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে জলাশয়ের সঠিক স্তর ধরে রাখা যায়। ▪ শুষ্ক মৌসুমের জন্য মাছের সংকটকালীন আবাস চিহ্নিত করে তা রক্ষা করতে হবে।

জলাশয়ের ধরন	প্রভাব	করণীয়
সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ	▪ মাছ ও চিংড়ির প্রজাতি বৈচিত্র্য ও প্রাপ্যতায় পরিবর্তন আসতে পারে। ▪ সাগর ও উপকূলের মাছ ও চিংড়িসহ অন্যান্য মৎস্যকূলের প্রজননে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। ▪ ইলিশসহ অন্যান্য মাছ ও চিংড়ির মাইগ্রেশন প্যাটার্নে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। ▪ ফিসিং গ্রাউন্ডের পরিবর্তন হতে পারে। ▪ প্রবাল ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। ফলে প্রবাল সমৃদ্ধ এলাকায় মাছের প্রজাতি বৈচিত্র্য ও উৎপাদন কমে যেতে পারে। ▪ সমুদ্রে অ্যাসিডিফিকেশন ঘটতে পারে, ফলে পানির পিএইচ বেড়ে যেতে পারে।	▪ মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া, হাঙ্গর, ইত্যাদি সাগরের সম্পদের ওপর (প্রজনন বৃদ্ধি, মাইগ্রেশন ও বিচরণক্ষেত্র) জলবায়ু পরিবর্তনের কি প্রভাব পড়বে সে বিষয়ে গবেষণা করে তার ফলাফলের ভিত্তিতে কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। ▪ প্রবালের ওপর তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রভাব নিয়ে গবেষণা করে করণীয় ঠিক করতে হবে। ▪ সামুদ্রিক কচ্ছপের ওপর তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রভাব নিরুপণ করে এদের রক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

খ. অতিবৃষ্টি ও বন্যা

জলাশয়ের ধরন	প্রভাব	করণীয়
বদ্ধ জলাশয়	▪ পুকুরে চাষকৃত দেশি/বিদেশি মাছ বাইরে ছড়িয়ে পড়তে পারে। ▪ বাইরের রাক্ষুসে ও অন্যান্য মাছ পুকুরে ঢুকে যেতে পারে। ▪ বাইরের আবর্জনা প্রবেশ করে পুকুরে পানি দূষণ ঘটাতে পারে। ▪ রোগ জীবাণুর প্রকোপ বেড়ে পুকুরের চাষকৃত মাছের মড়ক দেখা দিতে পারে।	▪ ক্ষতিগ্রস্ত পুকুর পাড় সংস্কার করতে হবে। ▪ জাল বা বানা ব্যবহার করে মাছ বের হয়ে যাবার পথ বন্ধ করতে হবে। ▪ বাইরের আবর্জনার প্রবেশ রোধ করতে হবে। আবর্জনা পুকুরে প্রবেশ করলে তা সরিয়ে ফেলতে হবে। ▪ রোগ-বালাই প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। রোগাক্রান্ত মাছ দ্রুত সরিয়ে নিতে হবে।
উন্মুক্ত জলাশয়	▪ অতি বন্যায় পুকুর ভেসে বিদেশি ও রাক্ষুসে মাছ উন্মুক্ত জলাশয়ে প্রবেশ করে জলজ জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে। ▪ মাছ আহরণের মৌসুমে পরিবর্তন আসতে পারে। ▪ মাছ ধরার কিছু সরঞ্জামের কার্যকারিতা কমে যেতে পারে। ▪ মাছের বিচরণ এলাকা বৃদ্ধির ফলে কিছু কিছু প্রজাতির উৎপাদন বাড়তে পারে। ▪ জলজ পরিবেশের পরিবর্তন হতে পারে।	▪ উন্মুক্ত জলাশয়ে বিদেশি ও রাক্ষুসে মাছের অনুপ্রবেশ রোধে চাষকৃত পুকুরে বানা/বেড়া দিতে হবে। ▪ মাছ চাষিদের সচেতন করতে হবে যাতে পুকুর ভেসে চাষকৃত বিদেশি/ক্ষতিকর মাছ উন্মুক্ত জলাশয়ে আসতে না পারে। ▪ পরিবর্তিত মৌসুম সম্পর্কে মৎস্যজীবীদেরকে অবহিত করতে হবে।
সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ	▪ অতি বৃষ্টি ও বন্যার কারণে সমুদ্রের উপকূলীয় এলাকায় মিঠা পানির আধিক্য হওয়ার ফলে লবণাক্ততার হঠাৎ পরিবর্তনজনিত কারণে মাছ/চিংড়ির মড়ক দেখা দিতে পারে।	▪ সমুদ্রের উপকূলীয় এলাকার নাব্যতা রক্ষার জন্য নদ-নদীর মোহনায় ড্রেজিং করতে হবে।

চিত্র: উপকূলীয় অঞ্চলে চাষযোগ্য মাছ ও কাঁকড়া

গ. সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও লোনা পানির অনুপ্রবেশ

জলাশয়ের ধরন	প্রভাব	করণীয়
বদ্ধ জলাশয়	▪ উপকূলীয় এলাকায় চিংড়ির ঘের ও মাছের পুকুর তলিয়ে/পাড় ভেঙ্গে যেতে পারে। ▪ উপকূলীয় এলাকার পুকুরে লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে রুই জাতীয় মাছসহ স্বাদুপানির মৎস্যচাষ ব্যাহত হবে। ▪ পুকুর/ঘেরের পানির ভৌত-রাসায়নিক গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ফলে স্বাদু পানির মাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হতে পারে। ▪ উপকূল এলাকায় গড়ে উঠা রুই জাতীয় মাছের খামার ও হ্যাচারিগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ▪ পুকুর পাড়ে সবজি/গাছপালা মারা যেতে পারে।	▪ চিংড়ি ঘের ও পুকরের পাড় উঁচু ও মজবুত করতে হবে। ▪ লোনা পানি সহনশীল মাছ (যেমন- ভেটকি, টেংরা, চিংড়ি, কাঁকড়া) চাষ করা যেতে পারে। খাঁচায় মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ করা যেতে পারে। এসব চাষযোগ্য প্রজাতির পোনার সরবরাহ কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে। ▪ বর্ষায় লবণাক্ততা কমে গেলে পুকুর/ঘেরে চিংড়ির সাথে রুইজাতীয় মাছের চাষ করা যেতে পারে। ▪ বর্ষায় লবণাক্তা কমে গেলে চিংড়ির সাথে রুই জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ করা যেতে পারে। ▪ চিংড়ির ঘেরে লবণাক্ততা সহিষ্ণু ধানের চাষ করা যেতে পারে। ▪ মৎস্যচাষি/ মৎস্যজীবীদের লোনা পানির মাছ, চিংড়ি ও কাঁকড়া চাষের ওপর প্রশিক্ষণ দেয়াসহ প্রয়োজনীয় উপকরণ দেয়া যেতে পারে। ▪ আপদকালীন সময়ে বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে।
উন্মুক্ত জলাশয়	▪ প্যারাবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে নানা জাতের মাছ, চিংড়ি ও কাঁকড়ার প্রজনন ও নার্সারিক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে মাছের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ চিংড়ি ও পরিব্রাজনশীল ইলিশ মাছের প্রজননক্ষেত্রের বিস্তৃতি ও মাইগ্রেশন প্যাটার্নে পরিবর্তন আসতে পারে। ▪ উপকূল এলাকায় প্রজাতি বৈচিত্র্যে পরিবর্তন আসতে পারে, তথা- স্বাদু পানির মাছের উৎপাদন কমে যাবে এবং কোন কোন প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। ▪ হালদা নদীতে রুই জাতীয় মাছের প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ স্বাদুপানির মাছের প্রজাতির ওপর বিরুপ প্রভাব পড়বে। ▪ প্রচলিত মৎস্য আহরণ মৌসুমে পরিবর্তন হতে পারে। ▪ ঝড় ও জলোচ্ছাসের প্রকোপ বৃদ্ধির ফলে দেশের বিভিন্ন জলাশয়ের প্রতিষ্ঠিত অভয়াশ্রমগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ জলোচ্ছাসের কারণে মাটি/বালি পড়ে উপকূল এলাকার বিল, খাল ও নদীর নাব্যতা কমে মাছের আবাস সংকুচিত হতে পারে।	▪ ইলিশ ও চিংড়ি মাছের ওপর সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির প্রভাব সংক্রান্ত গবেষণা ও জরিপ করতে হবে। ▪ স্বাদুপানির মাছের ওপর জরিপ ও গবেষণা পরিচালনা করে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে করণীয় নির্ধারণ করতে হবে। ▪ বিদ্যমান প্যারাবন রক্ষার পাশাপাশি নতুন করে প্যারাবন সৃজন করতে হবে। ▪ লোনাপানির অনুপ্রবেশের ফলে উন্মুক্ত জলাশয়ের মাছের ওপর কি প্রভাব পড়বে তার ওপর গবেষণা করে সে মোতাবেক পদক্ষেপ নিতে হবে। ▪ হালদা নদীতে রুই মাছের প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র ও রেণু পোনার ওপর লোনা পানির অনুপ্রবেশের প্রভাব সংক্রান্ত গবেষণা করে তার ফলাফলের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিতে হবে। ▪ ইলিশের প্রজনন ও পোনার ওপর লোনা পানি অনুপ্রবেশের প্রভাবের ওপর জরিপ ও গবেষণা করতে হবে।
সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ	▪ সাগর ও উপকূলের ইলিশ মাছের প্রজনন ও বিচরণ ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসতে পারে। ▪ প্রবালের ক্ষতি হতে পারে এবং এর ওপর নির্ভরশীল মাছের প্রজাতি বৈচিত্র্য কমে যেতে পারে। ▪ ফিসিং গ্রাউন্ডের পরিবর্তন ঘটতে পারে। এবং মাছ ও চিংড়ির মাইগ্রেশনে পরিবর্তন ঘটতে পারে। ▪ উপকূল এলাকায় মাছের প্রজাতি বৈচিত্র্য ও প্রাপ্যতায় পরিবর্তন আসতে পারে।	▪ সামুদ্রিক ও উপকুলীয় মৎস্যসম্পদের ওপর সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির প্রভাব নিয়ে গবেষণা করে তার ফলাফলের ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ▪ ইলিশ সংরক্ষণে বর্তমান চলমান নীতিমালা ও কার্যক্রম পরিবর্তন আনতে হতে পারে। ▪ এ বিষয়ে পাশ্ববর্তী দেশসমূহের সাথে যৌথভাবে গবেষণা করা যেতে পারে।

ঘ. জলোচ্ছ্বাসের মাত্রা ও তীব্রতা বৃদ্ধি

জলাশয়ের ধরন	প্রভাব	করণীয়
বদ্ধ জলাশয়	▪ পুকুর ভেসে মজুতকৃত মাছ বেরিয়ে যেতে পারে। ▪ লোনাপানি ঢুকে যেতে পারে অথবা মাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হতে পারে। ▪ পুকুরে ময়লা-আবর্জনা ঢুকে পানি দূষণ হতে পারে। ▪ বালি/ঘোলা পানি প্রবেশ করার ফলে পুকুরের গভীরতা কমে যেতে পারে। ▪ গাছপালা ভেঙ্গে পুকুরের পানিতে পড়ে দূষণ ঘটাতে পারে।	▪ জলোচ্ছ্বাসের আগাম সংকেত পাবার সাথে সাথে সম্ভব হলে মাছ ধরে বিক্রি করতে হবে। ▪ জলোচ্ছ্বাসের সম্ভাব্য সময়ের সাথে সমন্বয় করে মাছ চাষের মৌসুম পূনঃনির্ধারণ করা যেতে পারে। ▪ পুকুর পাড় উঁচু করা যেতে পারে এবং খাঁচায় মাছ চাষের ক্ষেত্রে খাঁচাগুলোকে আরও শক্ত করা যেতে পারে। ▪ সহজে ভেঙ্গে না যায় এরকম গাছ লাগাতে হবে এবং গাছগুলোর ডাল-পালা ছেটে রাখতে হবে। ▪ জলোচ্ছ্বাসের ক্ষতি মোকাবেলা করার কৌশলের ওপর মাছ চাষিদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
উন্মুক্ত জলাশয়	▪ দেশের বিভিন্ন জলাশয়ে প্রতিষ্ঠিত অভয়াশ্রমগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ প্যারাবন ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে মাছ, চিংড়ি ও কাঁকড়াসহ নানাবিধ জলজ প্রাণীর প্রজনন ও বিচরণক্ষেত্র নষ্ট হতে পারে। ▪ জলোচ্ছাসের কারণে মাটি/বালি পড়ে উপকূল এলাকার বিল, খাল ও নদীর নাব্যতা কমে মাছের আবাস সংকুচিত হতে পারে	▪ উপকূলব্যাপী প্যারাবন সৃষ্টি করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্থ প্যারাবন পুনঃস্থাপন করতে হবে। ▪ অভয়াশ্রমের দল-কাঠাকে শক্ত করে বেঁধে রাখতে হবে। ▪ জলোচ্ছাসের কারণে ভরাট হয়ে যাওয়া বিল, খাল ও নদী খনন করতে হবে।
সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ	▪ মাছ ও চিংড়ির প্রজাতি বৈচিত্র্য ও উৎপাদনে পরিবর্তন ঘটতে পারে। ▪ প্যারাবন ও কোরাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে মাছের প্রজনন ও নার্সারি ক্ষেত্র নষ্ট হতে পারে। ▪ সামুদিক মাছ, চিংড়ি ও কাঁকড়ার প্রজনন ও নার্সারিক্ষেত্র নষ্ট হতে পারে।	▪ সাগর ও উপকূলের মৎস্য সম্পদের ওপর ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের প্রভাব নিয়ে গবেষণা করে তার ফলাফলের ভিত্তিতে পদক্ষেপ নিতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় ইতোমধ্যেই পরিবেশ-সহিষ্ণু ও সুফলভোগী-বান্ধব বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। অগ্রাধিকার প্রদান করা হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনায়। সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে- অবক্ষয়িত আবাসস্থল পুনরুদ্ধার, মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ, লবণাক্ততা-সহিষ্ণু ও দ্রুত বর্ধণশীল মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ, খাঁচায় ও পেনে মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ, জীববৈচিত্র্য রক্ষার পাশাপাশি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিল নার্সারি কার্যক্রম পরিচালনা ও পোনা অবমুক্তকরণ, উপযুক্ত প্লাবনভূমিতে মৎস্যচাষ কার্যক্রম গ্রহণ, ক্ষতিগ্রস্থ মৎস্যজীবীদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আপদকালীন সময়ে খাদ্য সহায়তা কার্যক্রম গ্রহণ। উপকূলীয় এলাকায় জলাবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ সুফলভোগীদের জীবনমান সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে কাঁকড়ার পাশাপাশি অন্যান্য সম্ভাবনাময় মাছের প্রজাতির (যেমন- কোরাল/ভেটকি, মুলেট, সামুদ্রিক টেংরা ইত্যাদি) চাষ সম্প্রসারণের লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। উপকূলীয় মৎস্যজীবীদের মৎস্য আহরণ আরো নিরাপদ করার লক্ষ্যে পরিবেশ-বান্ধব ও আধুনিক নৌকা বিতরণ কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

উপসংহার (Conclusion)

মৎস্যখাতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব হবে দীর্ঘ মেয়াদী ও বহুমুখী। তাই এ খাতে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলার সম্ভাব্য কার্যক্রমগুলো প্রাতিষ্ঠানিক রুপ দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। জাতীয় মৎস্য নীতি ১৯৯৮ এবং এর আলোকে প্রণীত জাতীয় মৎস্য কৌশল ও কর্মপরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অভিযোজনের মাধমে আমাদের টিকে থাকতে হবে। টিকে থাকার জন্য অভিযোজন টুলসগুলো কী কী হবে সেটা নির্ধারণই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর এজন্য প্রয়োজন সবার সম্মিলিত উদ্যোগ ও কার্যকর পদক্ষেপ।

১ সহকারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ (sainardof@yahoo.com / sainarnatp@gmail.com)
২ সহকারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
কৃতজ্ঞতায়: হুমায়ুন কবির, প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, সিডিএমপি-২ (ডিওএফ পার্ট)

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় সুন্দরবনের গুরুত্ব : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত
Importance of the Sundarbans in Marine Fisheries Resource Management : Bangladesh Perspective

এ বি এম আনোয়ারুল ইসলাম[১], মোঃ শফিকুল ইসলাম[২] ও মোহাঃ আতিয়ার রহমান[৩]

Abstract

The Sundarbans is bestowed with wide range of aquatic flora and fauna reckoning a hub of aquatic biodiversity. Around 177 species of fish and 24 species of shrimp are found in the Sundarbans. Annual fish production was estimated as 22,451 mt during 2010-11. Aquatic habitat of this largest mangrove forest offers most important natural breeding and nursery ground of freshwater, coastal and marine fish, shellfish and other aquatic biota. The life cycle of most of the fishes of the Bay of Bengal are directly or indirectly related to the Sundarbans mangroves. Fishes are caught by various artisanal and industrial fishing gears in each stages of their lifecycle from inshore to offshore waters. Extensive survey and research is crucial into the marine environment including the Sundarbans for assessing the 'Standing Stock', `Maximum Sustainabe Yield' and other attributes for strenghthening Monitoring, Control and Surveillance (MCS) System. The Department of Forest has control over the activities in the Sundarbans by law and the Department of Fisheries has limited access in Sundarbans fisheries management and restricting activities related to fisheries MCS. Bangladesh Marine Fisheries Capacity Building Project has initiated activities to support improved management practices into the Sundarbans.

বাংলাদেশের উপকূলীয় জলভাগ ও সন্নিহিত বঙ্গোপসাগর নানা প্রজাতির মাছ ও চিংড়ি ছাড়াও বিপুল সামুদ্রিক মৎস্য জীববৈচিত্র্যের আধার। মোহনা ও উপকূলীয় প্যারাবনসমৃদ্ধ জলাভূমি সামুদ্রিক প্রাণিজগতের বংশবৃদ্ধি ও জীবনচক্রের প্রাথমিক পর্যায়ে বেড়ে উঠার জন্য নিবিড় ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত। বঙ্গোপসাগরের অধিকাংশ মৎস্য প্রজাতি স্ব স্ব জীবনচক্রে সুন্দরবনের ওপর নির্ভরশীল। অপরদিকে উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে সনাতনী জাল-সরঞ্জামাদি ব্যবহার হয়ে আসছে। আর ট্রলজালসহ নানা আধুনিক ও উন্নত মৎস্য আহরণ উপকরণাদি সংযুক্ত হয়ে উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর প্রাণিজ আমিষ চাহিদা ও রপ্তানি বেড়ে যাওয়ায় সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ বৃদ্ধি পেয়েছে। চিংড়ি চাষে অধিক হারে পোনা মজুদের আগ্রহ সৃষ্টি হওয়ায় প্রাকৃতিক উৎস তথা মোহনা ও উপকূলভাগের জলাভূমি থেকে বাগদা চিংড়ির পোনা আহরণও বৃদ্ধি পায়। ফলে প্রকৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য পোনা ও অন্যান্য প্রাণী প্রজাতি নিধন হতে থাকে। অধিক মাত্রায় মৎস্য নৌযান ও জাল-সরঞ্জামাদি বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট অতিআহরণ মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে যেমন ঝুঁকিপূর্ণ, তেমনি অপ্রাপ্তবয়স্ক মৎস্যপোনা আহরণও ক্ষতিকর। এর কারণে বঙ্গোপসাগরের মৎস্যসম্পদ আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পেতে পারে। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনার সাথে উপকূলীয় প্রতিবেশ সরাসরি সম্পর্কিত বিধায় মোহনাঞ্চল ও সমুদ্রের বিশাল জলরাশির ব্যবস্থাপনার সমন্বয় জরুরি।

সুন্দরবন (The Sundarbans)

বাংলাদেশের সমগ্র উপকূল জুড়েই কম-বেশি প্যারাবন (mangrove forest) রয়েছে। তবে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ও পশ্চিমবঙ্গের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে নিম্ন গাঙ্গেয় জোয়ার-ভাটার সমতলভূমিতে অবস্থিত 'সুন্দরী'

চিত্র: সুন্দরবনের প্যারাবন ও নদীর একাংশ

গাছসমৃদ্ধ সুন্দরবনই সর্ববৃহৎ। এর মোট আয়তন প্রায় ১০,০০০ বর্গকিলোমিটার, তন্মধ্যে বাংলাদেশের সীমানায় প্রায় ৬,০১৭ বর্গকিলোমিটার। অসংখ্য নদী-খাল-নালা মাকড়সার জালের মতো সমগ্র বনাঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। এ অঞ্চলে অগণিত নানা আকৃতির ছোট ছোট চর বা দ্বীপ রয়েছে। সুন্দরবন অঞ্চল নদীবাহিত স্বাদুপানি ও সমুদ্রের লোনা পানির মিশ্রনস্থল। সুন্দরবনে মূলত দু'ধরনের প্রতিবেশ রয়েছে। একটি মৌসুমি বন্যায় প্লাবনপ্রবণ স্বাদুপানির জলাভূমি (swamp) সমৃদ্ধ ভেতরের দিকের বনাঞ্চল এবং আরেকটি লবণ পানিতে বেড়ে ওঠা বাইরের প্যারাবনের উপকূলীয় বেষ্টনী।

প্যারাবনের উপকূলীয় বেষ্টনী মাত্র কয়েক মিটার থেকে শুরু করে কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত প্রশস্ত। সুন্দরবনের প্যারাবনসমৃদ্ধ অঞ্চলের আয়তন প্রায় ৪,১৪৩ বর্গকিমি, তন্মধ্যে নদী-খাল-নালা ইত্যাদির পরিমাণ প্রায় ১,৮৭৪

বর্গকিমি। সুন্দরবন ১৮৭৮ সালের বন আইনে 'সংরক্ষিত বনাঞ্চল' হিসেবে ঘোষিত। ইউনেস্কো এ এলাকাকে 'বিশ্ব ঐতিহ্যপূর্ণ এলাকা' হিসেবে ঘোষণা করেছে। এছাড়াও পরিবেশ আইনে ১৯৯৯ সালে সুন্দরবনের উপকূলীয় প্যারাবন বেষ্টনী 'পরিবেশগতভাবে বিপন্ন এলাকা' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সুন্দরবন মৎস্যসম্পদ ছাড়াও ডলফিন ও কচ্ছপসহ অসংখ্য বন্যপ্রাণীর প্রাকৃতিক অভয়ারণ্য। গোলপাতা, কাঠ, মধু ও মৎস্যসম্পদ আহরণের কারণে সুন্দরবনের অর্থনৈতিক গুরুত্বও অপরিসীম। প্রায় দুই লক্ষ মৎস্যজীবী সুন্দরবনে মৎস্য আহরণ করে থাকে। চিংড়িপোনা আহরণের সাথেও নারী-শিশুসহ অসংখ্য স্থানীয় জনগোষ্ঠী জড়িত। ঝড়-জলোচ্ছ্বাস, লবণাক্ততা বৃদ্ধিসহ নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং গাছপালা নিধন, কাঁকড়া ও চিংড়ি পোনা আহরণসহ মনুষ্যসৃষ্ট নানা কারণে সুন্দরবন প্রতিনিয়ত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

সুন্দরবনের মৎস্যসম্পদ
(Fisheries resources of the Sundarbans)

সুন্দরবনে স্বাদুপানি ও লবণাক্ত পানির মিশ্রণস্থল হওয়ায় এখানকার পানিতে মধ্যম মানের লোনাপানির অস্তিত্ব বিদ্যমান যা মৌসুমভেদে পরিবর্তিত হয়। এধরনের প্রতিবেশ স্বাদুপানি ও সামুদ্রিক উভয় প্রজাতির জলজ প্রাণীর প্রজনন ও পোনা প্রতিপালনের জন্য খুবই উপযোগী। নদীবাহিত পলিমাটি ও প্যারাবনের ঝরাপাতা মৎস্য প্রজাতিসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় জলজ উদ্ভিদকণা ও প্রাণিকণা উৎপাদনের অনুকূল পুষ্টি সরবরাহ করে। ফলে সুন্দরবন সারাবছরই মৎস্য প্রজাতিসমূহের লালন ও প্রতিপালন ক্ষেত্র হিসেবে সমগ্র বঙ্গোপসাগরের মৎস্য জীববৈচিত্র্যকে প্রভাবিত করে থাকে। এই ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল থাকার ফলেই বঙ্গোপসাগর মৎস্যসম্পদে ভরপুর এবং মৎস্য প্রজাতির সংখ্যাও অন্যান্য সাগরের তুলনায় অনেক বেশি। সুন্দরবনের বিভিন্ন সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতির জুভেনাইলসমূহ উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের অধিকাংশ মৎস্যসম্পদের যোগান দিয়ে থাকে। সুন্দরবনের অতি সন্নিকটে অতলস্পর্শ মহীখাদ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বাণিজ্যিকভাবে আহরিত ৯১টি প্রজাতির মৎস্য ও ৯টি প্রজাতির চিংড়ি পাওয়া যায়, যার মধ্যে রপ্তানি গুরুত্বপূর্ণ উপরিস্তরের দ্রুতগতিসম্পন্ন টুনা, ম্যাকারেল, সার্ডিন, চাপাকড়ি, কামিলা, ছুড়ি, হাঙর ইত্যাদি মৎস্য প্রজাতিসমূহও উল্লেখযোগ্য। সুন্দরবনে প্রায় ১৭৭ প্রজাতির মাছ, ২৪ প্রজাতির চিংড়ি ও ৭ প্রজাতির কাঁকড়া পাওয়া যায়। মৎস্য প্রজাতির মধ্যে ভেটকি, ইলিশ, পারশে, বাটা, লইট্টা, রূপচান্দা, পাঙ্গাস, তাপসী, তাইল্লা, বাইল্লা, পোয়া, টেংরা ও হাউস মাছ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে পাওয়া যায়।

সামুদ্রিক চিংড়ি প্রজাতির মধ্যে বাগদা, লইল্লা ও রোডা চিংড়ির পরিমাণ বেশি। হাব্বা কাঁকড়া (*Scylla serrata*) ও নেপচুন কাঁকড়া (*Neptunus* spp.) বাণিজ্যিকভাবে আহরণ করা হয়। বাগদা চিংড়ি ও হাব্বা কাঁকড়ার চাষও সুন্দরবন অঞ্চলে অর্থনৈতিকভাবে সফল ও জনপ্রিয়। এছাড়াও প্রচুর পরিমাণে গলদা চিংড়ি ও মিঠাপানির মাছ আহরিত হয়। বন বিভাগের দেওয়া তথ্যমতে, বিগত ২০১০-১১ সালে সুন্দরবন থেকে মোট ২২,৪৫১ মে.টন মৎস্য আহরণ করা হয়, যা দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের শতকরা প্রায় ০.৭৩ ভাগ।

দুবলার চরে মৎস্য আহরণ ও শুটকিকরণ কার্যক্রম
(Fishing and fish drying activities in Dublar char)

দুবলার চর সুন্দরবনের অন্যতম সামুদ্রিক মৎস্য অবতরণ অঞ্চল ও শুটকির জন্য সুবিদিত। বাংলাদেশ মেরিন ফিসারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প হতে বিগত ডিসেম্বর ২০১২ মাসে

চিত্র: দুবলার চরে সামুদ্রিক মাছ শুকানোর দৃশ্য

পরিচালিত জরিপে দেখা যায় যে, নানা ধরনের জাল-সরঞ্জামাদি দ্বারা সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ-পরবর্তী অবতরণ ও শুকানোর জন্য দুবলার চরে প্রধানত আলোর কোল, মেহেরালি ও অফিস কেল্লায় বেশ কিছু মাছ ঘাট বা অবতরণ কেন্দ্র রয়েছে। সেসব মৎস্য অবতরণকেন্দ্র সংলগ্ন খালি জায়গায় মাচা বানিয়ে মাছ শুকানো হয় ও অস্থায়ী কুঁড়েঘরে শুটকিমাছ মজুদ করা হয়। অবশ্য ইলিশসহ কিছু মাছ লবণ মাখিয়ে 'নোনামাছ' বানানো হয়। এখানকার জাল-নৌযানের মালিকদের 'বহদ্দার' বলা হয়। দুবলার চরে প্রায় ৬৫০ জন বহদ্দার আছেন যারা মৎস্যজীবীদেরকে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত করেন। সাধারণত নভেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত দুবলার চর থেকে যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান সহযোগে সাগর বেহুন্দি জাল, বেড় জাল ও ফাঁস জাল দিয়ে উপকূলীয় ও সমুদ্র অঞ্চলে মৎস্য আহরণ করা হয় এবং আহরণকৃত মৎস্য এসব অবতরণকেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়। রূপচাঁদা, দাতিনা, ইলিশসহ বড় আকারের মাছ ও বাগদা, হরিণাসহ বড় চিংড়িসমূহ বরফ সহযোগে সংরক্ষণপূর্বক খুলনা বা বাগেরহাটস্থ মৎস্য আড়তে প্রেরণ করা হয়। দুবলার চর হতে এপ্রিল থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত ফাঁস জাল ব্যবহার করে মৎস্য আহরণ করা হয়।

এছাড়া বাঁশের ফাঁদ (trap) পেতে খালের পাড় ঘেষে কাঁকড়া আহরণ করা হয়। সাগর বেহুন্দি জালে প্রধানত লইট্যা, ছুরি, চোইখ্যা, ফাইস্যা, রূপচাঁদা, হাঙর, হাউস ইত্যাদি ধরা পড়ে। ফাঁস জালে ইলিশ, পোয়া ও হাঙর এবং বেড় জালে বাটা, ফাইস্যা ও পোয়া অধিক পরিমাণে ধরা পড়ে। বার্ষিক মৎস্য উৎপাদন ও জৈবতাত্ত্বিক তথ্যাদির নিমিত্ত নিয়মিত জরিপ করা

প্রয়োজন। এলক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক ব্যাপক জরিপ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

এমসিএস পদ্ধতির গুরুত্ব (Importance of MCS system)

নানা প্রজাতির মৎস্যকূল মোহনাঞ্চলে বেড়ে উঠার সময় পোনাজাল, কারেন্ট জাল ও বেহুন্দিজালে ধৃত হয়ে মারা যায়। যেসব মৎস্যসম্পদ অবশিষ্ট থাকে তারই একটি অংশ অগভীর সমুদ্রে 'সাগর বেহুন্দি জাল', বড়শি ও ফাঁসজালে ধরা পড়ে। গভীর সমুদ্রে পূর্ণবয়স্ক মৎস্য ও চিংড়ি প্রজাতিসমূহ ট্রলজালে ধৃত হয়। বাকীরা বেঁচে থেকে পরবর্তী পর্যায়ে বংশবৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পূর্ণবয়স্ক মৎস্য প্রজাতি আহরিত না হলে একপর্যায়ে প্রাকৃতিকভাবেই মারা যায়। কাজেই সামুদ্রিক ও উপকূলীয় উৎস হতে সর্বোচ্চ সহনশীল পর্যায়ে মৎস্য আহরণ অব্যাহত রাখার জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক এবং টেকসই কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে আহরণের প্রতিটি পর্যায়ে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নিশ্চিত করা আবশ্যক।

এজন্য এমসিএস (পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি) পদ্ধতির সুষ্ঠু প্রয়োগ দরকার। জরিপ ও গবেষণা কাজ চলমান রাখা পরিবীক্ষণের অংশ। বিভিন্ন জরিপ ফলাফলের আলোকে ও আইনি কাঠামোয় বর্ণিত নিয়ন্ত্রণ কর্মকাণ্ড তদারকির মাধ্যমে সমগ্র উপকূলীয় ও সামুদ্রিক অঞ্চলকে মৎস্য ব্যবস্থাপনার আওতায় আনার কোনো বিকল্প নেই।

সুন্দরবন মৎস্য ব্যবস্থাপনার বর্তমান অবস্থা (Present status of fisheries management in the Sundarbans)

সুন্দরবনের মতো প্রাকৃতিক অরণ্যে মৎস্য ও চিংড়ি পোনা নিধন হলে গভীর সমুদ্রেও এর বিরূপ প্রভাব পড়ে। সুন্দরবনে মৎস্য অধিদপ্তরের কোন তদারকি কেন্দ্র নেই। সামুদ্রিক মৎস্যের বার্ষিক উৎপাদন নির্ণয়ের যথাযথ ব্যবস্থা নেই। সম্প্রতি বাংলাদেশ মেরিন ফিসারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প হতে একটি সংক্ষিপ্ত জরিপ চালানো হয়। আগামী মৌসুমে বিস্তারিত জরিপ কর্মসূচি পরিচালনা করা হবে।

সুন্দরবনের বন বিভাগের সংরক্ষিত অঞ্চলে বিজ্ঞানভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন এবং এতে মৎস্য অধিদপ্তরকে অধিকতর সম্পৃক্ত করতে হবে। বন বিভাগ থেকে বার্ষিক মৎস্য উৎপাদনের হিসাব পাওয়া যায়। রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে বন বিভাগ নানা ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। প্রতি বছর মৌসুমভিত্তিক পারমিট ব্যবস্থা রয়েছে। বিগত ১৯৯৪ সালে 'সুন্দরবন জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্প' নামে বন বিভাগ পরিচালিত এক জরিপে মৎস্য ব্যবস্থাপনার কিছু বিজ্ঞানভিত্তিক সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়, সেগুলোর কয়েকটি মাত্র বাস্তবায়িত হয়েছে। বন বিভাগের ১৯৫৯ সালের বন্যপ্রাণী শিকার ও মৎস্য আহরণ বিষয়ক আইনের আলোকে মৎস্য আহরণে পারমিট প্রথার প্রচলন হয়। ১৯৮৯ সালে ১৮টি খালকে মৎস্য প্রজননের সুবিধার্থে 'মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ এলাকা' ঘোষণা করা হয়েছে। ওয়ার্ল্ডফিস, বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়া, ঢাকা-এর সহযোগিতায় ও আইপ্যাক প্রকল্পের মাধ্যমে কিছু সমাজভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে মৎস্য অধিদপ্তরের গৌণ সম্পৃক্ততা রয়েছে।

সুপারিশমালা (Recommendations)

সুন্দরবন ব্যবস্থাপনায় বন বিভাগের পাশাপাশি মৎস্য অধিদপ্তরের নিম্নবর্ণিত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা প্রয়োজন:

- চিংড়ি পোনা আহরণ বন্ধে পোনা আহরণকারীদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করা।
- সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে ব্যবহৃত মৎস্য নৌযানের তদারকির জন্য 'সার্ভেল্যান্স চেক পোস্ট' স্থাপন করা।
- মৎস্য মজুদ, অঞ্চল ও মৌসুমভিত্তিক সহনশীল মাত্রায় আহরণ নিমিত্ত বন বিভাগের সাথে নিয়মিত জরিপ ও গবেষণা কাজ পরিচালনা করা।
- সুন্দরবনের ভিতরে ও সন্নিহিত সমুদ্রে বাস্তবভিত্তিক Marine Protected Area (MPA) প্রতিষ্ঠা করা।
- টেকসই মৎস্য আহরণের নিমিত্ত বন বিভাগের পারমিট ব্যবস্থা মৎস্যসম্পদ জরিপ ফলাফলের ভিত্তিতে জৈবিক ও Total Allowable Catch (TAC) পদ্ধতি অনুযায়ী হওয়া প্রয়োজন।
- সুন্দরবনের প্যারাবন সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমে কার্যকর ভূমিকা রাখা।
- মৎস্য অধিদপ্তরের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পর্কিত দপ্তরসমূহের জনবল ও দক্ষতা বাড়ানোসহ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি।

উপসংহার (Conclusion)

বাংলাদেশের উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত উপকূলীয় প্রতিবেশ ও মৎস্য আহরণ কার্যক্রমে অধিক হারে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা অর্জন ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। বাংলাদেশের 'বহু প্রজাতি ও বহু আহরণ' পদ্ধতির সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ টেকসই ব্যবস্থাপনায় জরিপ ব্যবস্থার উন্নয়নে মৎস্য অধিদপ্তরের চলমান ল্যান্ড-বেইজড্ সার্ভে কার্যক্রমের আওতায় নির্বাচিত উপকূলীয় মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রসমূহ হতে নিয়মিত তথ্য সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে একটি আধুনিক জরিপ জাহাজ সংগ্রহের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে এবং অদূর ভবিষ্যতে 'ভ্যাসেল ট্র্যাকিং মনিটরিং সিস্টেম' প্রযুক্তি সংযুক্তির মাধ্যমে বৃহদায়তনের ট্রলারবহর ডিজিটাল তদারকির আওতায় আসবে, যা ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারণের মাধ্যমে সকল মৎস্য নৌযানের বেলায় প্রয়োগ করা যাবে। সুন্দরবনের মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার সাথে মৎস্য অধিদপ্তরের অধিকতর সম্পৃক্ততায় সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চল ও সমুদ্র অঞ্চলের জলসম্পদকে একটি সমন্বিত ব্যবস্থাপনা কাঠামোর আওতায় আনা প্রয়োজন।

[১] জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ মেরিন ফিসারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ (bmfcbp@yahoo.com)
[২] সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ মেরিন ফিসারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
[৩] সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ মেরিন ফিসারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

পাঙ্গাস ও তেলাপিয়া মাছের দুর্গন্ধ হ্রাসকরণের যুতসই কৌশল

Suitable Technique to Reduce Off-flavour in Pangas and Tilapia

ড. সুলতান মাহমুদ[১], মোঃ রোসনে আলম[২] ও মোঃ জাহাঙ্গীর আলম[৩]

Abstract

Off-flavour in Pangas and Tilapia is a common deterrent in Bangladesh for their marketing in spite of huge aquaculture potential. It is evidenced that Geosmin and 2-Methylisoborneol (MIB) are responsible for creating off-flavour in fish. This study was carried out to find out off-flavour producing compounds in Pangas and Tilapia as well as abundance of cyanobacteria and actinomycetes in pond water. The efficiency of three treatments-SandFilter, PondPlus and AquaPhoto (soil probiotics) were compared for the improvement of water quality parameters and, thus on production of Geosmin and 2-Methylisoborneol (MIB). Both chemical analysis and sensory taste were accomplished to measure the level of off-flavour in Pangas and Tilapia. Among all treatments AquaPhoto showed the best result and followed by SandFilter and PondPlus. Amount of geosmin in fish varies from 3.0 to 90.9 ng/kg and 4.6 ng/l in water, were found in recommended range. Twelve hours depuration technique was found to be useful for farmers.

মাছ আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে অনস্বীকার্য গুরুত্ব বহন করে চলছে। জাতীয় জীবনে পুষ্টি চাহিদা পূরণের লক্ষ্য সামনে রেখে মৎস্যচাষের বিকাশমান ধারায় যুক্ত হয়েছে নতুন নতুন প্রযুক্তি। নতুন নতুন প্রজাতির বাণিজ্যিক চাষ এ ধারাকে আরো বেগবান করেছে। যার ফলশ্রুতিতে বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশ মৎস্যচাষে ব্যাপক অগ্রগতি সাধন করেছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ বর্তমানে মৎস্যচাষে বিশ্বে পঞ্চম স্থান দখল করেছে। আশির দশকের শেষের দিকে আমাদের দেশে বিদেশী প্রজাতির পাঙ্গাস ও তেলাপিয়ার চাষ শুরু হয়। বাণিজ্যিক মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে এ প্রজাতি দু'টি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। জাতীয় মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ১০ শতাংশ আসে এ দু'টি মাছের চাষ থেকে (পাঙ্গাসিয়াস অ্যাকোয়াকালচার ডায়ালগ, PAD)। দ্রুত বর্ধনশীল, অধিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং সহজে চাষযোগ্য হওয়ার কারণে তেলাপিয়া ও পাঙ্গাস চাষের ব্যাপক জনপ্রিয়তা পরিলক্ষিত হয়। তদুপরি পাঙ্গাস ও তেলাপিয়া চাষের ফলে এদেশে আমিষের চাহিদা যেমন পূরণ হচ্ছে তেমনি তৈরি হয়েছে নতুন নতুন কর্মসংস্থান। পাঙ্গাস ও তেলাপিয়া মাছের উৎপাদন থেকে শুরু করে বাজার ব্যবস্থাপনায় যুক্ত হয়েছে নানা শ্রেণির মানুষ। বাজারে পাঙ্গাস ও তেলাপিয়ার চাহিদাও ব্যাপক। কিন্তু দুঃখের বিষয় তুলনামূলক বিচারে অন্য মাছের চেয়ে এই মাছ দু'টি বাজারদর অনেক কম। বাজারে একটি মাঝারি সাইজের চাষকৃত রুইজাতীয় মাছ যেখানে কেজি প্রতি ২০০-২৫০ টাকায় বিক্রয় হয়, সেখানে পাঙ্গাস ও তেলাপিয়া বিক্রয় হয় যথাক্রমে মাত্র ১০০ ও ১২০ টাকায়। চাষি ও ভোক্তাদের মতে মাছ দু'টির অতিমাত্রায় দুর্গন্ধ (off-flavour) নিম্ন মূল্যের প্রধান কারণ। ফলে পাঙ্গাস ও তেলাপিয়া চাষে নতুন উদ্বেগ পরিলক্ষিত হচ্ছে। অথচ কেবলমাত্র এ মাছ দু'টির মানসম্পন্ন উৎপাদন সম্ভব হলে দেশের চাহিদা পূরণ করে বিদেশেও রপ্তানি করা সম্ভব, যা কী-না হয়ে উঠতে পারে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের আর এক উল্লেখযোগ্য পণ্য। দেশের ক্রমবর্ধমান মাছের চাহিদা ও নিরাপদ আমিষের যোগান দেওয়ার কথা বিবেচনা করে উল্লিখিত প্রজাতি দু'টির মাত্রাতিরিক্ত দুর্গন্ধ দূরীকরণের যুতসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ডেনমার্কের কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে গত এক বছর ধরে একটি গবেষণা পরিচালনা করে। মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় আরএফএলডিসি-বরিশাল প্রকল্পে DANIDA কর্তৃক অর্থায়নে 'Establishment of Suitable Technique to Reduce Off-flavour in Fishes' শিরোনামে গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। প্রাথমিক গবেষণার ফলাফল প্রকাশই এ প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। উল্লেখ্য, বহুবিধ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গবেষণা কর্মটি পরিচালিত হলেও কেবলমাত্র পাঙ্গাস ও তেলাপিয়ার মানসম্মত উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

- পাঙ্গাস ও তেলাপিয়ার মান উন্নয়নে পানির গুণগত মানের প্রভাব লক্ষ্য করা;
- মাছের দুর্গন্ধ (off-flavour) সৃষ্টিকারী রাসায়নিক উপাদান ও অণুজীবের আধিক্য নিরূপণ; এবং
- দুর্গন্ধ দূরীকরণের যুতসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

মূল গবেষণার বিষয়ে যাওয়ার আগে মাছের দুর্গন্ধের বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত প্রচলিত ধারণা সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করা যাক। মাছ যেহেতু জলজ পরিবেশে বাস করে তাই পানির গুণগতমান মাছের দুর্গন্ধ সৃষ্টিতে প্রভাব ফেলে। কারণ জলজ পরিবেশের রাসায়নিক ও অণুজীবের মেটাবলিক পদার্থ ফুলকা ও পরিপাকতন্ত্রের মাধ্যমে মাছের দেহে অনুপ্রবেশ করে। পরবর্তীতে মাছের মাংসপেশীতে জমা হয়ে দুর্গন্ধ হিসেবে আবির্ভূত হয়। ইতোমধ্যে বিজ্ঞানীরা মাছের দুর্গন্ধের প্রধান কারণ হিসেবে দু'ধরনের রাসায়নিক পদার্থকে দায়ী করেছেন যা Geosmin এবং ২-Methylisoborneol (MIB) নামে পরিচিত।

জলজ পরিবেশে উৎপাদিত নীলাভ সবুজ শৈবাল (blue green algae) ও অ্যাকটিনোমাইসিটি (actinomycete) নামক অণুজীবের সেকেন্ডারি মেটাবলিক উৎপাদনই হচ্ছে Geosmin ও MIB। সাধারণত মাছের মাংসপেশীতে Geosmin মাটির মত (earthy) এবং MIB বাসী বা টক (musty) দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে। বাণিজ্যিকভাবে মাছ চাষে অতিমাত্রায় খাদ্য প্রয়োগের ফলে পানির গুণগত মানের দ্রুত অবনতি মাছের দুর্গন্ধ সৃষ্টির অন্যতম কারণ। এছাড়া পুকুরের তলায় জমাকৃত বর্জ্যকেও দুর্গন্ধের কারণ হিসেবে দায়ী করা হয়।

বর্তমান গবেষণায় পাঙ্গাস ও তেলাপিয়ার দুর্গন্ধ হ্রাসকরণের প্রযুক্তি উদ্ভাবনে পরীক্ষামূলকভাবে দু'ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। যথা:

১. পুকুরের পানির গুণগত মানোন্নয়নে স্যান্ডফিল্টার ও প্রোবায়োটিক্সের ব্যবহার; এবং
২. ডেপুরেশন (Depuration)।

১. পুকুরের পানির গুণগত মানোন্নয়নে স্যান্ডফিল্টার ও প্রোবায়োটিক্সের ব্যবহার (Use of SandFilter and Probiotics for increasing pond's water quality)

পানির গুণগতমান উন্নয়নের মাধ্যমে মাছের বর্ধন পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি তাদের দেহের দুর্গন্ধের মাত্রা নিরূপণের নিমিত্ত ৮টি পুকুরে তেলাপিয়া ও পাঙ্গাস চাষ করা হয়। পানির গুণগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে তিন ধরনের ট্রিটমেন্ট- (ক) দেশীয় প্রযুক্তির স্যান্ডফিল্টার (SandFilter); (খ) স্থানীয় বাজারে প্রাপ্ত প্রোবায়োটিক (AquaPhoto) ; এবং (গ) চীন থেকে আমদানিকৃত প্রোবায়োটিক (PondPlus) ব্যবহার করা হয়। গবেষণার ফলাফলে মাছের দুর্গন্ধ সৃষ্টিকারী উপাদানসমূহ Geosmin ও MIB এর উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া প্রাপ্ত রাসায়নিক দ্রব্যগুলোর ওপর ট্রিটমেন্টগুলোর প্রভাবও লক্ষ্য যায়। আমাদের গবেষণায় AquaPhoto ব্যবহৃত পুকুরের পানিতে এবং মাছের দেহে Geosmin-এর পরিমাণ SandFilter এবং Pond-Plus ব্যবহারকৃত পুকুরের তুলনায় কম পাওয়া গেছে। স্যান্ডফিল্টার ও প্রোবায়োটিক্স ব্যবহার করলে পুকুরের পানিতে দুর্গন্ধ সৃষ্টিকারী সায়ানোব্যাকটেরিয়া (cyanobacteria)-এর গ্রহণযোগ্য মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়।

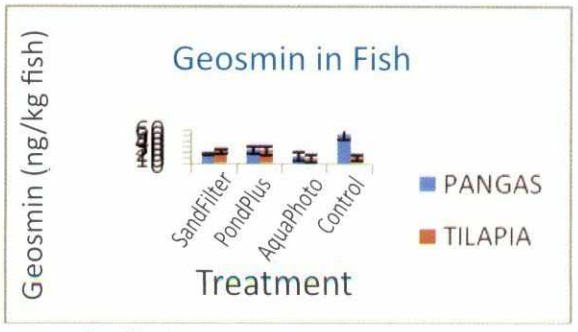

চিত্র: ট্রিটমেন্টভেদে মাছের দেহে Geosmin এর পরিমাণ

এছাড়া chlorophytes জাতীয় শৈবালের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় মাছেরও বৃদ্ধি লক্ষণীয়। এই শৈবাল (algal biomass) এর প্রাচুর্য অন্য মাসের তুলনায় মার্চ মাসে সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। গবেষণায় এটাও লক্ষণীয় যে, SandFilter ও Probiotics ব্যবহার করলে পানির গুণগত মান তথা পানির স্বচ্ছতা, দ্রবীভূত অক্সিজেন, অম্লত্ব, ক্ষারত্ব, খরতা, অ্যামোনিয়া, নাইট্রাইট, নাইট্রেট সহনশীল অবস্থায় থাকে এবং প্রকারান্তে মাছের দৈহিক বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

২. ডেপুরেশন (Depuration)

ডেপুরেশন হলো এমন এক পদ্ধতি যে ক্ষেত্রে মাছকে মজুদ পুকুর থেকে স্থানান্তর করে প্রবহমান পানি ও ঝর্ণার পানিতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রাখা হয়। সাধারণত আহরণের পর বাজারজাত করার পূর্বে মাছের দুর্গন্ধ হ্রাসকরণে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় যার ফলশ্রুতিতে মাছের দুর্গন্ধ দূর হয়। গবেষণাকালে পাঙ্গাস ও তেলাপিয়া মাছ আহরণের পর সর্বোচ্চ ৪৮ ঘণ্টা ডেপুরেশন করা হয় এবং প্রতি ১২ ঘণ্টা অন্তর মাছের fillet সংগ্রহ করে Geosmin এবং MIB এর পরিমাণ নির্ণয় এবং সেন্সরি টেইস্ট প্যানেল-এর মাধ্যমে সেন্সরি টেইস্ট পদ্ধতিতে মাছের দুর্গন্ধের মাত্রা যাচাই করা হয়। টেইস্ট প্যানেল কর্তৃক স্বাদ গ্রহণের মাধ্যমে দুর্গন্ধের, মাত্রা নিরূপণ ও একই নমুনার Geosmin এবং MIB এর মাত্রা পর্যবেক্ষণপূর্বক তুলনামূলক ফলাফল বিশ্লেষণই এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল। সেন্সরি টেইস্ট-এর ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় ৪৮ ঘণ্টা ডেপুরেশনে তেলাপিয়া ও পাঙ্গাস মাছের দুর্গন্ধের পরিমাণ বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। তবে ১২ ঘণ্টায় দুর্গন্ধের পরিমাণ আপাতদৃষ্টিতে ৪৮ ঘণ্টার চেয়ে কিছুটা বেশি মনে হলেও রাসায়নিক পরীক্ষায় Geosmin এর পরিমাণ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কম পরিলক্ষিত হয়েছে। গবেষণায় AquaPhoto পাঙ্গাস ও তেলাপিয়ার দুর্গন্ধ হ্রাসকরণে সর্বাধিক কার্যকর প্রোবায়োটিক হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে। পানির পুকুরের গুণগত মানোন্নয়নে ব্যবহৃত প্রোবায়োটিক্স-এর মধ্যে Aqua-Photo ভালো ফলদায়ক হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে। যদিও SandFilter ব্যবহারও পানির গুণাগুণ উন্নতি সাধনে ভূমিকা রেখেছে তথাপি তুলনামূলক বিবেচনায় প্রোবায়োটিক ব্যবহারই যুক্তিযুক্ত। তবে পাঙ্গাস ও তেলাপিয়ার দুর্গন্ধের সাথে সম্পর্কিত আর্থিক দিক বিবেচনায় ডেপুরেশন পদ্ধতি ব্যবহারই যুক্তিযুক্ত মনে করি। কিন্তু দীর্ঘসময় ডেপুরেশনে মাছের ওজন হ্রাস পায়। সেজন্য ডেপুরেশনের ব্যবস্থা করতে না পারলে চাষি কেবল মাছের স্বাদ গ্রহণের (sensory taste) মাধ্যমে দুর্গন্ধের মাত্রা নিরূপণপূর্বক মাছ বাজারজাতকরণে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় এদেশে স্বাদ গ্রহণে পেশাদারিত্ব মেধার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়ে মৎস্যচাষিদের ধারণা আরো বৃদ্ধি পাবে। সর্বোপরি আগামীতে মাছের দুর্গন্ধ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আরো ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন আছে।

১ অধ্যাপক, অ্যাকোয়াকালচার বিভাগ, ডিন, মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (sultanmahmud77@yahoo.com)
২ প্রভাষক, অ্যাকোয়াকালচার বিভাগ, ডিন, মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
৩ প্রভাষক, অ্যাকোয়াকালচার বিভাগ, ডিন, মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

হাওর অঞ্চলের জলাভূমিতে সহব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ও তার প্রভাব

Co-management Interventions in the Haor Areas and its Impact

ড. এম জি মোস্তফা[১] ও রমেশ চন্দ্র মণ্ডল[২]

Abstract

The Department of Fisheries has implemented the programs of CBFM, MACH, FF and IPAC projects to secure the access rights of resource users to water bodies, establish successful fish sanctuaries, reduce fishing pressure by exploring alternative income generating activities, promote policy-level coordination, link resource users, and improve local wetlands habitats. These programs secured access rights of the resource users to several key inland fisheries across Bangladesh and enlisted local fishers assist others to design and implement conservation schemes. Using fish catch monitoring data collected by participating fisher communities and supporting studies, the CBFM/MACH/FF/IPAC programs have produced compelling evidence that fisheries management performance significantly improved under co-management and trends in fish production and biodiversity through time. Currently Department of Fisheries in Bangladesh is being supported and scaling up co-management to increase resilience and sustainable fisheries management.

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ মৎস্যসম্পদের মধ্যে হাওর অঞ্চলের জলাভূমি দরিদ্র জনগণের জীবন-জীবিকা এবং খাদ্যের নিরাপত্তা বিধানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে জলাভূমি সংশ্লিষ্ট সুফলভোগী/জেলেদের সমন্বয়ে প্রায় ৬০০ সহব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়। বর্তমান সরকারের 'ভিশন-২০২১' এর লক্ষ্য অর্জন ও মাছের উৎপাদন ৪৫.৫২ লক্ষ মে.টনে উন্নীত করতে সহব্যবস্থাপনা কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে আসছে। মৎস্য অধিদপ্তরের সমাপ্ত MACH (Management of Aquatic Ecosystems through Community Husbandry), IPAC (Integrated Protected Area Co-management), CBFM (Community-Based Fisheries Management) এবং FF (Fourth Fisheries) প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর মৎস্য অধিদপ্তর, স্থানীয় মৎস্যজীবীদের সমাজভিত্তিক সংগঠনের সহায়তায় জলাভূমিতে সহব্যবস্থাপনা কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। উন্মুক্ত জলাশয় সহব্যবস্থাপনায় কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় (GIZ) সহায়তাপুষ্ট একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। USAID-এর আর্থিক সহযোগিতায় বন অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর এবং মৎস্য অধিদপ্তরের সার্বিক সহযোগিতা ও অংশীদারিত্বে Climate Resilient Ecosystems and Livelihoods (CREL) শীর্ষক এক নতুন প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করেছে। এ সহব্যবস্থাপনা কর্মসূচি পরিচালনার মাধ্যমে বন অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর এবং পরিবেশ অধিদপ্তর স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের সহযোগিতা প্রদান করছে। ইতোমধ্যে জলাভূমিতে সহব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ও দরিদ্র মৎস্যজীবীদের সম্পদ লাভের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে মৎস্য অধিদপ্তরের ভূমিকা প্রশংসনীয়।

মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে সহব্যবস্থাপনা

(Co-management towards fisheries development)

মৎস্য অধিদপ্তর দেশের বিদ্যমান স্বাদুপানির উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সুফলভোগী ও মৎস্যজীবীদের সম্পৃক্তকরণপূর্বক জলজসম্পদ ব্যবস্থাপনায় সমাজভিত্তিক সহব্যবস্থাপনা কৌশল প্রয়োগ করে অনেকগুলো প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত এসব কার্যক্রমের ফলে একদিকে মৎস্যসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে; অন্যদিকে দেশীয় মৎস্য প্রজাতির সংরক্ষণ ও জলজ জীববৈচিত্র্যের উন্নয়নে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে।

মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলায় অবস্থিত হাইল হাওর দেশীয় মাছের অন্যতম প্রধান আবাসস্থল ও প্রজননক্ষেত্র। প্রায় ১২,৪৯০ হেক্টর এলাকা জুড়ে ৮৪টি জলাভূমির সমন্বয়ে গঠিত এ হাওরটি জীববৈচিত্র্য ও মৎস্যসম্পদের সংরক্ষণ এবং সমৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত সুপরিচিত। দীর্ঘদিন ঐতিহ্যবাহী এ সম্পদ অপরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা, স্বল্পমেয়াদী ইজারা প্রদান, প্রাকৃতিক সম্পদের ধ্বংসাত্মক আহরণের ফলে মাছের জীববৈচিত্র্য হ্রাস পায় ও পরিবেশ বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। স্থায়ীভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য ১৯৯৮ সালে USAID-এর আর্থিক সহযোগিতায় মাচ্ প্রকল্প সহব্যবস্থাপনা কর্মসূচি প্রতিষ্ঠা করে। মৎস্য অধিদপ্তরের সহায়তায় মাচ্ প্রকল্প ১১০টি গ্রামের ১৬টি সমাজভিত্তিক সংগঠন তৈরি করে ২৫,০০০ হেক্টর জলাভূমি উন্নত সহব্যবস্থাপনার আওতায় এনেছে। পরবর্তীতে আইপ্যাক জুন ২০০৮ হতে মে ২০১৩ সময়ে বাস্তবায়িত এ সহব্যবস্থাপনা সংগঠনসমূহকে বৃহত্তর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে জাতীয় নেটওয়ার্ক হিসেবে 'নিসর্গ নেটওয়ার্ক' নামে ঘোষিত হয়েছে। প্রাকৃতিক বন ও জলাভূমির সহব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদানকল্পে 'নিসর্গ নেটওয়ার্ক' বেশ কিছু সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সমর্থন পেয়েছে। প্রায় একই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ক্রেল প্রকল্প পরবর্তী পাঁচ বছর অক্টোবর ২০১২ হতে সেপ্টেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত সময়ের জন্য বাস্তবায়িত হচ্ছে। ক্রেল প্রকল্পটি প্রতিবেশ ও রক্ষিত এলাকা সংরক্ষণ, প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীববৈচিত্র্যের উন্নত ব্যবস্থাপনা এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বহুমুখী জীবিকায়নের মাধ্যমে জলবায়ু সহিষ্ণুতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা

রাখবে। এছাড়া প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারকারীদের আর্থিক ও ব্যবসায়িক উদ্যোগ বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে এবং উৎপাদন উপকরণ, বাজার তথ্য ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে তাদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করবে যেন লাভজনকভাবে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে পারে।

সাম্প্রতিককালে জলবায়ু পরির্তনের ফলে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগ দেখা দিচ্ছে এবং মৎস্যসম্পদসহ মানুষের জীবনযাত্রার ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। হাওর অঞ্চলের উন্মুক্ত জলমহালে স্থানীয় মৎস্যজীবীদের সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম মাছের জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধি, সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। মাচ্ প্রকল্পের সার্বিক সহায়তায় হাইল হাওর অঞ্চলের উন্মুক্ত জলমহালে অংশগ্রহণমূলক সহব্যবস্থাপনা সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রকল্পের সার্বিক সহায়তায় মৎস্যজীবীগণ ১৯৯৮ খ্রি. হতে সহব্যবস্থাপনা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে জলমহালে মৎস্যজীবীদের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে সহব্যবস্থা সংগঠন (রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট অর্গানাইজেশন- আরএমও এবং ফেডারেশন অব রিসোর্স ইউজার গ্রুপ- এফআরইউজি) প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখে আসছে। মাছের জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধি, সংরক্ষণ, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মাছ ধরার ক্ষতিকর পদ্ধতির ব্যবহার হ্রাস করে মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রেও সহব্যবস্থাপনা সংগঠন বেশ অগ্রগতি সাধন করেছে। সহব্যবস্থাপনা সংগঠনের সহায়তায় মাচ্ পরবর্তী আইপ্যাক প্রকল্পের বিকল্প আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড মৎস্যজীবীদের মাছ ধরা নিয়ন্ত্রণ তথা মাছের ওপর চাপ কমাতে উৎসাহিত করেছে।

সহব্যবস্থাপনা সংগঠনের মাধ্যমে হাইল হাওরে মাছের উৎপাদন দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ২০১২ খ্রি. পর্যন্ত গড়ে হেক্টর প্রতি ৩৭৭ কেজিতে পৌঁছেছে। মাছের এ উৎপাদন বৃদ্ধির হার টেকসই বলে প্রতীয়মান হয়েছে। মাচ/আইপ্যাক প্রকল্প এলাকার জলাভূমিতে ৯৬ প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়, যা বংলাদেশের মিঠাপানির মোট মৎস্য প্রজাতির এক-তৃতীয়াংশের উর্ধ্বে। গবেষণায় দেখা যায় যে, হাইল হাওরের ৬টি জলাভূমিতে ৮৫ প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। জীববৈচিত্র্যের উন্নতিসহ ৮-১০টি বিপন্নপ্রায় প্রজাতির মাছ পুনরায় হাইল হাওরের জলাভূমিতে পাওয়া যাচ্ছে। তন্মধ্যে গজার, শোল, গনিয়া, কালিবাউস, পাবদা, গুলশা, চিতল ও মেনি উল্লেখযোগ্য। সহজে পাওয়া যায় এরকম প্রজাতির মাছ হলো রুই, জাতপুঁটি, ফলি ও টাকি এবং বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদনে এরা যথাক্রমে ৭.৫৮, ৬.৭৭, ৫.৭৭ ও ৫.২৭ শতাংশ অবদান রাখছে। গবেষণায় আরও দেখা গেছে যে, মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে মাছ ধরা এবং ক্ষতিকর সরঞ্জামের ব্যবহার কমানোর গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। পরিবীক্ষণাধীন জলাভূমিসমূহে মাছ ধরার হার এবং ক্ষতিকর সরঞ্জাম ও পদ্ধতি ব্যবহারের মাত্রা উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। মাছের প্রাপ্যতা বৃদ্ধির ফলে জীববৈচিত্র্য উন্নয়নের ধারা শ্যানন-ওয়েইনার সূচকে [Shanon-Weiner Index (H')] প্রতিফলিত হয়েছে। অতি সম্প্রতি হাইল হাওরের ৬টি বিলে জরিপের সময় ধৃত প্রধান প্রজাতিগুলোর বিন্যাস, হেক্টর প্রতি উৎপাদন ও প্রজাতির সংখ্যা নিম্নের লেখচিত্রে দেখানো হলো। এছাড়া সহব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রতিষ্ঠা ও আয়বর্ধক তহবিল (বর্তমানে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা) এর সঠিক ব্যবস্থাপনা চলমান রাখার ক্ষেত্রে মৎস্য অধিদপ্তর সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছে।

লেখচিত্র: হাইল হাওরে বাৎসরিক মাছ আহরণের হার (২০০০-২০১২)

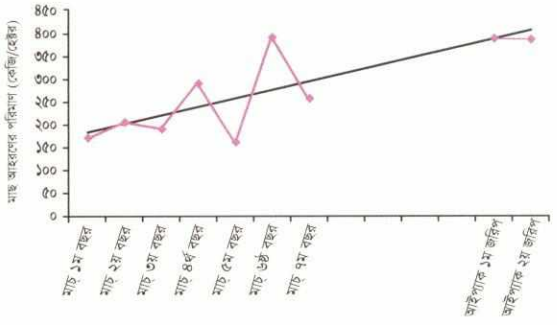

লেখচিত্র: হাইল হাওরে প্রাপ্ত প্রজাতির সংখ্যা (২০০০-২০১২)

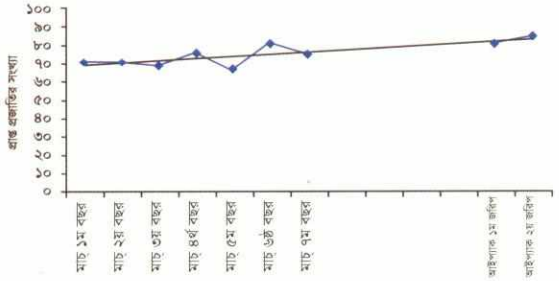

চিত্র: হাইল হাওরে সহনশীল মৎস্য আহরণ

উল্লেখ্য যে, মৎস্য অধিদপ্তরের সিবিএফএম প্রকল্প (২০০১-০৭) ১১৬টি জলাশয়ে স্থানীয় জেলেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে ১৩০টি সমাজভিত্তিক সংগঠনের মাধ্যমে ২৩,০০০ জন উপকারভোগীর কাছে সরাসরি সুফল পৌঁছে দিতে পেরেছে। প্রকল্প এলাকায় মাছের জীববৈচিত্র্যের উন্নতি ঘটেছে ২৮.৩ শতাংশ। প্রকল্পের জলাশয়ে ১৭টি বিপন্ন মাছের প্রজাতির মধ্যে ১৪টি পুনরায় ফিরে এসেছে/পাওয়া গেছে; যথা- বাতাসি, বড় বাইম, পাবদা, মধু পাবদা, গনিয়া, বাটা, দারকিনা ইত্যাদি। সিবিএফএম প্রকল্পের বদ্ধ বিলে বাৎসরিক উৎপাদন ৩৮০ কেজি/হেক্টর থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৯২১ কেজি/হেক্টর এ পৌঁছেছে। একই প্রকল্পভুক্ত উন্মুক্ত জলাভূমিতে বাৎসরিক উৎপাদন ১৫৬ কেজি/হেক্টর থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৪১৪ কেজি/হেক্টর এ উন্নীত হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের একটি বৃহৎ প্রকল্প ৪র্থ মৎস্য প্রকল্প যা ২০০৬ সালে সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৪৫টি সমাজভিত্তিক সংগঠন তৈরি হয়েছে। এ সংগঠনগুলো ৩৯টি জলাভূমি সহব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত, যার সর্বমোট আয়তন ১৮,০০০ হেক্টর। সংগঠনগুলো মাছের অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা এবং কিছু জলাভূমিতে পোনা অবমুক্ত করে মাছের উৎপাদন ও জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধি ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন ভিত্তিবছরের ১২০ হতে ২৪৯ কেজি/হেক্টর উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে। সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনার ওপর মৎস্য অধিদপ্তরের অর্জনের উপসংহারে এটা বলা যেতে পারে যে, প্রত্যক্ষ সুফলভোগী যারা প্রকল্পের জন্য প্রচুর সময় ও শ্রম দিয়েছেন তাদের বেশির ভাগের জন্যেই এই পদ্ধতি সুফল বয়ে এনেছে। ফলশ্রুতিতে মৎস্য অধিদপ্তর তার অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় সংশ্লিষ্ট শাখার মাধ্যমে এসকল সংগঠনের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম টেকসইভাবে এগিয়ে নেবার লক্ষ্যে সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছে।

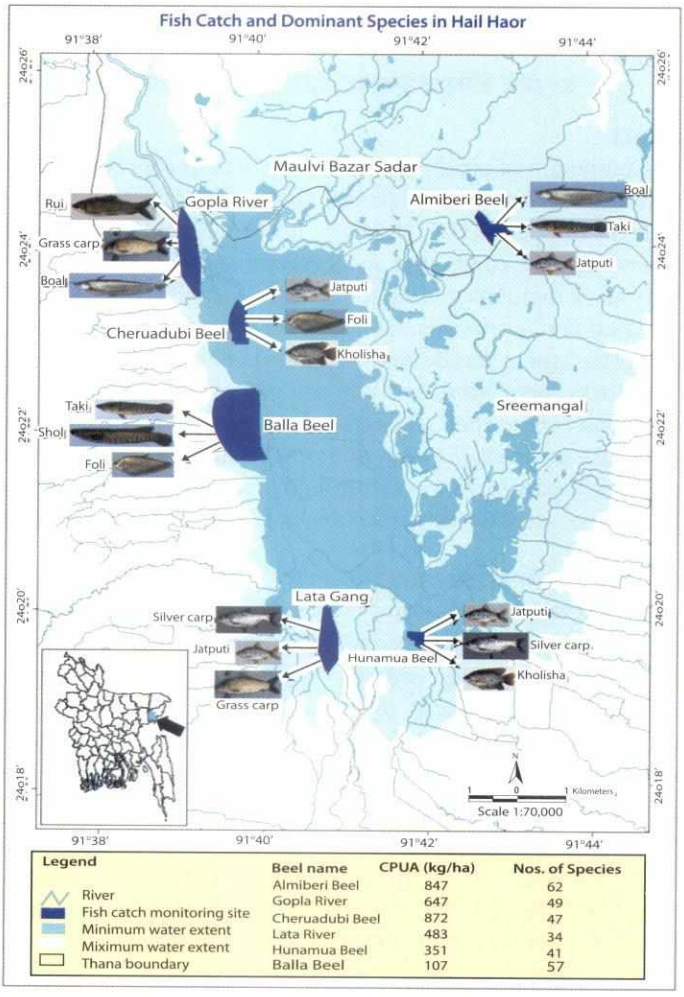

চিত্র: হাইল হাওরের প্রধান প্রজাতিগুলোর বিন্যাস, হেক্টর প্রতি উৎপাদন ও প্রজাতি সংখ্যা

উপসংহার (Conclusion)

সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম প্রশ্নাতীতভাবে প্রমাণ করেছে যে, দরিদ্র মৎস্যজীবীদের নিয়ে বিভিন্ন ধরনের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে কিছু মৌলিক ব্যবস্থাপনা কৌশলের মাধ্যমে মাছের প্রাপ্যতা, উৎপাদন ও জীববৈচিত্র্য বাড়াতে সফল হয়েছে। জীববৈচিত্র্যগত ও মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু জলমহালে সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা অত্যন্ত জরুরি। আর তাই গুরুত্বপূর্ণ উন্মুক্ত জলমহালসমূহে সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও মৎস্য সংরক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখা আবশ্যক। বাংলাদেশের উন্মুক্ত জলাভূমিতে সহব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের ফলে জলাভূমি এলাকায় মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় মৎস্যজীবীদের সামর্থ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। সামগ্রিকভাবে ব্যবস্থাপনা কৌশল ও মৎস্য সংরক্ষণ আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে যার ফলে সহব্যবস্থাপনাধীন জলাভূমিতে মৎস্য আইনে নিষিদ্ধ জাল ব্যবহার উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। ফলশ্রুতিতে দেশীয় প্রজাতি মাছের উৎপাদনও বৃদ্ধি হয়েছে। এছাড়া প্রজননক্ষম মাছ বৃদ্ধিসহ বিলুপ্তপ্রায় মাছের প্রজাতি সংখ্যাও বৃদ্ধি হয়েছে।

[১] সিনিয়র ফিসারিজ কো-অর্ডিনেটর, ওয়ার্ল্ডফিস-বাংলাদেশ ও সাউথ এশিয়া অফিস (g.mustafa@cgiar.org)
[২] উপপ্রধান, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

গলদা চিংড়ির গুণগতমানসম্পন্ন ব্রুড ও পোনা উৎপাদন কৌশল

Technique for Production of Quality Broods and Seeds of Galda

ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম সরদার[১], ড. মোঃ ফজলুল আউয়াল মোল্লাহ্[২] ও মোঃ হুমায়ুন কবির খান[৩]

Abstract

For development of protocol for production of quality broodstocks of freshwater prawn, Department of Fisheries Biology and Genetics, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh conducted the study with the support of DANIDA through RFLDC, Noakhali. It was a 33 months study from September 2009 to May 2012 and eleven experiments were conducted. A supplemental feed containing 32% protein was developed and used for induction of early maturation and gonad development. The broods developed by rearing wild juveniles with the formulated feed performed as like as broods collected from the Halda River. Performance of Halda river and reared broodstocks was better than those collected from a gher of Bagerhat district. F_1 and F_2 progenies of three brood stocks were produced but the growth and breeding performance of F_2 progenies were significantly ($P<0.05$) lower than their respective parents indicating occurrence of inbreeding. So, hatchery managers should not produce broodstocks from their own produced PL for consecutive generations. Rather, they are suggested to produce broodstocks by rearing wild juveniles which will ensure supply of quality broodstocks for quality PL production as well as help conserving natural stocks of freshwater prawn of the country.

গলদা চিংড়ি বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রপ্তানি পণ্য। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে গলদা চিংড়ি চাষ বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক খাতে পরিণত হয়েছে। বিগত ২০১১-১২ অর্থবছরে চিংড়ি রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রায় ৪,৭০৪ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করেছে। দেশের রপ্তানিকৃত মোট চিংড়ির মধ্যে গলদার অবদান সাধারণত শতকরা ২৫-৩০ ভাগ। অনুকূল জলবায়ু, মাটি ও পানির কারণে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম প্রধান গলদা চিংড়ি উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। অধিক বর্ধনহার, স্বাদ, উচ্চ বাজার মূল্য ও বিদেশে চাহিদা থাকায় এদেশে গলদা চিংড়ির চাষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। পূর্বে খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলায় মূলত গলদা চিংড়ি চাষ হলেও বর্তমানে তা নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, বরিশাল, পটুয়াখালী, ময়মনসিংহ, যশোর, গোপালগঞ্জ ইত্যাদি জেলায় সম্প্রসারিত হয়েছে। সাম্প্রতিককালে ভাইরাসঘটিত সংক্রামক রোগের কারণে কিছু কিছু চিংড়ি চাষি বাগদার পরিবর্তে গলদা চাষ শুরু করেছে। প্রাকৃতিক পোনা দ্বারা প্রথমত গলদা চাষ শুরু হলেও ক্রমবর্ধমান চাষের কারণে উত্তরোত্তর চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় গলদা চিংড়ির হ্যাচারি স্থাপনের আবশ্যকতা দেখা দেয়। বাংলাদেশে ১৯৮৬ সালে প্রথম গলদা চিংড়ি হ্যাচারি প্রতিষ্ঠিত হয়। নির্বিচারে প্রাকৃতিক পোনা সংগ্রহের ক্ষতিকর প্রভাবের কারণে ২০০০ সালে সরকার প্রাকৃতিক উৎস হতে গলদা পোনা সংগ্রহের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। একদিকে প্রাকৃতিক পোনা সংগ্রহের উপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারি; অপরদিকে চাষের জন্য উত্তরোত্তর চাহিদা বৃদ্ধির কারণে গলদা চিংড়ি হ্যাচারি শিল্প বিস্তার লাভ করে। বর্তমানে দেশে মোট ৮০টি গলদা চিংড়ি হ্যাচারি রয়েছে।

গুণগতমানসম্পন্ন গলদা ব্রুড উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা

(Necessity for production of broods of galda)

গুণগত মানসম্পন্ন পোনা উৎপাদনের পূর্বশর্ত হলো উন্নত গুণাবলির ব্রুড উৎপাদন। গলদা চিংড়ি হ্যাচারিতে সাধারণত ব্রুড প্রতিপালন করা হয় না। হ্যাচারি ব্যবস্থাপকেরা মধ্যস্বত্বভোগীদের মাধ্যমে ডিমওয়ালা মা গলদা চিংড়ি সংগ্রহ করে তা হতে পোনা উৎপাদন করে থাকেন। ২০০৭ সালে পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, একটি গলদা চিংড়ি হ্যাচারি এক মৌসুমে গড়ে ৫২০টি ডিমওয়ালা মা গলদা চিংড়ি ব্যবহার করে থাকে এবং এই হিসেবে ডিমওয়ালা মা চিংড়ির বাৎসরিক মোট চাহিদা দাঁড়ায় ৪২,১২০টি (Ahmed, ২০০৮)। উক্ত চাহিদা বর্তমানে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। উক্ত সমীক্ষা হতে আরো জানা যায় যে, হ্যাচারিতে ব্যবহৃত মা চিংড়ি মাছের শতকরা মাত্র ১৫ ভাগ প্রাকৃতিক উৎস হতে সংগৃহীত হয়; অবশিষ্ট শতকরা ৮৫ ভাগ চাষকৃত ঘের বা পুকুর হতে সংগ্রহ করা হয়। চাষের উৎস হতে সংগৃহীত ব্রুড মাছ বছরের পর বছর ধরে ব্যাপক ব্যবহারের কারণে অন্তঃপ্রজনন সমস্যা দেখা দিতে পারে। থাইল্যান্ডে বছরের পর বছর ধরে চাষের পুকুর হতে সংগৃহীত মা গলদা চিংড়ি ব্যবহার করার ফলে অন্তঃপ্রজননজনিত সমস্যা দেখা দিয়েছে। অন্তঃপ্রজননের কারণে নব্বইয়ের দশকে তাইওয়ানের গলদা চিংড়ির বার্ষিক উৎপাদন ১৬,০০০ মে.টন হতে ৭,৬৬৫ মে.টনে নেমে আসে। পৃথিবীর অনেক দেশেই ইতোমধ্যে চাষকৃত গলদা চিংড়ির অন্তঃপ্রজনন সমস্যা দেখা দিয়েছে। অন্তঃপ্রজননজনিত কারণে হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনার বর্ধন হার, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, বেঁচে থাকার হার, অভিযোজন ক্ষমতা ইত্যাদি হ্রাস পায়। ফলে গলদা চিংড়ির সার্বিক উৎপাদন কমে যায়।

কৌলিতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশে কার্পজাতীয় মাছের হ্যাচারি উৎপাদিত পোনার অন্তঃপ্রজননজনিত সমস্যা উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু দেশে গলদা চিংড়ির হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনার কৌলিতাত্ত্বিক গুণাবলি নিরূপণে কোনো গবেষণা অদ্যাবধি পরিচালিত হয়নি। গলদা চাষিরা প্রায়শ অভিযোগ করেন যে, প্রাকৃতিক উৎসের পোনার চেয়ে হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনার বর্ধন ও বেঁচে থাকার হার কম।

এক গবেষণা হতে জানা যায় যে, প্রাকৃতিক উৎসের পোনার চেয়ে হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনার বর্ধন হার কম।

বাংলাদেশের অধিকাংশ গলদা চিংড়ি হ্যাচারি ব্যবস্থাপকগণ গুণগতমানসম্পন্ন পোনা উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রাকৃতিক উৎস হতে সংগৃহীত ডিমওয়ালা গলদা পছন্দ করেন। অতি আহরণ, দূষণ, প্রাকৃতিক আবাসস্থল বিনষ্ট ইত্যাদি কারণে প্রাকৃতিক উৎসের ডিমওয়ালা গলদা চিংড়ির প্রাপ্যতা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। উপরন্তু এদের সরবরাহ সর্বদা সমান থাকে না। ফলে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেক হ্যাচারি ব্যবস্থাপক প্রাকৃতিক উৎসের ডিমওয়ালা গলদা চিংড়ি সংগ্রহ করতে পারেন না। অন্যদিকে উচ্চ চাহিদার বিপরীতে স্বল্প সরবরাহ থাকার কারণে এদের দাম প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেক সময় হ্যাচারি ব্যবস্থাপকগণ বাধ্য হয়ে বা অসাধু মধ্যস্বত্বভোগীদের কারণে ঘের বা পুকুরে উৎপাদিত ডিমওয়ালা গলদা চিংড়ি ব্যবহার করেন। ব্রুড হিসেবে প্রতিপালনের জন্য আলাদা কোনো পরিচর্যা না করায় চাষকৃত উৎসের এ সব চিংড়ি হতে কাঙ্ক্ষিত মান ও পরিমাণের পোনা উৎপাদন করা যায় না। ফলে অনেক হ্যাচারি ক্ষতির সম্মুখীন হয়। বারবার এ ধরনের ক্ষতির কবলে পড়ে অনেক গলদা হ্যাচারি টিকতে না পেরে বন্ধ হয়ে গেছে। নোয়াখালী অঞ্চলে পরিচালিত এক জরিপ হতে জানা যায় যে, ঐ অঞ্চলের পাঁচটি গলদা চিংড়ি হ্যাচারির মধ্যে বর্তমানে চারটি বন্ধ আছে। অধিকন্তু বছরের পর বছর ধরে এ ধরনের নিম্নমানের ব্রুড ব্যবহারের ফলে অন্তঃপ্রজনন সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই অন্তঃপ্রজনন সমস্যামুক্ত পোনা উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রাকৃতিক উৎস হতে সংগৃহীত ব্রুড বা এর সমকক্ষ কৌলিতাত্ত্বিক গুণসম্পন্ন ব্রুড ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। যদিও প্রাকৃতিক উৎস হতে গলদার পোনা সংগ্রহের উপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ আছে তথাপি প্রত্যন্ত অঞ্চলে যথাযথ আইনি প্রয়োগের অভাবে এবং আর্থসামাজিক অবস্থার কারণে প্রাকৃতিক উৎস হতে গলদার পোনা সংগ্রহ পুরোপুরি বন্ধ করা যায়নি। প্রাকৃতিক উৎস হতে নির্বিচারে গলদার পোনা সংগ্রহের সাথে সাথে, খাবারের জন্য চিংড়ির অতিআহরণ এবং ডিমওয়ালা চিংড়ি সংগ্রহ করলে প্রকৃতিতে গলদা চিংড়ির মজুদের উপর ঋণাত্মক প্রভাব পড়তে পারে।

বাংলাদেশ, ভারত, মালয়েশিয়া ইত্যাদি দেশে গলদা চিংড়ির প্রাকৃতিক মজুদ হ্রাস পেয়েছে। হ্যাচারিতে পোনা উৎপাদনের জন্য প্রাকৃতিক উৎস হতে ব্যাপক হারে গলদা ব্রুড সংগ্রহ করলে সার্বিক জীববৈচিত্র্যের উপর আরো নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। সুতরাং বাংলাদেশে গলদা চিংড়ির প্রাকৃতিক মজুদ সংরক্ষণের পাশাপাশি হ্যাচারিতে উন্নত কৌলিতাত্ত্বিক গুণসম্পন্ন পিএল উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রাকৃতিক ব্রুডের সমকক্ষ ব্রুড উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবন জরুরি প্রয়োজন।

গুণগত মানসম্পন্ন গলদা ব্রুড উৎপাদন কৌশল
(Techniques for production of quality broods of galda)

সম্প্রতি ডানিডা'র অর্থায়নে আরএফএলডিসি, নোয়াখালী-এর সহযোগিতায় নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিসারিজ বায়োলজি এন্ড জেনেটিক্স বিভাগের তত্ত্বাবধানে গুণগতমানসম্পন্ন গলদা ব্রুড উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবনের উপর এক গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। গলদা চিংড়ির ব্রুড প্রতিপালনের জন্য একটি বিশেষ খাদ্য তৈরি করা হয় যা নিম্নে সারণিতে উপস্থাপন করা হলো। এটি দেশীয় বাণিজ্যিক কোম্পানি কর্তৃক উৎপাদিত চিংড়ি খাদ্যের তুলনায় উন্নত এবং গুণগতমানসম্পন্ন ব্রুড উৎপাদনে অধিক কার্যকর।

সারণি: গুণগতমানসম্পন্ন ব্রুড উৎপাদনে উদ্ভাবিত গলদা চিংড়ির খাবারের ফর্মুলা

ক্রমিক নং	উপাদানের নাম	মিশ্রণের হার (%)
১	অটোকুঁড়া	১১.৫০
২	গমের ভুষি (মিহি)	১০.০০
৩	ভুট্টা	১২.০০
৪	সরিষার খৈল	১০.০০
৫	সয়াবিন খৈল	১০.০০
৬	মিট এন্ড বোন মিল	৩০.০০
৭	ফিস প্রোটিন কনসেন্ট্রেট	১০.০০
৮	ক্যালসিয়াম	৫.৩০
৯	ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	১.০০
১০	বাইন্ডার	০.২০

উক্ত গবেষণার মাধ্যমে গলদা ব্রুড প্রতিপালনের বিশেষ নিয়মাবলি উদ্ভাবন করা হয়। দেখা গেছে যে, গবেষণালব্ধ খাদ্য প্রয়োগ ও নিয়মাবলি অনুসরণ করে প্রাকৃতিক উৎস হতে সংগৃহীত কিশোর চিংড়ি পুকুরে পরিমিত মজুদ ঘনত্বে চাষ করে উন্নত মানসম্পন্ন ব্রুড উৎপাদন সম্ভব। গবেষণায় উৎপাদিত ব্রুডের গুণগতমান পরীক্ষার জন্য হালদা নদী ও বাগেরহাট জেলার একটি ঘের হতে ডিমওয়ালা গলদা চিংড়ি সংগ্রহপূর্বক একটি গলদা চিংড়ি হ্যাচারিতে তিন উৎসের ব্রুডের প্রথম প্রজন্মের পোনা উৎপাদন করা হয়। পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, গবেষণা পুকুরে উৎপাদিত ডিমওয়ালা গলদা চিংড়ির

চিত্র: গবেষণায় উৎপাদিত ব্রুডের প্রথম প্রজন্মের পোনা

গুণাগুণ হালদা নদী হতে সংগৃহীত ডিমওয়ালা গলদা চিংড়ির সমকক্ষ কিন্তু ঘের হতে সংগৃহীত ডিমওয়ালা গলদা চিংড়ির চেয়ে উন্নত। গবেষণা উৎপাদিত গলদা ব্রুডের প্রথম প্রজন্মের পোনার বর্ধনহার ও উৎপাদন হালদা নদীর ব্রুড থেকে উৎপাদিত একই প্রজন্মের পোনার বেঁচে থাকার হার ও উৎপাদনের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি; কিন্তু ঘেরের ব্রুড হতে উৎপাদিত পোনার বেঁচে থাকার হার ও উৎপাদন অন্যদের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কম। বিভিন্ন ব্রুড উৎসের প্রথম প্রজন্মের পোনা ভিন্ন ভিন্ন গবেষণা পুকুরে প্রতিপালনের মাধ্যমে উৎপাদিত প্রথম প্রজন্মের ব্রুডের গুণাবলি তাদের মায়েদের সমকক্ষ বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে (ঘের ব্রুড অপেক্ষা তার প্রথম প্রজন্মের পোনা হতে উৎপাদিত ব্রুড) ভাল হওয়ায় গুণগতমানসম্পন্ন গলদা ব্রুড উৎপাদনে

চিত্র: প্রতিপালনের মাধ্যমে উৎপাদিত প্রথম প্রজন্মের ব্রুড

গবেষণালব্ধ খাদ্য ও ব্রুড প্রতিপালনের নিয়মাবলির কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়েছে। হ্যাচারিতে বিভিন্ন উৎসের প্রথম প্রজন্মের ব্রুড হতে দ্বিতীয় প্রজন্মের পোনা উৎপাদন করা হয়। দ্বিতীয় প্রজন্মে প্রত্যেক ব্রুড উৎসের পোনার বেঁচে থাকার হার ও উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পায়, যা অন্তঃপ্রজনন সমস্যার ইঙ্গিত বহন করে। প্রত্যেক উৎসের ব্রুড এবং তাদের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রজন্মের পোনার কৌলিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দ্বিতীয় প্রজন্মে অন্তঃপ্রজনন সমস্যার প্রমাণ পাওয়া গেছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে দেখা গেছে যে, গবেষণা পুকুরে উৎপাদিত ব্রুডের কৌলিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য হালদা নদীর ব্রুডের কৌলিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের সমকক্ষ যা প্রথম প্রজন্মে মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকে।

সুপারিশমালা (Recommendations)

- গলদা চিংড়ি হ্যাচারি ব্যবস্থাপকগণ প্রাকৃতিক উৎস হতে সংগৃহীত পোনা (কিশোর চিংড়ি) উপযুক্ত পুকুরে মজুদ (মজুদ ঘনত্ব: ৪০টি প্রতি শতাংশ) করে সুষম খাদ্য (আমিষ কমপক্ষে শতকরা ৩২ ভাগ) প্রয়োগ করে নিজেদের প্রয়োজনীয় গুণগতমানসম্পন্ন ব্রুড উৎপাদন করবেন। প্রতি মাসে অমাবস্যা ও পূর্ণিমার ভরা জোয়ারে নদীর পানি দ্বারা পুকুরের (শতকরা ৫০-৮০ ভাগ) পানি পরিবর্তন করবেন। পুকুরের পানির গভীরতা সারা বছর ৩-৫ ফুট হতে হবে। গলদা চিংড়ির জন্য পুকুরে পর্যাপ্ত পরিমাণ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।
- গলদা চিংড়ি হ্যাচারি ব্যবস্থাপকগণ বিভিন্ন প্রাকৃতিক উৎস হতে সংগৃহীত পোনা ভিন্ন ভিন্ন পুকুরে চাষ করে সঠিক পরিকল্পনামাফিক প্রজননের মাধ্যমে উৎপাদিত ব্রুডের কৌলিতাত্ত্বিক উন্নয়ন ঘটাতে পারেন।
- হ্যাচারি ব্যবস্থাপকগণ নিজেদের ব্রুডের ইতিহাস সংরক্ষণ করবেন। ব্রুডের কৌলিতাত্ত্বিক অবনমন রোধে বিভিন্ন হ্যাচারির মধ্যে ব্রুড বিনিময় কার্যক্রম চালানো যেতে পারে। এক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক উৎসের পোনা হতে উৎপন্ন ব্রুডের মধ্যে বিনিময় বাঞ্ছনীয়।
- গলদা চিংড়ি হ্যাচারি ব্যবস্থাপকগণ কর্তৃক নিজেদের ব্রুডের উৎপাদিত পোনা ভবিষ্যৎ ব্রুড উৎপাদনে ব্যবহার না করাই বাঞ্ছনীয়। নিজেদের ব্রুডের উৎপাদিত পোনা দ্বারা ভবিষ্যৎ ব্রুড উপাদনের পূর্বে অবশ্যই তাদের কৌলিতাত্ত্বিক গুণাবলি পরীক্ষা করতে হবে। এক্ষেত্রে ব্রুডের তুলনায় উৎপাদিত পোনার কৌলিতাত্ত্বিক অবনমন ঘটলে তা হতে ব্রুড উৎপাদন সমীচীন হবে না।
- গুণগতমানসম্পন্ন ব্রুড উৎপাদনের কৌশল সম্পর্কে গলদা চিংড়ি হ্যাচারি ব্যবস্থাপকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে।
- সরকার কর্তৃক শীঘ্রই গলদা চিংড়ির ব্রুড ব্যাংক স্থাপন করা প্রয়োজন। একই সাথে বিভিন্ন প্রাকৃতিক উৎসের চিংড়িরকৌলিতাত্ত্বিক গুণাবলি পরীক্ষাপূর্বক উন্নত জাতসমূহ চিহ্নিত করে তাদের মধ্যে নির্বাচিত প্রজননের (selective breeding) মাধ্যমে অধিক উৎপাদনশীল নতুন জাত (ব্রিড) উদ্ভাবনে প্রয়াস নেয়া যেতে পারে।

উপসংহার (Conclusion)

কোনো প্রজাতির প্রাকৃতিক মজুদ অফুরন্ত নয়। অতিআহরণ, বাসস্থান বিনষ্ট, দূষণ ইত্যাদি কারণে সর্বোপরি সংরক্ষণের অভাবে অনেক প্রজাতি আজ বিলুপ্ত হয়েছে; অনেক প্রজাতি বিলুপ্তির পথে। যেহেতু গলদা চিংড়ি আমাদের গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি পণ্য, সেহেতু প্রকৃতিতে এর মজুদ সংরক্ষণ জরুরি প্রয়োজন। পুকুরে গলদা চিংড়ির গুণগতমানসম্পন্ন ব্রুড উৎপাদনে উদ্ভাবিত খাদ্য ও প্রতিপালন কৌশল ব্যবহার একদিকে চিংড়ি হ্যাচারির জন্য সময়মত প্রয়োজনীয় ডিমওয়ালা মা চিংড়ির যোগান নিশ্চিত করবে; অপরদিকে প্রাকৃতিক উৎসের চিংড়ি ব্রুডের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে পরিবেশ সংরক্ষণ তথা জীববৈচিত্র্য রক্ষায়ও ভূমিকা রাখবে।

[১]প্রফেসর, ফিসারিজ বায়োলজি এন্ড জেনেটিক্স বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ (rafiqulsarder@yahoo.com)
[২]প্রফেসর, ফিসারিজ বায়োলজি এন্ড জেনেটিক্স বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
[৩]সহকারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
কৃতজ্ঞতা: মোঃ ফরিদুল ইসলাম, খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ এবং RFLDC, নোয়াখালী

বরফ-খণ্ড ও বরফকৃত মাছ সংরক্ষণে স্বল্পখরচে নির্মাণযোগ্য হিমাগার

Low Cost Cold Storage to Preserve Ice Block and Iced Fish

ড. এ কে এম নওশাদ আলম

Abstract

In most of the ice plants, there is no cold storage to preserve ice blocks. Ice blocks are kept in open shade with nominal polythene wrapping for 9 to 24 hours for next morning sale, which results blocks be melted by 30-50 percent. Partially melted blocks are also sold at the same price like a whole block. Thus fish traders suffer in many ways, since they need to invest more capital to ice the fish, while the quality of the fish is lost for inadequate icing. To overcome this constraint, a simple ice storage chamber is designed, which is basically an insulated box made of brick wall and polystyrene sheet with metal lining inside. Insulation is provided on all walls, floor, ceiling and door, protected from damage by sheets of galvanised metal. The plinth level is 10" high and a layer of tile is provided on the floor to prevent wear and tear. Drainage for ice melt water is through small holes in the floor. Iced fish in fish boxes can also be preserved in this chamber. The device is cheap and environment-friendly, as it is produced by low-cost materials and does not require electricity to operate.

বিগত দশকে বাংলাদেশে মাছে বরফ দেয়ার প্রবণতা বেড়েছে। দেশের অভ্যন্তরে মাছ পরিবহনকালে দামী মাছসহ প্রায় সকল মাছেই বরফ দেয়া হয়। জেলে বা মাছ চাষিগণ মাছ ধরার পর আড়তে নিয়ে আসা অবধি বরফ না দিলেও আড়তে ডাকের মাধ্যমে ক্রয়ের পর প্রায় সকল পাইকার বা পরিবহনকারী মাছ ব্যবসায়ীগণ প্রজাতি নির্বিশেষে মাছে বরফ দিয়ে থাকেন। বরফের অপ্রতুলতা বা উচ্চমূল্য ছাড়াও অসচেতনতা, যথাযথ বরফ-বাক্সের অভাবে মাছ ও বরফের অনুপাত যথোপযুক্ত হয় না। পূর্বে ক্রেতারা বরফ দেয়া মাছকে নিম্নমানের বলে গণ্য করতো, তাদের বিশ্বাস ছিল যে পচা মাছেই বরফ দেয়া হয়। এখন মাছের গুণাগুণ সংরক্ষণ ও মাননিয়ন্ত্রণ বিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের ফলে মৎস্য উৎপাদনকারী, বিক্রেতা ও ভোক্তাসহ সকলেই সচেতন হয়েছেন। বর্তমানে প্রতিনিয়ত এবং প্রতিটি ধাপেই মাছে বরফ ব্যবহার হয়ে থাকে। এতে মাছের আহরণোত্তর ক্ষতি অনেক হ্রাস পেয়েছে। এফএও এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থায়নে পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, ২০০৩ সালে যেখানে দেশের মোট উৎপাদিত মাছের প্রায় শতকরা ২৮ ভাগ মাছ পচে নষ্ট হয়ে যেত, সেখানে ২০১২ সনে এ ক্ষতি কমে এসে মোট উৎপাদনের শতকরা মাত্র ১২ ভাগে দাঁড়িয়েছে। জনসচেতনতা সৃষ্টির ফলে এ অর্জন সম্ভব হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

মৎস্য উৎপাদনের সকল পর্যায়ে বরফ ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বাজারে বরফের চাহিদাও প্রচুর। কিন্তু বিদ্যুৎ সরবরাহ না থাকা ও ঘন ঘন লোড শেডিংয়ের কারণে বরফ-খণ্ড জমতে অতিরিক্ত সময় লাগে। ফলে একদিকে যেমন উদ্যোক্তারা এগিয়ে আসে না, অন্যদিকে উৎপাদন কমে যাওয়ার সাথে সাথে উৎপাদন খরচ বেড়ে গিয়ে বরফের গুণগত মানে এর প্রভাব পড়ে। ফলশ্রুতিতে চাহিদানুসারে বাজারে বরফের যোগান অপ্রতুল হয়ে পড়ে। গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রার আধিক্যের কারণে বরফের চাহিদা সর্বোচ্চ থাকে। এ সুযোগে বরফকল মালিকগণ প্রতারণা ও কুট-কৌশলের আশ্রয় নিয়ে বেশি বেশি মুনাফা অর্জনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বরফ খণ্ড যথাযথভাবে জমাট বাঁধার আগেই একই মূল্যে বা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি মূল্যে বিক্রি করা, আবর্জনাময়-ময়লা পানি দিয়ে বরফ বানানো ও আয়রনযুক্ত পানি দিয়ে বরফ বানানো এদের মধ্যে অন্যতম। এছাড়াও আগের দিন তৈরি করে রেখে দেয়া, প্রায় গলে যাওয়া বরফ-খণ্ড পরের দিন সর্বোচ্চ চাহিদার সময় একই দামে বা আরো বেশি দামে বিক্রি করা।

বরফ-খণ্ডের ধরন

(Type of ice blocks)

চাহিদা ও ব্যবহারের মাত্রা অনুসারে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন আকারের বরফ-খণ্ড তৈরি হয়। কক্সবাজার-চট্টগ্রামসহ উপকূলীয় অঞ্চলে ৭০-৮০ কেজি ওজনের, ২.৫ ফুটx১.৫ ফুটx১ফুট আকারের বরফ-খণ্ড ব্যবহৃত হয়। দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র ও বাজারে স্থাপিত ছোট ছোট বরফকলে সাধারণত ২০/২৫ কেজি ওজনের ১.৫ ফুটx১ ফুটx৫ ইঞ্চি বরফ খণ্ড তৈরি হয়। সম্প্রতি দেশব্যাপী জরিপে দেখা গেছে শতকরা প্রায় ২৬ থেকে ৪৮ ভাগ বরফ-খণ্ডই শতকরা একশত ভাগ জমানো হয় না। জেলাভিত্তিক জরিপে শতকরা প্রায় ১৬ থেকে ৩২ ভাগ বরফ-খণ্ড কাদা-ময়লা/আবর্জনায় সংক্রমিত বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে।

চিত্র: পরের দিন বিক্রির জন্য খোলা বারান্দায় স্তূপীকৃত বরফ-খণ্ড

নতুন সস্তা হিমাগার
(New cheap cold-storage)

সাম্প্রতিক জরিপে দেখা গেছে যে, বেশিরভাগ বরফকলে বরফ-খণ্ড রাখার জন্য কোনো সংরক্ষণাগার নেই। বরফকল মালিকগণ বরফ তৈরি করে পলিথিন বস্তায় জড়িয়ে খোলা বারান্দায় স্তূপ করে রাখেন। পরের দিন সকাল ৮-১১ টার মধ্যে এসব বরফ-খণ্ড বিক্রয় হয়। প্রায় ৯ থেকে ২৪ ঘণ্টা খোলা আবহাওয়ায় পড়ে থাকায় প্রায় ৩০- ৫০% বরফ গলে যায়। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য বরফকলে উৎপাদিত বরফ-খণ্ড অবশ্যই ঠাণ্ডা সংরক্ষণাগারে রাখা দরকার। এতে মাছ পরিবহনকারী ব্যবসায়ীদের বিরাট অঙ্কের ব্যয় সাশ্রয়ের পাশাপাশি মাছের আহরণোত্তর ক্ষতি কমিয়ে গুণগতমানের ব্যাপক উন্নতিসাধন করা সম্ভব হবে। দেশের অভ্যন্তরীণ মাছ সরবরাহ ব্যবস্থায় নিয়োজিত বরফকলের উৎপাদন ও সামর্থ্যের ওপর ভিত্তি করে ৫-৭ দিন বরফ-খণ্ড সংরক্ষণ করে রাখার জন্য একটি ছোট আকারের অতি সস্তা হিমাগার ডিজাইন করা হয়েছে। হিমাগারটিতে কোনো বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে হবে না বলে এটি অত্যন্ত ব্যয় সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব। নতুন ডিজাইন করা হিমাগারে প্রয়োজনে বরফ দেয়া মাছও সংরক্ষণ করা যাবে। হরতাল বা অন্যান্য অনিবার্য কারণবশত প্রায়শ মৎস্যচাষি, জেলে ও পাইকাররা মাছ পরিবহন করতে ব্যর্থ হলে বরফ দেয়া মাছকেও ৪/৫ দিন তাজা রাখার জন্য উক্ত হিমাগার -টি ব্যবহার করা যাবে।

নতুন হিমাগারের ডিজাইন
(Design of new cold-storage)

আকার: ১০ ফুটx৬ ফুটx৬ ফুট ৬ ইঞ্চি; ফ্লোর, দেয়াল, ছাদ ও দরজা; সকল দিকেই তাপনিরোধী ব্যবস্থা; মাটি থেকে ১০ ইঞ্চি উঁচু কনক্রিট ফ্লোর (প্লিন্থ) পলিস্টাইরিন শিট দিয়ে তাপনিরোধী করা; বাইরে ৫ ইঞ্চি ইটের দেয়াল ও ভিতরে ৩ ইঞ্চি ইটের দেয়ালের মাঝখানে ২ ইঞ্চি পলিস্টাইরিন শিট দিয়ে তাপনিরোধী করা; ভিতরের দেয়াল মেটাল শিট দিয়ে মুড়ানো; সামনের দিকে ৫ ফুটx৪ ফুট মোটা প্লাস্টিকের দরজা; ঢালু ছাদ (সামনের দিকে ৬ ফুট ৬ ইঞ্চি, পিছনের দিক ৬ ফুট উঁচু) জিআই শিট দিয়ে তৈরি যার মাঝে কর্কশিট বসানো এবং বরফগলা পানি বের হয়ে যাওয়ার জন্য ফ্লোরের নিচের ছিদ্র দিয়ে নির্গমন পাইপ বসানো।

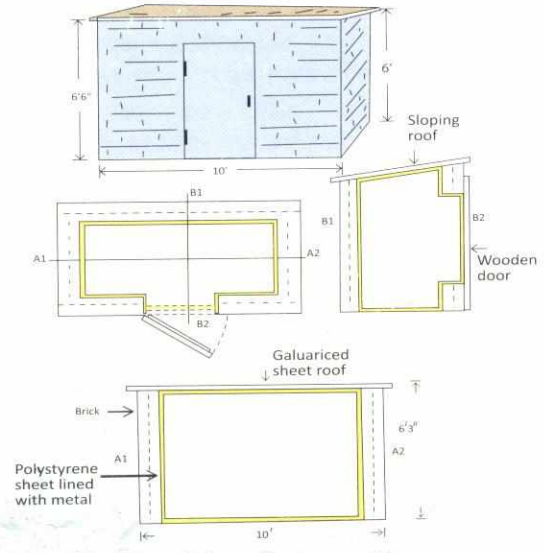

চিত্র: স্বল্প খরচে নির্মাণযোগ্য হিমাগারের লে-আউট

হিমাগারের নির্মাণ খরচ (Consruction cost of cold storage): ১০ ফুট x ৬ ফুট x ৬ ফুট ৬ ইঞ্চি আকার বিশিষ্ট নতুন ডিজাইনের হিমাগার নির্মাণের খরচ নিম্নে উপস্থাপন করার হলো:

উপকরণ	টাকা
ইট ১৫০০ @ ৭.০০ প্রতি পিস	১০,৫০০.০০
সিমেন্ট ১৫ ব্যাগ @৪৫০ .০০	৬,৭৫০.০০
বালি	১,০০০.০০
শ্রমিক ২০ রোজ @ ৪ ০০.০০	৮,০০০.০০
২" পলিস্টাইরিন শিট ২৭০ বর্গফুট @ ৩০ .০০ প্রতি বর্গফুট	৮,১০০.০০
জিআই শিট (ছাদের জন্য) ৬০ বর্গফুট (২ শিট) @১৫০০/ শিট	৩,০০০.০০
ভিতরের দেয়ালের জন্য মেটাল শিট ১৭০ বর্গফুট @ ৩২০.০০ প্রতি ৯ বর্গফুট	৬,২০০.০০
প্লাস্টিকের দরজা (৫′ × ৪′) ও ফিটিংস	৬,০০০.০০
মালামাল পরিবহন ও অন্যান্য	৫,০০০.০০
মোট	৫৪,৫৫০.০০

উপসংহার (Conclusion)

মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণের সকল পর্যায়ে বরফের ব্যবহার অনস্বীকার্য। বরফের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় বাজারে মানসম্পন্ন বরফের চাহিদাও প্রচুর। কিন্তু বিদ্যুৎ সরবরাহ না থাকা ও ঘন ঘন লোড শেডিংয়ের কারণে বরফ-খণ্ড জমতে অতিরিক্ত সময় লাগে এবং বরফরে গুণগত মানের ব্যত্যয় ঘটে। এক্ষেত্রে মাত্র ৫০-৬০ হাজার টাকা ব্যয়ে গ্রামে-গঞ্জে, যেখানে বিদ্যুৎ নেই অথবা ঘন ঘন লোড শেডিং হয়, সেখানে এ রকম একটি হিমাগার নির্মাণ করে বরফ-খণ্ড ও বরফ দেয়া মাছকে কয়েকদিন সংরক্ষণ করা যায়। আগ্রহী উদ্যোক্তা ও মাছ ব্যবসায়ীগণ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিগরি সহায়তা নিয়ে এমন একটি হিমাগার তৈরি করে আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারেন এবং গুণগত মানসম্পন্ন মাছ ভোক্তা পর্যন্ত পৌছাতে কার্যকর ভূমিকা পালনে অবদান রাখবেন।

প্রফেসর, ফিসারিজ টেকনোলজি বিভাগ, মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ (nawsad12@yahoo.com)

জলাভূমির জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় লাগসই কৌশল

Strategy for Conservation and Management of Wetland Biodiversity

মোঃ আবুল হাসেম সুমন [১], ড. সৈয়দ আলী আজহার [২] এবং মোঃ তৌহিদুর রহমান[৩]

Abstract

Natural resource management and aquatic biodiversity conservation are interwoven to each other. There are several management tools through which natural resources including inland open-water fisheries can be managed. Community Based Co-management or Co-management of Natural Resources is proved to be a successful management tool where participation of all stakeholders through community based organizational banner is practiced. Wetland Biodiversity and Rehabilitation Project of the Department of Fisheries performing different activities where community based organization is the core of the project. The project intervened activities like habitat restoration, establish fish sanctuary, implement fisheries Acts and Regulations, promote selective gear use, encourage agro-fish friendly structures, introducing endangered and threatened species and promote awareness campaign. Good governance in natural resource management contributes in improving environment vis-a-vis biodiversity. The anthropogenic interferences and natural processes seriously impedes the conservation of biodiversity in the aquatic habitats of Bangladesh.

দেশের জলজ প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। দেশের নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, বরোপিট, প্লাবনভূমি ইত্যাদি জলজ প্রাকৃতিক সম্পদের মূল ক্ষেত্র এবং দেশের মৎস্য উৎপাদনের প্রধান উৎস। প্রায় সব প্রজাতির মাছের প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র হচ্ছে এসব জলাশয়। এসব জলাশয়ের ওপর লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন-জীবিকা এবং তাঁদের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। বৈচিত্র্যময় জলজ উদ্ভিদ ও মাছসহ অন্যান্য জলজ প্রাণীরাই হলো এ সম্পদের অলংকার। বাংলাদেশের জলাভূমির জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় লাগসই কৌশলসমূহকে প্রয়োগ করা জরুরি।

জীববৈচিত্র্যের অবক্ষয়

(Degradation of biodiversity)

বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময়। এদেশে রয়েছে ৬২৯ প্রজাতির বন্যপ্রাণী, ২৬০ প্রজাতির মিঠাপানির মাছ, ৪৭৫ প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ, ২৪ প্রজাতির মিঠা পানির চিংড়ি, ৩৬প্রজাতির সামুদ্রিক চিংড়ি, ২২ প্রজাতির উভচর প্রাণী, ১০৯ প্রজাতির সরীসৃপ,১২ প্রজাতির সামুদ্রিক সাপ ও ৫ প্রজাতির সামুদ্রিক কচ্ছপ। প্রায় ৭০টি গোত্রের ৬০০ প্রজাতির বেশি রয়েছে পাখি। তবে এদেরমধ্যে এ দেশে ডিম পাড়ে এমন প্রজাতির সংখ্যা হল প্রায় ৩৮৮টি এবং বাকি ২৪০টি বিভিন্ন দেশ হতে আগত অতিথি পাখি। অন্যদিকে এদেশের সমুদ্রসীমায় রয়েছে ৩৩টি গোত্রের নীল তিমিসহ ১৩ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী। উদ্ভিদজগতের প্রায় ৫ হাজার প্রজাতির সপুষ্পক উদ্ভিদের মধ্যে বিগত কয়েক দশকে ব্যাপক জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নগরায়ন, বাসস্থান তৈরি, বাঁধ ও রাস্তাঘাট নির্মাণ, অবৈধভাবে বনভূমি দখল, অগ্নিসংযোগ, খনিজ পদার্থ উত্তোলন, কলকারখানা থেকে নির্গত অশোধিত বর্জ্য পদার্থ, মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার ইত্যাদি কারণে উদ্ভিদজগতে ঘটেছে মারাত্মক বিপর্যয়। ইতোমধ্যেই দেশের মোট ২৬০টি মৎস্য প্রজাতির (Rahman, 2005) মধ্যে ৫৪ প্রজাতির মাছ বিপন্নপ্রায় (IUCN, 2000) হয়ে পড়েছে। যদি জীববৈচিত্র্যের এ অবক্ষয় এভাবে চলতেই থাকে, আর যদি এখনই এর প্রতিকারের জন্য কোনো বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ না নেওয়া হয় তবে ভবিষ্যতে জলজ জীবের বিলুপ্তির হার স্থলভাগের চেয়ে ৫ গুণ বেশি এবং সমুদ্র উপকূলীয় জীবের চেয়ে ৩ গুণ বেশি হবে এবং ২০৫০ সনের মধ্যে শতকরা ৩০ ভাগ জীব পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে (*Ricciardiet al.* 1999)। দিন দিন প্রাকৃতিক জলাশয়সমূহ জলবায়ুর পরিবর্তনসহ বিভিন্ন কারণে নাব্যতা হারাচ্ছে, বিপন্ন হতে চলেছে মাছসহ সামগ্রিক জীববৈচিত্র্য। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়।

জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব

(Importance of biodiversity)

পৃথিবীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে মহিমান্বিত করেছে জীববৈচিত্র্য। উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৈচিত্র্যময় সমাহার ধরণিকে করেছে এক অপূর্ব সৌন্দর্যের লীলাভূমি। আর এ পৃথিবীতে আমাদের অস্তিত্ব নির্ভর করছে জীববৈচিত্র্যের অস্তিত্বের ওপর। মানুষের জীবন-জীবিকার প্রধান অবলম্বন হল উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের

অফুরন্ত বৈচিত্র্যময় সম্পদ। পরিবেশের ভারসাম্য ও বাস্তুতন্ত্রের (ecosystem) অবিচ্ছিন্নতা রক্ষা, জিনগত মান বা গুণাগুণ রক্ষা, চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণা, নতুন পণ্য প্রাপ্তি, রাসায়নিক ও ভেষজ দ্রব্যাদি প্রাপ্তি, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, পর্যটন শিল্পের বিকাশ, স্থানীয় আদিবাসী সম্প্রদায়ের। আর্থসামাজিক অবস্থার ওপর যে প্রভাব রয়েছে তা সচল রাখা জরুরি। যেহেতু বিশ্বব্যাপী জীববৈচিত্র্যের সকল প্রকার জীবকূল একটির সাথে অন্যটি বিভিন্নভাবে সম্পর্কযুক্ত। তাই এক্ষেত্রে একটির অভাব অন্যটির কার্যক্রম বা ক্রিয়াকলাপকে বাধাগ্রস্ত করে। অমেরুদন্ডী প্রাণী ও অনুজীবকুল মাছের খাদ্যশিকল মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য যোগানে বিরাট ভূমিকা পালন করে। তাই উদ্ভিদ ও প্রাণিজগৎ উভয়ের অস্তিত্বের প্রয়োজনেই জীববৈচিত্র্যকে রক্ষা করা প্রয়োজন।

জলাভূমি জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সমন্বিত প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা কৌশল (Integrated natural resource management approach to conserve biodiversity)

মুক্ত জলাশয়ে বদ্ধ জলাশয়ের ন্যায় নিবিড় মাছচাষ করা সম্ভব নয় কিন্তু দক্ষতার সাথে বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বাড়ানোর অফুরন্ত সুযোগ রয়েছে। যেহেতু এসব জলাশয়ের ব্যবস্থাপনা বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক, জলাশয় নির্ভরশীল সুফলভোগীদের পেশার সাথে জড়িত। তাই ব্যবস্থাপনা কৌশলও ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। নিম্নে কৌশলসমূহ সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করা হলো:

১. আবাসস্থল উন্নয়ন ও এর ব্যবস্থাপনা
(Habitat improvement and management)

অপরিকল্পিতভাবে বাঁধ ও বেড়ি বাঁধ নির্মাণ, রাস্তাঘাট তৈরি, থিতিয়ে পড়া পলি, জলাশয়কে কৃষি জমিতে রূপান্তর, আবাসন ব্যবসার নির্মানের ফলে মৎস্য আবাসস্থলের মারাত্মক অবক্ষয় হয়েছে। সার্বিকভাবে এর উত্তরণের জন্য মাছের বিচরণস্থল, খাদ্য গ্রহণ স্থান ও প্রজননক্ষেত্র পুনরুদ্ধার করতে জলাশয় দূষণ রোধ করা এবং জলাভূমির মূল উৎসের সাথে সংযোগ পুনঃস্থাপন করে। মৎস্য আবাসস্থল পুনরুদ্ধার এবং মাছের খাদ্য ও প্রজননের জন্য চলাচল পথ (feeding and breeding migration route) উন্মুক্ত করতে হবে।

মৎস্য অধিদপ্তরাধীন ওয়েটল্যান্ড বায়োডাইভারসিটি রিহ্যাবিলিটেশন প্রকল্প (Wetland Biodiversity Rehabilitation Project- WBRP)- এর মাধ্যমে প্রথম তিন বছরে (২০০৯-২০১২) ৫০ হেক্টরের অধিক ফিডার খাল ও বিল পুনঃখনন করার জন্য ৩.১৯ কোটি টাকা ব্যয় করা হয় এবং এর মাধ্যমে ১৬টি আবাসস্থল উন্নয়ন অত্যন্ত কৃতকার্যতার সাথে বাস্তবায়ন করা হয় যার মাধ্যমে ৭০৩১ জন দরিদ্র সুফলভোগীর খণ্ডকালীন সময়ের কর্মসংস্থান হয়। ফলে বন্যার হাত থেকে বৃহত্তর পাবনা জেলা রক্ষাকারী বাঁধের ভিতরের অংশের প্লাবনভূমি ও বিলে জোয়ারের সময় যমুনা নদীর কার্প ও অন্যান্য শ্রেণির মাছের রেণু, ধানী ও বড় পোনার প্রবেশ নিশ্চিত হয়েছে এবং মৎস্য উৎপাদন ও জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি বৎসরে আরও ৫টি জলাশয়ের পুনঃখনন কাজ চলছে এবং প্রায় ২.৩৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ফিডার খাল ও বিল পুনঃখনন কাজ চলমান রয়েছে।

২. অভয়াশ্রম স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা
(Sanctuary establishment and management)

ক. মাছের অভয়াশ্রম স্থাপন বা প্রটেক্টেড এরিয়া ঘোষণা: নদী নিবাসী, বিল নিবাসী, প্লাবনভূমি নিবাসী ইত্যাদি আবাসস্থলের প্রতিটি প্রজাতি মাছের আলাদা আলাদা প্রজনন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মৎস্য অভয়াশ্রমে বিভিন্ন প্রজাতির ছোট-বড় এবং মা-বাবা মাছ নিরাপদে আশ্রয় নেয়, বড় হয় এবং প্রজনন মৌসুমে তাদের সুবিধাজনক স্থানে প্রজনন করে। জলাভূমির কোনো নির্দিষ্ট উপযোগী এরিয়াতে অভয়াশ্রম সামগ্রী স্থাপন করে অভয়াশ্রম হিসেবে ঘোষণা করা হয়। আবার কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় মাছ আহরণ নিষিদ্ধ করে ঐ এলাকাকে প্রটেক্টেড এরিয়া হিসেবে ঘোষণা করা যায়। বিভিন্ন প্রজাতির মাছের জন্য বিভিন্ন আবাসস্থলে অভয়াশ্রম প্রয়োজন। যেমন- কৈ, শিং, মাগুর, টাকি ইত্যাদি মাছের জন্য বিল বা প্লাবনভূমিতে অভয়াশ্রম স্থাপন করতে হবে। আবার কার্প শ্রেণির মাছ ও বড় আকারের ক্যাটফিসের জন্য নদীতে মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন করতে হবে। ইতোমধ্যে WBRP এর মাধ্যমে ১০টি অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়েছে এবং আরো ১৫টি অভয়াশ্রম স্থাপনের কার্যক্রম চলছে। ইতোমধ্যে স্থাপিত অভয়াশ্রমসমূহের প্রভাবে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট জলাশয়গুলোর অধিকাংশ জলাশয়ে বিলুপ্তপ্রায় চিতল মাছ, শিং, মাগুর, কই, পাবদা, টাকি, শোল ইত্যাদি

মাছের পুনরাবির্ভাব ঘটেছে, মাছের প্রাচুর্যতা ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশিভাবে মাছের এ প্রাচুর্যতার জন্য জলাশয় এলাকায় পাখিকূলের সমাগম ঘটতে শুরু করেছে। বেশ কয়েকটি জলাশয়ে শাপলা, পদ্ম ইত্যাদি জলজ উদ্ভিদের পুনরাবির্ভাব ঘটেছে। WBRP কর্তৃক পরিচালিত ২০১৩ এর গবেষণা রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায় যে, মাছের আহরণ মাত্রা WBRP-এর আওতায় জলাশয়সমূহে প্রকল্প বহির্ভূত জলাশয়সমূহের চেয়ে শতকরা ২৫ ভাগ বেশি।

খ. ডলফিন অভয়াশ্রম স্থাপন: ডলফিন স্তন্যপয়ী শ্রেণির প্রাণী। IUCN এর রিপোর্ট অনুযায়ী ডলফিন বিপন্ন প্রজাতির প্রাণী এবং রেডলিস্টের অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়সমূহে *Platanista gangetica* নামক প্রজাতির ডলফিন রয়েছে যার দু'টো উপপ্রজাতি রয়েছে, যথা- *Platanista gangetica gangetica* (Ganges River dolphin) *Ges Platanista gangetica minor* (Irrawaddy River dolphin)| *Lipotes vexillifer* নামক আরো একটি ডলফিন বাংলাদেশে পাওয়া যেত কিন্তু এটি এখন আর পাওয়া যায় না এবং এটি বিলুপ্ত হয়ে গেছে বলে ধারণা করা হয়। বন বিভাগ ২০১০ সালে ডলফিন সংরক্ষণের জন্য সুন্দরবনের ৩১.৪ কিমি এলাকাব্যাপী তিনটি স্থানকে ডলফিনের অভয়াশ্রম হিসেবে ঘোষণা করেছে। ডলফিনকে রক্ষা করতে হলে এদের জীবনচক্র, বিচরণ, খাদ্যাভ্যাস, ফিডিং গ্রাউন্ড, ব্রিডিং গ্রাউন্ড, এদের সংখ্যা হ্রাসের কারণ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে গবেষণা প্রয়োজন এবং গবেষণা ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে ডলফিনের অভয়াশ্রম স্থাপনের জন্য পরিকল্পনা করা সমীচীন। WBRP-এর উদ্যোগে ডলফিন সংরক্ষণের লক্ষ্যে প্রকল্প আওতাভুক্ত বড়াল নদীর সিলন্দা ও যমুনা নদীর মাশখালী অংশের একটি এলাকাকে সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। WBRP-এর মাধ্যমে ডলফিনের ওপর একটি প্রাথমিক জরিপ পরিচালনা করা হয়। জরিপ ফলাফলে দেখা যায় যে, পদ্মা নদীতে স্রোতের প্রতিকূল এবং অনুকূল স্থানে ডলফিনের প্রাচুর্যতা প্রতি একশত কিলোমিটারে যথাক্রমে ৫ ও ২টি, কিন্তু যমুনা নদীতে ডলফিনের প্রাচুর্যতা যথাক্রমে ১২ ও ৫টি অর্থাৎ সংরক্ষিত অঞ্চলে ডলফিনের প্রাচুর্যতা বেশি। এরই মধ্যে নদী ও বিলের বিভিন্ন অভয়াশ্রমে বিভিন্ন পাখি, জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রাচুর্যতা লক্ষণীয় বিষয়। নান্দিয়ারা বিল, ধলাই বিল, গাংভাঙ্গা বিল ইত্যাদি এদের মধ্যে অন্যতম।

৩. মৎস্য প্রজননক্ষেত্র সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা
(Conservation and management of fish breeding ground)

ক. মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন: মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে মৎস্য লালন বা প্রজননক্ষেত্র সংরক্ষণ করতে হবে। জলাশয় সেচে মাছ আহরণ, ডিমওয়ালা মাছ আহরণ এবং পোনা ও মা-বাবা মাছ নিধন রোধ করে পোনা মাছকে বড় হবার এবং বড় মাছকে বংশবৃদ্ধির সুযোগ দিয়ে সহজেই মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়।

খ. মাছ ধরার সরঞ্জাম, জাল ও জালের ফাঁস নিয়ন্ত্রণ: মুক্ত জলাশয়ে মাছ আহরণের জন্য সারা বছরই বিভিন্ন প্রকার জাল ও সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়। এগুলোর মধ্যে ফিস ট্র্যাপ (যেমন- চাঁই, বাঘাইর ইত্যাদি), স্পেয়ার (যেমন- কুঁচ, দুতিয়া, একটেটা ইত্যাদি), ফিক্সড নেট (যেমন- খরা জাল, ভীম জাল, দল জাল ইত্যাদি), ড্র্যাগ নেট (যেমন- মই জাল ইত্যাদি), বেড় জাল (যেমন- মশারি জাল ইত্যাদি) এবং গিলনেট (যেমন- কারেন্ট জাল ইত্যাদি) মাছ সংরক্ষণের সবচেয়ে বড় অন্তরায় এবং ক্ষতি করে থাকে। এসব জাল ও সরঞ্জাম যে সকল প্রজাতির মাছ যেমন- মাগুর, টাকি, শোল, আইড় ইত্যাদি মাটিতে গর্ত করে বাসা বেধে প্রজনন করে থাকে, তাদের আবাসস্থল বিনষ্ট করে ফেলে। তাই আগামী প্রজন্মের সার্বিক পুষ্টি নিরাপত্তা বিধানে সকল প্রজাতির মাছের বংশ সুরক্ষা করতে জালের ফাঁস নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট প্রজাতি ও আকারের মাছ আহরণ সীমিত পর্যায়ে রাখা যেতে পারে।

৪. বিপন্নপ্রায় প্রজাতির ব্রুড পুনমজুদ ও ব্যবস্থাপনা
(Restoration and management of endangered species brood)

জলবায়ুর পরিবর্তন, জনসংখ্যার চাপ, পরিবেশ দূষণ ও সুদীর্ঘ সময় ধরে প্রাকৃতিক জলাশয়ে নানাবিধ ক্ষতিকর উপায়ে অতি-আহরণ হওয়ায় দেশীয় প্রজাতির অনেক মাছের অস্তিত্ব আজ হুমকির মুখে। স্থানীয়ভাবে অবলুপ্তপ্রায় এসব মূল্যবান মৎস্য প্রজাতি এবং অন্যান্য জীব পুনরুদ্ধারকল্পে প্রাকৃতিক জলাশয়ে এদের ব্রুড মজুদ করে বংশবৃদ্ধির সুযোগ করে দিতে পারলে প্রাকৃতিক পরিবেশে এরা প্রজনন করে বংশ বৃদ্ধি করবে। এ ধরনের পোনা মজুদ অভয়াশ্রম এলাকায় করলে তা অধিকতর সুফল বয়ে আনবে। WBRP থেকে প্রথম ধাপে স্থানীয়ভাবে বিপন্নপ্রায় দেশি সরপুঁটি, গুলসা, শিং, মাগুর, পাবদা, মেনি ইত্যাদি মাছের ১২,৩৫৮টি (৪৭০ কেজি) প্রাপ্তবয়স্ক মাছ বিভিন্ন জলাশয়ে পুনঃমজুদ করা হয়েছে, যার ফলে এসব মাছ বিগত বছর বিল ও বিলের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রজনন করে বংশ বৃদ্ধি করেছে।

৫. জলজ বৃক্ষরোপণ এবং সমন্বিত চাষ কৌশল
(Aqatic plantation and integrated farming)

জলাভূমির জীববৈচিত্র্য সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ গাছপালা থাকা সমীচীন। এসব গাছপালা জলজ পরিবেশে বসবাসকারী বিভিন্ন প্রাণীর আবাসস্থল, খাদ্যের উৎস এবং প্রজননের জন্য সাপোর্ট হিসেবে ভূমিকা রাখে। সাধারণত জলাভূমির প্রতিবেশ ব্যবস্থা পুনরুদ্ধারের জন্য প্রচলিত ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে এর প্রাকৃতিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। সরাসরি গাছ রোপণ বা বীজ বপনের মাধ্যমে জলাভূমির প্রতিবেশ পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে অবশ্যই দেশীয় প্রজাতি, বিশেষ করে যেসব গাছ পূর্বে ঐ এলাকায় পাওয়া যেত সেসব গাছ রোপণ করতে হবে। WBRP থেকে প্রথম ধাপে স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন জলাশয়ের তীরবর্তী বা পার্শ্ববর্তী স্থানে বিপন্নপ্রায় ৬,০০০টি জলজ বৃক্ষ, যেমন- হিজল, করচ ইত্যাদি গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে। অন্যদিকে বন বিভাগের সহায়তায় ২৬,০০০টি ফলজ এবং কাঠ উৎপাদনকারী গাছ প্রকল্পের সুফলভোগীদের এলাকায় রোপণ করা হয়েছে।

৬. মাছের পোনা অবমুক্তকরণ (Fish fry stocking)

মাছের পোনা অবমুক্তকরণ বিষয়টিকে অনেকেই সমালোচনা করে থাকেন কিন্তু বাস্তবে মুক্ত জলাশয়ে বেশ কিছু মাছের প্রজনন না হওয়া, প্রজননক্ষেত্র বিনষ্ট হওয়া ইত্যাদি কারণে মুক্ত জলাশয়ে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ বর্তমানে জরুরি হয়ে পড়েছে। সাময়িক ক্ষতিপূরণ হিসেবে অন্ততঃপক্ষে কার্প জাতীয় মাছ, ক্যাট ফিস ইত্যাদি মাছের পোনা অবমুক্ত করার মাধ্যমে মজুদ সমৃদ্ধ রাখা জরুরি। WBRP-এর প্রথম ধাপে প্রকল্পের বিভিন্ন জলাশয়ে স্থানীয়ভাবে বিপন্ন প্রজাতির মাছ, যেমন- দেশি সরপুঁটি, গুলশা, শিং, মাগুর, চিতল, পাবদা, মেনি, মহাশোল ইত্যাদি মাছের ৬৯,৩৬৪টি (১৬৭ কেজি) পোনা (২-৩ ইঞ্চি) মাছ অবমুক্ত করা হয় এবং এর ফলে বর্তমানে মাছসমূহ জলাশয়সমূহে প্রজনন করার কারণে এদের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭. বিল নার্সারি স্থাপন (Establishment of beel nursery)

পোনা অবমুক্তির চেয়ে প্রাকৃতিক জলাশয়ে বিল নার্সারি স্থাপন তুলনামূলকভাবে অত্যন্ত কার্যকর একটি পদ্ধতি বা কৌশল। এতে কম সময়ে কম খরচে নিজেদের চাহিদা অনুযায়ী অনেক বেশি পোনা উৎপাদন করা যায় এবং অবমুক্তিজনিত মৃত্যুহারও অনেক কম হয়। বিল নার্সারিতে উৎপন্ন পোনা বর্ষার পানিতে প্লাবিত হয়ে স্বাভাবিকভাবেই বিলে ছড়িয়ে পড়বে, বড় হবে এবং সংযোগ খালের মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী নদ-নদীতে যাবে ও বংশবৃদ্ধি করবে। ফলে দেশের সামগ্রিক মৎস্য উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে। রাজস্ব খাত থেকে নান্দিয়ারা বিলে বিল নার্সারি স্থাপন করার ফলে উক্ত বিলে রুই জাতীয় মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি বছর মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক WBRP-র অন্তর্ভুক্ত পাবনা জেলাধীন ধলাই ও কানসোনা বিলে রাজস্ব খাতের আওতায় বিল নার্সারি স্থাপন করা হয়েছে।

৮. মৎস্য ও কৃষিবান্ধব অবকাঠামো স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা
(Construction of fish and agro-friendly structure and operation)

সেচ ও পানি প্রবাহ চলমান রাখার জন্য বিভিন্ন প্রকার অবকাঠামো বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করা হয়েছে যদিও এগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৃষিবান্ধব হলেও মৎস্যবান্ধব নয়। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৫.৫ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে ৬৫৩টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে সেচ প্রদান করা হয় এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে প্রায় ৪,১৯০টি রেগুলেটর বা স্লুইসগেইট যেগুলোর মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা হয় ফলে এর সাথে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন সরাসরিভাবে প্রভাবিত হয়। তাই এ অবকাঠামোগুলো মৎস্য ও কৃষিবান্ধব করার জন্য এদের ব্যবস্থাপনা কৌশল পরিবর্তন করতে হবে। যে সকল অবকাঠামোগুলো মৎস্য ও কৃষিবান্ধব হওয়া সমীচীন সেগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

ক. স্লুইসগেইট ব্যবস্থাপনা: বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সেচ সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য স্লুইসগেইট নির্মাণ করা হয়েছে। স্লুইসগেইটগুলো ফসল উৎপাদনের জন্য উপকারী হলেও লক্ষ লক্ষ মৎস্যজীবীর জীবন-জীবিকার জন্য নেতিবাচক প্রভাব রাখছে; একই সঙ্গে জলাভূমির প্রাকৃতিক সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য হুমকি হিসেবে কাজ করছে। স্লুইসগেইটগুলোকে সঠিক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসল উৎপাদনের পাশাপাশি জলজ সম্পদ বৃদ্ধির কাজে লাগানো সম্ভব। এজন্য প্রাক বর্ষায় পোনা প্লাবনভূমিতে প্রবেশ করানোর জন্য ভরাট

খাল পুনঃখনন করা প্রয়োজন। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে জোয়ারের পানির সাথে মাছের ডিম, রেণু পোনা ও ডিমওয়ালা মাছ নদ-নদী হতে বিল ও প্লাবনভূমিতে প্রবেশ করতে দেয়া প্রয়োজন; ফসলের ক্ষতি না করে স্লুইসগেইট দিয়ে পরিমিতভাবে জোয়ারের পানি জলাশয়ে প্রবেশ করাতে হবে; মাছ চলাচলের সময় স্লুইসগেইটের খালে মাছ ধরা বন্ধ রাখতে হবে। এগুলো করা সম্ভব হলে- নদী থেকে বিল-প্লাবনভূমিতে নানা জাতের মাছের ডিম, পোনা ও ডিমওয়ালা মাছ প্রবেশ করতে পারবে; মাছ ডিম ছাড়া ও বড় হওয়ার সুযোগ পাবে এবং মাছের সার্বিক উৎপাদন অনেকাংশে বেড়ে যাবে এবং বিল-প্লাবনভূমি মাছ ও জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ হবে।

খ. ফিস পাস ও ফিস ফ্রেন্ডলি রেগুলেটর স্থাপন: বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের কারণে দেশের বহু জলাশয়ে মাছের প্রবেশ ব্যাহত হয় এবং উৎপাদন ও জীববৈচিত্র্যে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এসব বাঁধে ফিস পাস তৈরি করে সংলগ্ন জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। তাছাড়া পানি নিয়ন্ত্রণের জন্য ইতোমধ্যে নির্মিত রেগুলেটরসমূহের মধ্যে বা পার্শ্বে ফিস ফ্রেন্ডলি রেগুলেটর নির্মাণ করে নদী হতে বিলে এবং বিল হতে নদীতে মাছের যাতায়াতকে সুগম করা প্রয়োজন। এতে মাছের মাইগ্রেশন নিশ্চিত হয়ে প্রজননের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে প্রাকৃতিক প্রবেশন বৃদ্ধি পাবে, হবে মাছের বাড়তি উৎপাদন। অন্যদিকে স্পিলওয়ের মাধ্যমে কোনো জলাধারে একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় পানি ধরে রাখা যায় এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে স্পিলওয়েও ভূমিকা রাখতে পারে। WBRP এলাকায় ৯৬ টি স্লুইসগেইট রয়েছে যেগুলোর প্রতিটিই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জলাভূমির জীববৈচিত্র্যকে প্রভাবিত করছে। প্রকল্প থেকে ভরাট খাল পুনঃখনন করার কাজ চলমান রয়েছে। আটটি স্লুইসগেইটকে একটি গবেষণাধর্মী কার্যক্রমের আওতায় নেয়া হয়েছে এবং যমুনা নদীর মাছের রেণু, স্লুইসগেইটসমূহের বাইরে এবং ভিতরে মাছের রেণুর পরিমাণ, প্রজাতির সংখ্যা, এদের প্রাপ্যতা ইত্যাদি তথ্যাদি ক্যাচ মনিটরিং এর মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়। এতে দেখা গেছে যে, স্লুইসগেইট সংশ্লিষ্ট যেসব খাল প্রকল্পের মাধ্যমে পুনঃখনন করা হয়েছে সেগুলোর মাধ্যমে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি রেণু বিল ও প্লাবনভূমিতে প্রবেশ করছে।

৯. জলাভূমির সমাজভিত্তিক সহ-ব্যবস্থাপনা বা সমাজ-ভিত্তিক মৎস্য সহ-ব্যবস্থাপনা (Commmunity based co-management approach)

সম্পদের যথাযথ ব্যবস্থাপনাই সম্পদের ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকার উন্নয়ন ঘটাতে পারে এবং জীববৈচিত্র্যকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে পারে। বদ্ধ জলাশয় ব্যবস্থাপনা এবং মুক্ত জলাশয় ব্যবস্থাপনা প্রায় সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দু'ধরনের ব্যবস্থাপনা। যেহেতু মুক্ত জলাশয় সর্বসাধারণের সাধারণ সম্পদ এবং মুক্ত জলাশয় ব্যবস্থাপনার সাথে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি ইস্যুগুলো সরাসরি জড়িত। তাই এ সম্পদের ব্যবস্থাপনায় সমাজভিত্তিক মৎস্য সহ-ব্যবস্থাপনা একটি গ্রহণযোগ্য ও সফল কৌশল হতে পারে। সহ-ব্যবস্থাপনা হলো সম্পদ ব্যবহারকারী স্থানীয় জনগোষ্ঠী, সরকার ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের অংশীদারিত্বমূলক এক ধরনের ব্যবস্থাপনা। এক কথায় বলা যায় সহ-ব্যবস্থাপনা হলো সম্পদের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডার বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহলের সম্মিলিত প্রয়াস। এ ব্যবস্থাপনার সুফল সম্পদের ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীরাই সুষমভাবে ভোগ করে থাকে। WBRP-এর মাধ্যমে ২৫টি মৎস্য সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন (যা বিএমও নামে পরিচিত) এর মাধ্যমে জলাশয় ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করা হচ্ছে।

১০. জনসচেতনতা সৃষ্টি (Mass awareness raising)

উন্নয়নমূলক কাজ হোক আর অন্য যে কোনো প্রকার কাজই হোক উক্ত কাজ সম্পর্কে জনগণের সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে তাদের অংশগ্রহণ আশানুরূপ হয় না। জলজসম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও জলজ সম্পদের গুরুত্ব, উপকারিতা, সম্পদের ওপর তাদের অংশীদারিত্ব, তাদের অধিকার ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত করা প্রয়োজন। এজন্য বিভিন্ন পর্যায়ে শেয়ারিং মিটিং, প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য শিক্ষা সফর, পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ, বিল বোর্ড ও মেসেজ বোর্ড স্থাপন, পথ নাটক, রেডিও-টিভিতে বিজ্ঞাপন প্রচার ইত্যাদি করা যেতে পারে। WBRP থেকে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য বিশ্ব জলাভূমি দিবস; বিশ পরিবেশ দিবস; আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবস; বিশ্ব মৎস্য দিবস এবং আন্তর্জাতিক নারী দিবস ইত্যাদি দিবসসমূহ উদ্‌যাপনে পথনাটক ও সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে।

উপসংহার (Conclusion)

পরিশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অনুকূল জলবায়ু আর উপযোগী প্রাকৃতিক পরিবেশ এদেশের বিশাল জলরাশিকে এক মূল্যবান সম্পদে পরিণত করেছে। নবায়নযোগ্য এ প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে শুধুই নেয়া- এ মানসিকতা বর্জন করে কিছু দেয়ার মানসিকতা সংশ্লিষ্ট সকলকে অর্জন করতে হবে। আর সেজন্য এবং বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার ভিশন ২০২১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দেশের সম্ভাবনাময় ও পুরোপুরি উপযোগী অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে বিজ্ঞানসম্মত, উৎপাদনমুখী ও কার্যকর ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে অধিক মৎস্য তথা জলজ সম্পদ উৎপাদন ও বৃদ্ধি সম্ভব এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে প্রাকৃতিক সম্পদ এক বিরাট ভূমিকা রাখবে।

১ প্রকল্প পরিচালক, ডব্লিওবিআরপি, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ (hasemsumon@yahoo.com)
২ বায়োডাইভার্সিটি এন্ড এনআরএম এক্সপার্ট, ডব্লিওবিআরপি, মৎস্য অধিদপ্তর-GIZ, GOPA Worldwide Consultants
৩ সহকারী প্রকল্প পরিচালক, ডব্লিওবিআরপি, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

উপকূলীয় উন্মুক্ত জলাশয় ব্যবস্থাপনা ও জেলে পুনর্বাসন

Coastal Open Water Management and Fishers' Rehabilitation

ড. এ কে এম আমিনুল হক

Abstract

Fishing is nearly the only means of livelihood of a large majority of coastal population by birth. Storms, tidal surges, river erosion, siltation, erratic rain and drought make coastal fishers landless, jobless and stranded. Changes in climate and consequent losses in productivity in natural ecosystems and unemployment have been identified as the major challenges to Bangladesh in the 21st century. In fact, rehabilitation of coastal fishers is needed for the sake of sustainable management of the coastal fisheries. They do not have any formal education or technical training nor have any insurance coverage. The author suggests here some means and ways for the coastal fishers to reduce adverse impacts of climate change through formal education, family planning, vocational training, employment, empowerment, alternative livelihood, insurance coverage, grants and supportive programmes specially coastal aquaculture in plastic floating net cages. The author holds that if 0.1 million coastal fishers are provided with the same at a cost of Tk. 1000 million which the government spends every year as a food grant for them for the sake of protection and conservation of hilsa fry in coastal region, it will yield 20,000 tons of tilapia of Tk. 2000 million in one hand and on the other hand it will allow an extra production of 1,00,000 tons of hilsa of Tk. 40,000 million.

দেশের অর্থনীতিতে মৎস্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপখাত। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১২ এর তথ্য মতে জাতীয় আয়ের ২.৭৩, রপ্তানি আয়ের ৪.৩৯ ও কৃষিজ আয়ের ২২.৭৬ শতাংশ এই উপখাতের অবদান। দেশের প্রায় ১.৬৫ কোটি লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ উপখাতের বিভিন্ন কার্যক্রমে নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ের দীঘি-পুকুরের উৎপাদন বাড়লেও বিগত কয়েক বছর যাবৎ জলবায়ু পরিবর্তন মৎস্য আহরণ চাপ ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের উৎপাদন অশানুরূপ বৃদ্ধি পায়নি। উৎপাদন ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা ব্যতিরেকে এখনও দেশের উপকূলীয় উন্মুক্ত জলাশয়ের উৎপাদন মোটামুটি স্থিতিশীল। প্রায় পাঁচ লক্ষ জেলে এ উপকূলীয় অঞ্চলে মৎস্য আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করে। এ অঞ্চলের মাটি ও পানিও অপেক্ষাকৃত কম দূষণযুক্ত ও অধিকতর উৎপাদনশীল। সুতরাং বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় উন্মুক্ত জলাশয়ে নানামুখী আধুনিক মৎস্যচাষ ও প্রাকৃতিক মৎস্যসম্পদের স্থায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনা দেশের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত উৎপাদন হ্রাস, বর্ধিত চাহিদা পরিপূরণ ও জলবায়ু উদ্বাস্তু জনশক্তির কর্মসংস্থানে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক উৎপাদন হ্রাস ও বেকারত্ব বাংলাদেশে একবিংশ শতাব্দীর বড় চ্যালেঞ্জ। ভৌগোলিক অবস্থান ও সম্পদ স্বল্পতার বিপরীতে জনসংখ্যার আধিক্যহেতু পূর্ব হতেই সমস্যাসঙ্কুল বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব অধিকতর প্রকট। পানির অভাবে অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ে সনাতন ও আধুনিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা হুমকির মুখে। মৎস্য সেক্টরে সম্পৃক্ত জনবল বিশেষ করে অভ্যন্তরীণ জেলে সম্প্রদায় ক্রমেই বেকার হয়ে পড়ছে। আবার উপকূলীয় অঞ্চলে ক্রমাগত নদীভাঙ্গন, ফসলহানি, দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও ভূমিহীনতা ভাসমান উদ্বাস্তুর সংখ্যা বৃদ্ধি করছে। এ ভূমিহীন কৃষি উদ্বাস্তুর এক বিরাট অংশ প্রতিবছর যুক্ত হচ্ছে উপকূলীয় নদ-নদীর অব্যবস্থিত ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণ সেক্টরে। ফলে ক্রমবর্ধিষ্ণু সনাতন জেলেদের সাথে এ ভাসমান জেলেবহর যুক্ত হয়ে উপকূলীয় প্রাকৃতিক মৎস্যসম্পদ বিশেষ করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা ক্রমেই জটিল করে তুলছে। অথচ পরিকল্পিত উপকূলীয় জলাশয় ব্যবস্থাপনা এই চাপ আত্মস্থ করেও বাড়তি উৎপাদনে সক্ষম।

ছবি: মেঘনা-তেঁতুলিয়া নদীর অববাহিকায় চর মন্তাজ-চর বেস্টিন চ্যানেলে নির্মীয়মান ক্রসড্যাম

উপকূলীয় জেলেদের পুনর্বাসন
(Rehabilitation of coastal fishers)

উপকূলীয় অঞ্চলের বৃহত্তর জন-অংশ মৎস্যজীবী জেলে সম্প্রদায়। এদের জীবন-জীবিকা প্রায় সম্পূর্ণত এ অঞ্চলের মৎস্যসম্পদের ওপর নির্ভরশীল। এরা জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। এরা মূলত উন্মুক্ত জলাশয় থেকে প্রাকৃতিক মৎস্য আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করে। আর প্রাকৃতিক মৎস্য আহরণ প্রায় সম্পূর্ণ ঋতু ও অনুকূল আবহাওয়া-নির্ভর। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ইতোমধ্যেই ঘন ঘন প্রাকৃতিক জলোচ্ছ্বাস, ঝড়, সিডোর, আইলা, মহাসেন

আঘাত হানছে। ফলে জেলেদের মৎস্য আহরণ কমে গেছে ও জীবনের ঝুঁকি বেড়ে গেছে। জাল, নৌকা ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদির ক্ষয়ক্ষতিও বেড়ে গেছে। জীবিকার্জনের অন্য কোনো যোগ্যতা না থাকায় জীবনের ঝুঁকি নিয়েও এবং ন্যূনতম আয়ে এ পেশা কামড়ে পড়ে আছে। অথচ যথাযথ পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের উপকূলীয় প্রাকৃতিক মৎস্যসম্পদের স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করে এ শ্রেণিপেশার জীবনমান উন্নয়ন খুবই জরুরি। বস্তুত এ সম্প্রদায়ের উন্নয়ন দেশের প্রাকৃতিক মৎস্যসম্পদের স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের পূর্বশর্ত।

উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের স্থায়িত্বশীল উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণে সবচেয়ে বড় বাধা স্বল্পশিক্ষিত, প্রকৃতিনির্ভর, দাদনজর্জর, নতশির, মূক ও বুভুক্ষু জেলে সম্প্রদায়। এরা প্রথাগত অধিকারে বংশপরম্পরায় এসব উপকূলীয় এলাকায় বসবাস ও মৎস্য আহরণের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। এদের জনসংখ্যা অনিয়ন্ত্রিত ও অপরিকল্পিত। শিক্ষার হার নিম্নতম। অধিকাংশই ভূমিহীন। কেউ ভাসমান। স্ত্রী-সন্তান সাথে নিয়ে নদীতে মাছ ধরে জীবিকার সন্ধান করে। নিজেদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করার অবকাশ তাদের নেই। শতকরা পঁচানব্বই ভাগ জেলে দাদন-মহাজনের দুষ্টচক্রে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। যেহেতু সম্পদ, সামাজিক পরিচিতি, শিক্ষা-দীক্ষা কোনোটিই এদের নেই। সুতরাং প্রচলিত ব্যাংক ঋণ তাদের দুরাশা। এনজিও-মহাজনই তাদের ভরসা। দালাল শ্রেণির দৌরাত্মে সরকারি সুযোগ-সুবিধাও ঠিকমত পায় না। আর নিজেদের অপ্রস্তুতি ও নিরক্ষরতার কারণে প্রাপ্ত সরকারি-বেসরকারি সুযোগ-সুবিধাও সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারে না। এদের এক বিরাট অংশ উপকূল ও সাগরে মাছ ধরে। এদের পেশা সবচেয়ে অনিশ্চিৎ ও ঝুঁকিপূর্ণ। এরাই সামুদ্রিক মৎস্য নৌযানে করে সাগরে যায়। ঝড়-ঝঞ্ঝা-নৌ ডাকাতির এরাই প্রাথমিক শিকার। অথচ এদের কোনো বীমা সুবিধা বা আর্থিক নিশ্চয়তা নেই। এজন্য আগে এদের সক্ষমতা বাড়াতে হবে। এ লক্ষ্যে নিচের চিন্তাসূত্রে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে:

ক. শিক্ষা ও পরিবার পরিকল্পনা (Education and family planning)

উপকূলীয় দক্ষিণাঞ্চলে পাঁচ শতাধিক দেশি-বিদেশি এনজিও কাজ করছে। এদের অনেকেরই শিক্ষা ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম রয়েছে। জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের বিভিন্ন জিও সংস্থা এনজিও-কে সম্পৃক্ত করে জেলে সম্প্রদায়ের মধ্যে অঞ্চলভিত্তিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা ও পরিবার পরিকল্পনা প্যাকেজ চালু করা যেতে পারে। এদের সন্তানদেরকে শত ভাগ শিক্ষাবৃত্তি ও বিনামূল্যে যাবতীয় শিক্ষা উপকরণ দিতে হবে। সন্তান-সন্ততিকে স্কুলে পাঠানোর ক্ষতি পূরণের জন্য এদেরকে ক্ষেত্রবিশেষে অভিভাবক ভাতা প্রদান করা যেতে পারে। পরিকল্পিত পরিবার গঠনের জন্য উদ্বুদ্ধকরণসহ সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা নিতে হবে।

খ. কারিগরি প্রশিক্ষণ (Technical training)

জেলে সম্প্রদায় বিশেষত উপকূলীয় দক্ষিণাঞ্চলের জেলেরা এখনও ছোট ছোট ডিঙ্গি নৌকায় কারেন্ট জাল বা বড়শি দিয়ে মাছ ধরে। কেউবা বেহুন্দি জাল, ইলিশ জাল, মই জাল, চট জাল, বেড় জাল বা চর বেড়া জাল ব্যবহার করে। কোন্ জালে কখন মাছ ধরা যাবে বা কোন্ কোন্ জালে মাছ ধরা নিষিদ্ধ বা কত ফাঁসের জাল ব্যবহার করতে হবে - অধিকাংশ জেলেরই এ বিষয়ে সম্যক ধারণা নেই। মৎস্য সংরক্ষণ আইনসহ স্থায়িত্বশীল জলমহাল ব্যবস্থাপনায় তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য ও অধিকার সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তির সাথেপরিচিত করতে হবে। মানসম্মত জাল ও উন্নত সংরক্ষণ এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা-সম্বলিত দ্রুতগামী নৌযান সরবরাহ করে জেলেদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মঘণ্টা সাশ্রয় করা প্রয়োজন।

গ. কর্মসংস্থান (Fishers' employment)

বৈশ্বিক আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে বিশ্বব্যাপী মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন ক্রমশ কমছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। অথচ জেলেদের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। ফলে জেলেদের বেকারত্ব দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। উপকূলীয় অঞ্চলে ঝড়-জলোচ্ছ্বাস প্রাকৃতিক দুর্যোগও ক্রমশ বাড়ছে। সুতরাং জেলেদের নিরাপত্তা, জীবিকায়ন ও অন্যত্র স্থায়ী পুনর্বাসন প্রয়োজন। এক্ষেত্রে জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের সহায়তা নেয়া যেতে পারে। দেশি-বিদেশি শ্রম বাজারের চাহিদা অনুযায়ী উপযুক্ত ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ দিয়ে এদের দেশ-বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সম্প্রতি থাইল্যান্ড ৫০,০০০ জন জেলে শ্রমিক চেয়েছে। এ ধরনের সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। বিদেশে আরও শ্রমবাজার অনুসন্ধান করতে হবে। দেশে অন্তত ৫,০০,০০০ জেলে প্রচ্ছন্ন বেকার ও সম্পদের তুলনায় অতিরিক্ত। জনশক্তি ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিদেশে কর্মসংস্থান করে উপকূলীয় প্রাকৃতিক মৎস্যসম্পদের ওপর অতিরিক্ত আহরণ চাপ কমানোর সুযোগ রয়েছে।

ঘ. সংগঠন (Organisation)

স্বাক্ষরতা, সুশিক্ষা, সামাজিক মর্যাদা, অধিকার সচেতনতা এবং পারস্পরিক সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ সংগঠনের পূর্বশর্ত। শতকরা নিরানব্বই জন জেলে এসবের ধারে কাছেও নেই। ফলে বিদ্যমান জেলে সংগঠনসমূহের সুফল তারা পাচ্ছে না। একই কারণে সংগঠনের নেতৃবৃন্দও তাদের নিকট সংগঠনের সুফল পৌঁছাতে পারছেন না বা তৃণমূল পর্যায়ের সদস্যবৃন্দ তা ধারণ করতে পারছেন না। উপযুক্ত শিক্ষা ভিন্ন এটি সম্ভব নয়। জেলে সম্প্রদায়কে শতভাগ শিক্ষিত, সমাজে প্রতিষ্ঠিত, অধিকার সচেতন ও সুনাগরিক করে গড়ে তুলতে হবে। প্রশাসন ও মৎস্য অধিদপ্তরকে এনজিওসমূহের সহায়তা নিয়ে জেলে সংগঠনসমূহকে সুসংগঠিত ও কার্যকর করতে হবে।

ঙ. বীমা (Insurance)

উপকূলীয় জেলে সম্প্রদায় ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত। এরাই ঝড়-জলোচ্ছ্বাস-ডাকাতি উপেক্ষা করে উপকূলীয় নদ-নদী ও সাগরে মাছ আহরণ করে দেশের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রয় করে। এদের কষ্ট ও ঝুঁকির সুফলভোগী সমাজের বিত্তশালী ও রাষ্ট্রসহ ভ্যালু চেইনের সবাই। অথচ এদের বীমা নেই বা বীমার কিস্তি দেয়ার সামর্থ্য নেই। ঝুঁকির প্রকৃতি, প্রকার ও মাত্রাভেদে সকলের জন্য বিভিন্ন বীমা সুবিধা থাকা প্রয়োজন। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জীবন বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক সাগরে মৎস্য আহরণকারী জেলেদের জন্য দলগত বীমার প্যাকেজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অন্যান্য বীমা কোম্পানিরও এক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক প্যাকেজ ও সেবার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। সমাজের এ হতদরিদ্রদের জন্য সমাজের বিত্তবান, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান, বিএফএফইএ, শ্রমিক সংগঠন, এনজিও ও সরকারের কার্যকর উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

চ. সহায়ক কর্মসূচি (Supportive programme)

মুক্ত জলাশয়ে মাছ চাষের বিপুল সম্ভাবনা এখনও অনুদ্‌ঘাটিত। খাঁচা ও পেনে মাছ চাষ প্রযুক্তি এ অঞ্চলে যথেষ্ট উপযোগী ও প্রমাণিত হলেও এখনও অপ্রচলিত। এলাকাটি দেশের জাতীয় মাছ ইলিশের অন্যতম প্রধান প্রজনন ও জাটকার বিচরণস্থল এবং সরকার ঘোষিত ও চিহ্নিত পাঁচটি ইলিশ অভয়াশ্রমের চারটিই এ অঞ্চলে অবস্থিত হলেও জেলেদের আর্থসামাজিক নিম্নমান ও সহায়ক কর্মসূচির অপ্রতুলতা ইলিশসহ অন্যান্য মৎস্যসম্পদের স্থায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনায় বড় অন্তরায়। এজন্য জেলেদেরকে সম্পৃক্ত করে দলগত বা সমাজভিত্তিক আধুনিক প্রযুক্তিনিবিড় মৎস্যচাষ, দায়িত্বশীল আহরণ, সংরক্ষণ, পরিবহন, বিপণন ও সম্প্রসারণমূলক পর্যাপ্ত সহায়ক কর্মসূচি ও প্রকল্প গ্রহণ প্রয়োজন। এসবই সার্বিক জাতীয় উন্নয়নে চেইন অবদান (chain contribution) রাখবে।

ছবি: কীর্তনখোলা নদীতে ভাসমান খাঁচায় মাছ চাষ

উপকূলীয় জেলেদের পুনর্বাসনে চলমান সরকারি প্রকল্প ও কর্মসূচি (On-going government projects and programmes for the coastal fishers' rehabilitation)

উপকূলীয় জেলেদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সরকারের বেশ কিছু প্রকল্প ও কর্মসূচি চালু রয়েছে। জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও গবেষণা প্রকল্প এগুলোর অন্যতম। এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিবছর নভেম্বর- মে পর্যন্ত জাটকা আহরণনির্ভর জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। গত ২০১১-১২ অর্থবছরে ১,৮৬,২৬৪ জন জেলেকে ফেব্রুয়ারি-মে পর্যন্ত প্রতিমাসে ৩০ কেজি করে মোট ২২,৩৫২ মে.টন ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা (চাউল) দেয়া হয়। এছাড়া ভোলা, পটুয়াখালী, চাঁদপুর ও লক্ষ্মীপুর জেলায় আরও ৭,৭৮৫ জন জেলেকে ক্ষুদ্র ব্যবসায় পরিচালনার জন্য মোট ৫.৮ কোটি টাকার উপকরণ সরবরাহ করা হয়।

উপকূলীয় জেলেদের পুনর্বাসনে বৃহত্তর প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা (Need for undertaking mega projects for coastal fishers')

ইলিশসহ উপকূলীয় প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজাতির নিরাপদ প্রজনন ও জাটকা সংরক্ষণের জন্য জেলেদেরকে সম্পৃক্ত করে আরও বড় আকারের বিনিয়োগ ও উৎপাদনমুখী প্রকল্প নেয়া প্রয়োজন। জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানকল্পে এসব উপকূলীয় খাল-নদী-মোহনায় ভাসমান খাঁচা ও পেনে মাছ চাষ প্রযুক্তি ও উপকরণ দিয়ে আপদকালীন জীবিকায়নে মাছ চাষে নিয়োজিত করা যেতে পারে। সরকার নিজস্ব অর্থায়নে বা দেশি-বিদেশি দাতা সংস্থার সহায়তা নিয়ে এটি করতে পারে। মৎস্য অধিদপ্তর প্রযুক্তিগত সহযোগিতা ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করতে পারে।

উপসংহার (Conclusion)

জাতীয় উন্নয়নে উপকূলীয় মৎস্যসম্পদের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং দেশের বহুমুখী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কার্যকারণ প্রভাবে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের বিস্তৃতি ও উৎপাদন ক্রমশ কমছে। সে তুলনায় দেশের উপকূলীয় উন্মুক্ত জলাশয়সমূহ এখনও অপেক্ষাকৃত ভাল ও উৎপাদনশীল অবস্থায় রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাতে এ অঞ্চলের জলাশয়ের পরিমাণ বরং বাড়বে। সুতরাং এখন হতেই এ সম্পদ ও সুযোগের সদ্ব্যবহার ও যথাযথ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হবে। এখানে বিদ্যমান প্রাকৃতিক মৎস্যসম্পদের মজুদ নিরূপণের পাশাপাশি স্থায়িত্বশীল উৎপাদন ও আহরণ ব্যবস্থাপনা জরুরি। আবার মৎস্যসম্পদের টেকসই উন্নয়নের জন্য বাড়তি আহরণ চাপ নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। এজন্য জেলে সম্প্রদায়ের পরিকল্পিত পরিবার গঠন, শিক্ষা, বিকল্প কর্মসংস্থান, পুনর্বাসন ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন বিকল্পহীন। সরকার, দেশবাসী ও আন্তর্জাতিক মহল সবাইকেই এবিষয়ে উদ্যোগ নিতে হবে। সমাজের পিছিয়ে-পড়া নাগরিকদেরকেও সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও বেকারত্ব দূর করে সবার জীবনমান উন্নয়নই সুষম টেকসই জাতীয় উন্নয়ন।

উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ (aminngn@yahoo.com)

মৎস্যসম্পদের সহনশীল উন্নয়নে প্রকৃত জেলেদের ডেটাবেইজ প্রণয়ন

Database of Genuine Fishermen for Sustainable Development of Fisheries Resources

মোঃ আরিফুর রহমান তরফদার[১], মোঃ কামরুল হাসান[২], মোঃ মাগফুর রহমান[৩]

Abstract

Fishermen play a vital role in collecting fishes from natural water bodies even in the hostile weather condition. But there is no inventory of the genuine fishermen in the country. Some time development programmes suffer to make the plan for the livelihoods of the genuine fishers. Even, some time non-fishers take the benefit in the name of fishermen due to lack of the recognition of genuine fishers. Therefore, it is very important to identify the genuine fishermen for the nation to improve the quality of livelihoods of fishers, protect the right and interest of the fishers properly and create the employment opportunities in the fisheries sector and management of the fisheries resources in a sustainable manner. This is the national mandate to well built the economic and social status of fishermen through inventory and registration of the genuine fishers. Realizing this, the present government has adopted a project for issuing Identity cards (ID) among genuine fishermen for the first time in the country with a view to identify the genuine fishermen for registration and providing Identity Card (ID), developing the database of genuine fishermen for the better management and sustainable development of the fisheries resources and to provide financial support (as grant) to the family of deceased fishermen by natural disaster like storm, cyclone and tidal surge.

১৯৭২ সালে কুমিল্লার এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন যে মাছ হবে 'বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী সম্পদ'। এবং তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জেলেদের পরিচয়পত্রকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রকৃত জেলেদের শনাক্তকরণ ও নিবন্ধনকরণ, প্রকৃত জেলেদের পরিচয়পত্র প্রদান, নিবন্ধনকৃত জেলেদের ডেটাবেইজ প্রণয়ন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে নিহত জেলেদের পরিবারের পুনর্বাসনের নিমিত্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান করাই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য। দেশের প্রায় ১.২৫ কোটি লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মৎস্য উপ-খাতের উপর নির্ভর করে থাকে। জেলে সম্প্রদায় সরাসরি মৎস্য আহরণ করার মাধ্যমে এই উপ-খাতের প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে। জেলেদের কোন নিবন্ধিত তালিকা না থাকায় এবং স্বীকৃতি না থাকায় তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন কার্যক্রম প্রায়শই ব্যাহত হচ্ছে। জেলেদের নাম ব্যবহার করে অমৎস্যজীবীগণ বিভিন্ন প্রকার সুযোগ সুবিধাদি ভোগ করে থাকে ফলে প্রকৃত জেলেগণ তাঁদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়। অনেক সময়ই দুর্ঘটনা, বিভিন্ন ঝুঁকি, এমনকি মৃত্যুতেও ন্যূনতম সুবিধা পায় না। জেলেদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, মৎস্য উপখাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মৎস্য সম্পদের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে মোট ৮৪.৫১৮৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান প্রকল্পটি মৎস্যবান্ধব সদাশয় সরকার কর্তৃক গৃহীত হয় এবং জানুয়ারি ২০১২ হতে জুন ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

জেলেদের ডেটাবেইজ প্রণয়ন
(Formation of fishermen database)

বাংলাদেশের জেলেদের ইতোপূর্বে সরকারি উদ্যোগে কোনো আর্থসামাজিক জরিপ কার্য সম্পাদন করা হয়নি বা জেলেদের কোনো তথ্যভাণ্ডার তৈরি করা হয়নি। ফলে এ সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নের জন্য কার্যকর কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। সরকারের ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র সঠিক কোনো তথ্য বা তালিকা না থাকার কারণে প্রকৃত জেলেদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রণীতব্য জেলেদের ডেটাবেইজ-এ জেলে সম্প্রদায়ের সাধারণ তথ্যসহ মৎস্য আহরণ বিষয়ক যাবতীয় তথ্যাদি সন্নিবেশিত থাকবে। যার মাধ্যমে ভবিষ্যতে জেলে সম্প্রদায়ের জীবন-জীবিকার উন্নয়নে কার্যকর উন্নয়ন প্রকল্প বা কর্মসূচি গ্রহণ করা সহজতর হবে।

জেলেদের ডেটাবেইজ প্রণয়নের কাজ জাতীয় পরিচয়পত্রের সাথে সমন্বয় রেখে করা হচ্ছে এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রকৃত জেলেদের তালিকা প্রণয়ন করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে কোনো কারণে যদি প্রকৃত জেলের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না হয় তাহলে বিষয়টি কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত হওয়ার সাথে সাথে সরেজমিনে যাচাই-বাছাইপূর্বক তাঁর/তাঁদের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

চিত্র: জেলেদের তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম

মৎস্য অধিদপ্তরে সংরক্ষিত জেলেদের ডেটাবেইজ থেকে প্রকৃত জেলেদের সংখ্যা, তাঁদের পরিবার এবং সদস্যসংখ্যা সম্পর্কে জানা যাবে। অবগত হওয়া যাবে তাঁদের আর্থসামাজিক অবস্থা ও মাছ ধরার আহরণকাল; নদী, প্লাবনভূমি, বিল, হাওর-বাঁওড়, সমুদ্র উপকূল, সমুদ্র, খাল এবং পুকুরে মাছ ধরে এমন জেলের সংখ্যা ও আহরিত মাছের প্রজাতি সম্পর্কিত তথ্যাদি। জানা যাবে ইলিশ ধরে এমন জেলের সংখ্যা; তেমনি কার্প, আইড়, পাঙ্গাস, চিংড়ি, কাঁকড়া ও অন্যান্য মাছ ধরে এমন জেলের সংখ্যা। বাংলাদেশের জেলেরা কী ধরনের জাল, নৌকা ও মাছ ধরার সরঞ্জামাদি ব্যবহার করে থাকে তার প্রকৃত চিত্র ফুটে উঠবে। এ তথ্যভাণ্ডার থেকে আরও জানা যাবে দেশে কত ধরনের যান্ত্রিক, অযান্ত্রিক ও ফিসিং ট্রলার ব্যবহৃত হয়; মালিকানার ক্ষেত্রে জেলে ও অজেলের সংখ্যা; রেজিস্ট্রেশনভুক্ত মাছ ধরার নৌযানের সংখ্যা; মৎস্য বাজারের ধরন ও সংখ্যা; জেলেদের বাৎসরিক সঞ্চয় বা ঋণ তথ্যাদি। দেশের বিভিন্ন আঞ্চলের জেলেদের বিস্তৃতি যেমন- হাওর অঞ্চলের জেলেদের জীবন বৈচিত্র্য; সেখানে বছরের কত মাস পানি থাকে; কী ধরনের মাছ পাওয়া যায়; উত্তরবঙ্গে জেলেদের জীবন বৈচিত্র্যইবা কী ধরনের; পার্বত্য এলাকায় বসবাসকারী জেলেরা বছরের কত মাস মাছ ধরে; কোন কোন প্রজাতির মাছ ধরে; বছরের কোন সময় কোন প্রজাতির মাছ বেশি পাওয়া যায়; মাছ ধরা ছাড়া অন্য কোনো পেশায় জীবিকা নির্বাহ করেন কিনা; তাঁদের বাৎসরিক আয় ও ব্যয় ইত্যাদি। এ জেলে সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ও শিক্ষার হার সম্পর্কেও জানা সম্ভব হবে।

মৎস্যসম্পদের ভাণ্ডার বঙ্গোপসাগর বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত। এ মৎস্যভাণ্ডারে প্রতিদিন কত সংখ্যক ট্রলার বা ফিসিং বোট মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত থাকে তা নির্ণয় করা সম্ভব হবে। এছাড়া বাংলাদেশের অঞ্চলভেদে জেলেদের সামাজিক অবস্থা, মাছ ধরার উপকরণ ব্যবহার ও মাছের প্রাচুর্য্য সম্পর্কে অবগত হওয়া যাবে। সার্বিকভাবে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি; এ খাতে কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে মানুষের পুষ্টির যোগান বৃদ্ধি; পুঁজি ও বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি এবং সামগ্রিকভাবে দারিদ্র্যতা হ্রাসের অঙ্গীকার নিয়ে জেলেদের পরিচয়পত্র প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের জেলেদের ওপর ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার সকল উপজেলার জেলেদের নাম তালিকাভুক্ত করে পরিচয়পত্র প্রদান করা হবে। এ প্রকল্পে প্রাকৃতিক দুর্যোগে কোনো জেলে মারা গেলে তার পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য এককালীন ত্রিশ হাজার টাকা অনুদান প্রদানের সংস্থান রয়েছে।

মৎস্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.fisheries.gov.bd)-এর সাথে প্রণীতব্য এ জেলেদের ডাটাবেইজ সংযুক্ত (link) থাকবে এবং দেশ-বিদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে ওয়েবসাইটে ব্রাউজিং করে এ তালিকা অবলোকন করা যাবে। এ তথ্যভাণ্ডার থেকে জেলেদের নিয়ে কাজ করা সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তথ্য গ্রহণ করতে পারবে। প্রতি বছর জেলেদের তালিকা হালনাগাদ করা হবে। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় উল্লিখিত তথ্যাদি অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। এছাড়াও প্রকৃত জেলেদের জলমহাল ব্যবস্থাপনায় অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ সরকারি প্রণোদনা ও সহায়তা প্রদান সহজতর হবে। তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগে (ঝড়, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি) জীবননাশ ঘটলে জেলে পরিবারকে এ প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক অনুদান প্রদান করা যাবে।

চিত্র: জেলেদের ছবি তোলা কার্যক্রম

চিত্র: আই ডি কার্ডের নমুনা

[১]প্রকল্প পরিচালক, জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ (pdidcard@fisheries.gov.bd)
[২]সহকারী পরিচালক, জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
[৩]উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ), মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

বাংলাদেশের গলদা হ্যাচারি : সমস্যা ও করণীয়

Prawn Hatchery in Bangladesh : Issues and Wayout

ড. মোঃ লোকমান আলী

Abstract

Giant freshwater prawn hatchery first introduced in Bangladesh during early 80's and currently about 70 prawn hatcheries are operating all over the country. Currently most of these hatcheries are not functioning due to multi-faced problems. Around 50% prawn hatcheries are closed due to various reasons i.e. diseases, high market price of Artemia, unavailability of brood, impure chemical and lack of efficient technical manpower. In 2012 and upto April 2013, most of the prawn hatcheries are seriously affected by various disease results in huge loss of capital of the hatchery owners. To overcome these problems, initiatives including ensure bio-security, identification of pathogen, development of treatment protocol, use of probiotics and herbal medicine, ensure pure chemicals, development of brood bank and skilled technical manpower are facilited. Artificial culture of Rotifer and Moina could be used as a substitute of Artemia due to its high price. A massive study should be conducted pertaining source of pathogen, severe larval mortality, disease identification, antibiotic sensitivity test and dose optimization of drug.

বাংলাদেশের স্বাদুপানির ২৪ প্রজাতির চিংড়ির মধ্যে গলদা চিংড়ি সর্ববৃহৎ যার ইংরেজি নাম Giant freshwater prawn এবং বৈজ্ঞানিক নাম *Macrobrachium rosenbergeii*। গলদা চিংড়ি স্বাদুপানির চিংড়ি হলেও এর পোনা উৎপাদনের জন্য আধা-লবণাক্ত পানির প্রয়োজন। প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রজনন মৌসুমে প্রজননক্ষম গলদা চিংড়ি উপকূলীয় একলাকায় আধা-লবণাক্ত পানিতে চলে যায় এবং প্রজননের ২৫-৩০ দিন পর গলদার লার্ভি পোস্ট লার্ভিতে (PL) রূপান্তরিত হলে পুনরায় স্বাদুপানিতে ফিরে আসে। বাংলাদেশে আশির দশকে কক্সবাজারে কাশেম মাস্টার নামে একজন আগ্রহী চাষি প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে গলদার পোনা উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করেন। কিন্তু বাণিজ্যিকভাবে তিনি সফলতা লাভ করতে পারেননি। ১৯৮৫ সালে মৎস্য অধিদপ্তর ১ম মৎস্য চাষ উন্নয়ন প্রকল্প (ADB) এর আওতায় কক্সবাজারে গলদা হ্যাচারি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। চিংড়ি চাষ প্রকল্প (IDA) ১৯৮৮ সালে সাতক্ষীরা জেলায় কালীগঞ্জে অত্যন্ত সাধারণভাবে গলদা হ্যাচারি স্থাপন করে প্রথম বাণিজ্যিকভাবে পিএল (PL) উৎপাদনে সফলতা লাভ করে। ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট নদী কেন্দ্র, চাঁদপুরে গলদা চিংড়ির গৃহাঙ্গন হ্যাচারি নির্মাণের মাধ্যমে গলদার পিএল উৎপাদন করে। এরই ধারাবাহিকতায় ব্র্যাক ও মৎস্য অধিদপ্তর বেশ কয়েকটি মধ্যম আকারের গলদা হ্যাচারি স্থাপন করে। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংক-এর আর্থিক সহযোগিতায় (EEF ফান্ড) এবং ডানিডা (DANIDA)-এর কারিগরি সহযোগিতায় অনেকগুলো আধুনিক গলদা হ্যাচারি স্থাপিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৭০টি গলদা হ্যাচারি রয়েছে।

গলদা হ্যাচারিতে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ

(Present problems in prawn hatchery)

১. রোগবালাই (Diseases): বর্তমানে গলদা হ্যাচারির সবচেয়ে বড় সমস্যা রোগবালাই। ২০১০ সাল পর্যন্ত তেমন কোনো মারাত্মক রোগজীবাণুর আক্রমণ ছিল না। ২০১১ ও ২০১৩ (মে মাস পর্যন্ত) সালে বিভিন্ন Protozoan parasites এবং ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ তীব্র আকার ধারণ করে। ২০১২ ও ২০১৩ সালের মে মাস পর্যন্ত অনেক হ্যাচারিতে কোনো পিএল উৎপাদন হয়নি। যে কয়েকটি হ্যাচারি পিএল উৎপাদন করেছে তাদের উৎপাদনও খুব বেশি ভাল হয়নি। রোগাক্রান্ত হ্যাচারি থেকে স্যাম্পল নিয়ে গবেষণা করে ব্যাকটেরিয়া ও বিভিন্ন প্রোটোজোয়ান পরজীবী যেমন- Veginicola, Epistylis, Zoothamnium, Vorticella, Acineta, Temno cephalid ইত্যাদি পাওয়া গেছে। অভিজ্ঞতা থাকলে হ্যাচারিতে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে প্রতিটি পরজীবী ভিন্ন ভিন্নভাবে শনাক্ত করা সম্ভব। তবে প্যারাসাইট-এর তুলনায় ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ অত্যন্ত ভয়াবহ।

লার্ভির বয়স ১০ থেকে ২০ দিনের মধ্যে ব্যাকটেরিয়া লার্ভিকে আক্রমণ করে। আক্রমণের পর আক্রান্ত লার্ভি খাবার বন্ধ করে দুর্বল হয়ে পড়ে, রং সাদা হয় এবং ধীরে ধীরে এসব লার্ভি মারা যায়। দীর্ঘদিন ধরে হ্যাচারিসমূহে অনিয়ন্ত্রিতভাবে বিভিন্ন কেমিক্যাল এবং এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করার ফলে বিভিন্ন প্রজাতির ব্যাকটেরিয়াসমূহ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করেছে। যার ফলে বর্তমান সাধারণ ট্রিটমেন্ট-এর মাধ্যমে কোনো রোগ ভাল হচ্ছে না। এছাড়াও অতিরিক্ত এন্টিবায়োটিক ট্রিটমেন্ট-এর ফলে লার্ভির বৃদ্ধি কমে যায় এবং পিএল-এ রূপান্তরিত হতে অনেক সময় লাগে। সাধারণত হ্যাচারিতে লার্ভি হতে পিএল রূপান্তর শুরু হয় ১৮ দিনের পর থেকে এবং সকল লার্ভি পিএল-এ রূপান্তরিত হতে প্রায় ৩৫ দিন সময়ের প্রয়োজন। বর্তমানে হ্যাচারিতে লার্ভি থেকে পিএল রূপান্তরের হার অনেক কম এবং অনেক ক্ষেত্র ৪০ দিনেও লার্ভি পিএল-এ রূপান্তর হচ্ছে না। লার্ভি দুর্বল হলে সহজে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং সুস্থ লার্ভি রোগাক্রান্ত লার্ভিকে খায়। ফলে সুস্থ লার্ভি সহজেই রোগাক্রান্ত হয়।

২. পিএল-এর বাজারমূল্য (Market price of PL): ২০১০ সাল পর্যন্ত সময়কে গলদা হ্যাচারির স্বর্ণযুগ বলা হয়। সে সময় তেমন কোনো রোগবালাই ছিল না। পিএল উৎপাদন বেশি হতো। আর্টিমিয়া, কেমিক্যাল ও অন্যান্য উপাদনের দাম কম ছিল। অপরপক্ষে প্রতিটি পিএল-এর মূল্য ছিল ৩-৪ টাকা। গলদা হ্যাচারি শিল্পে দুর্যোগ নেমে আসে ২০০৯ সালে। চিংড়িতে নাইট্রোফিউরান-এর উপস্থিতির জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নে (EU) চিংড়ি রপ্তানি বন্ধ হওয়ার কারণে গলদা পিএল-এর চাহিদা মারাত্মকভাবে কমে যায়। প্রতিটি পিএল-এর দাম কমে মাত্র ৩০-৪০ পয়সা হয় অথচ প্রতিটি পিএল-এর উৎপাদন খরচ ছিল প্রায় ৯০ পয়সা। এরপরও বেশির ভাগ হ্যাচারি মালিকগণ তাঁদের হ্যাচারিতে উৎপাদিত পিএল সময়মত বিক্রয় করতে পারেননি। এদিকে চিংড়ির লার্ভি পিএল-এ রূপান্তরিত হওয়ার পর দৈনিক ১০ শতাংশ পিএল কমে যায়। ফলে বেশির ভাগ হ্যাচারি তাদের পুঁজি হারিয়ে ফেলে। এরপর ২০১০-১৩ সাল পর্যন্ত পিএল মূল্য ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। কিন্তু আর্টিমিয়াসহ অন্যান্য দ্রব্য মূল্যের তুলনায় পিএল-এর মূল্য কম। এছাড়াও পিএল ব্যবসার সাথে জড়িত মধ্যস্বত্বভোগীদের শক্তিশালী সিন্ডিকেট রয়েছে যারা পিএল-এর বাজার মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে। এজন্য পিএল-এর বাজার মূল্য সঠিক রাখা খুবই জরুরি।

৩. আর্টিমিয়া ও কেমিক্যাল এর বাজারমূল্য (Market price of Artemia and chemicals): হ্যাচারিতে ব্যবহৃত দ্রব্যাদির মধ্যে সবচেয়ে ব্যায়বহুল আর্টিমিয়া। বাংলাদেশে হ্যাচারিসমূহে ৫-৬টি ব্র্যান্ডের আর্টিমিয়া ব্যবহৃত হয় যার সবগুলো বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। ২০১১ ও ২০১২ সালে প্রতি কার্টুন আর্টিমিয়া (১০ ক্যান) এর বাজার মূল্য যথাক্রমে ২২-২৩ হাজার টাকা ও ৪৫-৪৮ হাজার টাকা ছিল। ২০১৩ সালে আর্টিমিয়ার বাজার মূল্য বেড়ে ৫৫-৬০ হাজার টাকা দাঁড়ায়। ২ বছরের ব্যবধানে আর্টিমিয়ার বাজার মূল্য প্রায় ৩ গুন হওয়ায় হ্যাচারি মালিকদের অতিরিক্ত অনেক টাকা খরচ করতে হচ্ছে আর্টিমিয়ার জন্য। একটি মাঝারি আকারের গলদা হ্যাচারিতে প্রায় ৩০ কার্টুন আর্টিমিয়ার প্রয়োজন; যার বর্তমান বাজার মূল্য ১৮ লক্ষ টাকা। আর্টিমিয়া ছাড়াও হ্যাচারিতে ব্যবহৃত কেমিক্যাল ও অন্যান্য দ্রব্যাদির বাজার মূল্য প্রতি বছর বৃদ্ধি পাওয়ায় হ্যাচারিতে পিএল উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পচ্ছে। উৎপাদন খরচের তুলনায় বিক্রয়মূল্য বৃদ্ধি না পাওয়ায় হ্যাচারি মালিকগণ হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন।

৪. ব্রুড প্রাপ্তি (Availability of brood): গলদা চিংড়ির ব্রুডের উৎস দুইটি যথা- প্রাকৃতিক উৎস ও ঘের। প্রাকৃতিক উৎসের মধ্যে পায়রা, বিষখালী, কচা নদী ও সুন্দরবনের বিভিন্ন খাল উল্লেখযোগ্য। এসব নদী থেকে ব্যাপক হারে ব্রুড চিংড়ি সংগ্রহ করা হয়। ফলে প্রতি বছর ব্রুড চিংড়ির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। এছাড়া প্রাকৃতিক উৎস থেকে এভাবে নির্বিচারে ব্রুড সংগ্রহ জীববৈচিত্র্যের জন্য অনেক হুমকিস্বরূপ। অন্যদিকে ঘেরে প্রয়োজনীয় পুষ্টিসমৃদ্ধ সঠিক পরিমাণ খাবার প্রদান না করায়

চিত্র: নদী হতে আহরিত গলদা চিংড়ির ব্রুড

ঘেরের ব্রুডের আকৃতি ছোট থাকে এবং উপযুক্ত পুষ্টির অভাবে ভ্রূণের বৃদ্ধি সঠিকভাবে হয় না। গবেষণায় দেখা গেছে, ৮০ গ্রামের চেয়ে ছোট আকৃতির ব্রুড থেকে উৎপাদিত পিএল-এর মান ভাল হয় না। ছোট আকারের চিংড়ি হতে লার্ভি পিএল-এ রূপান্তরিত হতে বেশি সময় লাগে। অনেক সময় হ্যাচারিতে বিভিন্ন আকারের চিংড়ির ব্রুড থেকে লার্ভি সংগ্রহ করে প্রতিপালন ট্যাংক (rearing tank)-এ মজুদ করা হয়। ফলে লার্ভির আকারে ভিন্নতা (size variation) দেখা যায় এবং বড় লার্ভি ছোট লার্ভি কে খেয়ে ফেলে। এছাড়াও বড় লার্ভি পিএল এ রূপান্তরিত হলে পিএল ছোট লার্ভি-কে খায়। ফলে হ্যাচারিতে পিএল উৎপাদন কমে যায়। হ্যাচারিতে পিএল-এর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রতিপালন ট্যাংকে একই আকারের ব্রুডের লার্ভি মজুদ করতে হবে। এজন্য ব্রুড গ্রেডিং করে আকার অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হ্যাচিং ট্যাংকে মজুদ করতে হবে।

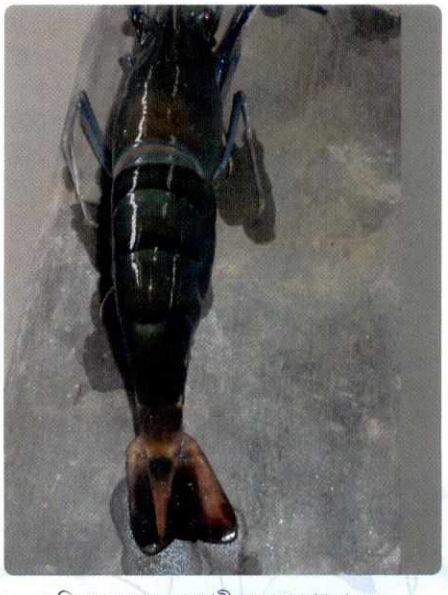

চিত্র: ঘের হতে সংগৃহীত অসুস্থ গলদা ব্রুড

৫. ভেজালযুক্ত কেমিক্যাল (Impure chemicals): গলদা হ্যাচারি বিপর্যয়ের আরেকটি অন্যতম কারণ ভেজালযুক্ত কেমিক্যাল। বর্তমানে এক শ্রেণির অসাধু ব্যাবসায়ী বিশ্বের নামী-দামী ব্রান্ডের কেমিক্যাল নকল করছে। যেমন- মার্ক জার্মানির লেবেল হুবহু নকল করে ভেজালযুক্ত নিম্নমানের ফরমালিন কিংবা সোডিয়াম থায়োসলেফেট বিক্রয় করা হয়। এসব কেমিক্যালের লেবেলিং দেখে কোনোভাবেই বোঝার উপায় নেই যে কোনটি আসল আর কোনটি নকল। এসব ভেজালযুক্ত কেমিক্যালের উপকারের তুলনায় ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি। রোগাক্রান্ত লার্ভিকে ভেজালযুক্ত কেমিক্যাল দ্বারা চিকিৎসা করার ফলে রোগমুক্তির পরিবর্তে নকল উপাদান স্ট্রেস ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে লার্ভির মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে।

৬. উপযুক্ত জনবল (Efficient manpower): বর্তমানে বাংলাদেশের বেশিরভাগ গলদা হ্যাচারি টেকনিশিয়ানদের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং এসব টেকনিশিয়ানরা সাধারণত এসএসসি কিংবা এইচএসসি পাশ। হ্যাচারিতে রোগ সংক্রান্ত কোনো জটিল সমস্যা সৃষ্টি হলে সমস্যা চিহ্নিত করে উপযুক্ত চিকিৎসা প্রদান সাধারণ টেকনিশিয়ানদের পক্ষে সম্ভব নয়। চিংড়ির লার্ভি রোগাক্রান্ত হলে তারা রোগ চিহ্নিত না করেই গতানুগতিক চিকিৎসা প্রদান করে থাকে ফলে লার্ভির রোগ ভাল হয় না। বর্তমানে মাৎস্যবিজ্ঞানে ডিগ্রিধারী অনেক গ্রাজুয়েট আছে। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, গলদা হ্যাচারিতে কাজ করে এমন ফিসারিজ গ্রাজুয়েট-এর সংখ্যা খুবই নগন্য। গলদা হ্যাচারিতে বর্তমান ক্রান্তিকালে এই সেক্টরকে বাঁচাতে ফিসারিজ গ্র্যাজুয়েটদের এগিয়ে আসতে হবে।

গলদা হ্যাচারির সমস্যা সমাধানে করণীয়

Measures to overcome the problems of prawn hatchery

১. জৈবনিরাপত্তা (Bio security): হ্যাচারি পরিচালনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জৈবনিরাপত্তা নিশ্চিত করা। Prevention is better than cure- বাক্যটি সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য চিংড়ি হ্যাচারির ক্ষেত্রে। গলদা চিংড়ি হ্যাচারিতে রোগজীবাণু প্রবেশের ফলে লার্ভি রোগাক্রান্ত হলে রোগ নির্মূল দুরূহ হয়ে পড়ে। চিকিৎসার মাধ্যমে রোগ নির্মূল হলেও ঔষধের বিভিন্ন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া যেমন লার্ভির বৃদ্ধি কমে যাওয়া, লার্ভি কম খাওয়া, মোল্টিং এর হার কমে যাওয়া, পিএল হতে বেশি সময় লাগা ইত্যাদি কারণে পিএল উৎপদন কম হয়। এজন্য জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থা অনুসরণের মাধ্যমে হ্যাচারিতে রোগজীবাণু প্রবেশ বাধাগ্রস্ত করতে হবে। হ্যাচারিতে রোগজীবাণু প্রবেশের মাধ্যমগুলো হলো পানি, ব্রুড ও অনভিজ্ঞ কর্মী। গলদা হ্যাচারিতে পানি জীবাণুমুক্তকরণ এবং ফিল্ট্রেশন পদ্ধতি খুবই দুর্বল। পানি পরিশোধনের জন্য উন্নতমানের ফিল্টার এবং আল্ট্রা ভায়োলেট (uv) রশ্মি ব্যবহার করতে হবে। এছাড়াও ব্রুড এবং হ্যাচারি কর্মীদের মাধ্যমে যেন জীবাণু হ্যাচারিতে ঢুকতে না পারে সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

২. রোগবালাই (Diseases): রোগজীবাণুর আক্রমণ থেকে মুক্তির জন্য করণীয় বিষয়গুলো নিম্নরূপ:

ক. রোগজীবাণু শনাক্তকরণ (Identification of pathogens): কোনো রোগের চিকিৎসার পূর্বশর্ত রোগের কারণ শনাক্তকরণ। চিংড়ি হ্যাচারিতে আক্রমণকারী রোগ সাধারণত প্রোটোজোয়া, ফাঙ্গাস ও ব্যাকটেরিয়া। এসব রোগজীবাণুর প্রত্যেকের শনাক্তকরণ পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। ভালো অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা প্রোটোজোয়া ও ফাঙ্গাস সহজেই শনাক্ত করা যায়। ব্যাকটেরিয়ার প্রজাতি বা জেনাস শনাক্ত করা না গেলেও ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি সহজেই শনাক্ত করা যায়। ফাঙ্গাস আক্রান্ত লার্ভির গায়ে সুতার মত ফাঙ্গাল হাইফির উপস্থিতি দেখা যায়।

খ. চিকিৎসা (Therapy): প্রতিটি রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। হ্যাচারিতে কোনো ঔষধ ব্যবহার করার পূর্বে অবশ্যই সেন্সিটিভিটি টেস্ট ও ডোজ অপটিমাইজেশন করে নিতে হবে তা না করে কোনো ট্রিটমেন্ট দিলে সেই ট্রিটমেন্ট কার্যকর হয় না। বর্তমানে হ্যাচারিতে বেশির ভাগ টেকনিশিয়ানরা গতানুগতিক ট্রিটমেন্ট দিয়ে থাকে ফলে লার্ভি রোগমুক্ত হয় না। যেমন প্রোটোজোয়া আক্রান্ত লার্ভির রোগমুক্তির জন্য সাধারণত টেকনিশিয়ানরা ২০-৩০ পিপিএম হারে ফরমালিন ব্যবহার করে থাকে। অথচ সেন্সিটিভিটি টেস্ট-এর মাধ্যমে দেখা গেছে যে প্রোটোজোয়া মারার জন্য ২০০ পিপিএম ফরমালিন দরকার। ২০০ পিপিএম ফরমালিন ব্যবহারে ১০ মিনিটের মধ্যে সকল প্রোটোজোয়া মারা যায়। বর্তমানে হ্যাচারি বিপর্যয়ের জন্য দায়ী বিভিন্ন প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া। গবেষণার মাধ্যমে দেখা গেছে, হ্যাচারিতে প্রায় ২৫ ধরনের ব্যাকটেরিয়া এন্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তৈরি করেছে। এসব ব্যাকটেরিয়া গতানুগতিক ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে কোনো অবস্থাতেই নির্মূল করা যায় না। এজন্য অনুমোদিত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে হয়। মূলত প্রতিটি কেমিক্যালের এমন একটি ডোজ রয়েছে যাতে রোগজীবাণু মারা যায় কিন্তু লার্ভি মরে না। এই সুনির্দিষ্ট ডোজ-এর তুলনায় বেশি পরিমাণ ঔষধ প্রয়োগ করলে লার্ভি মারা যায় এবং ঐ ডোজ-এর তুলনায় কম পরিমাণ ঔষধ ব্যবহার করলে প্যাথোজেন মরবে না। বর্তমানে হ্যাচারিতে ব্যবহৃত সকল প্রকার ঔষধের ডোজ অপটিমাইজেশন করে টেকনিশিয়ানদের জ্ঞাত করাতে হবে।

গ. প্রোবায়োটিক্স-এর ব্যবহার (Use of probiotics): প্রোবায়োটিক্স হলো বিভিন্ন উপকারী ব্যাকটেরিয়া। প্রোবায়োটিক্স-এর ব্যবহারের ফলে বিভিন্ন উপকারী ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধি পায় এবং তারা এমন কিছু মেটাবলিক প্রোডাক্ট তৈরি করে যার ফলে অন্য ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া তৈরি হতে পারে না। প্রোবায়োটিক লার্ভি মজুদের দিন থেকে ব্যবহার করতে হবে। প্রোবায়োটিক ব্যবহার করলে অন্য কোনো ধরনের কেমিক্যাল যেমন- অ্যান্টিবায়োটিক, ফরমালিন, আয়োডিন, প্রোটোসাইট, পেরামেট ইত্যাদি

ব্যবহার করা যাবে না এবং ১৫-২০ দিন পর পানি পরিবর্তন করতে হবে। লার্ভি প্রতিপালন ট্যাংকে উৎপাদিত অ্যামোনিয়া, নাইট্রাইট ইত্যাদি দূরীভূত করার জন্য সাধারণ প্রোবায়োটিক্স-এর পাশাপাশি নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়াসমৃদ্ধ প্রোবায়োটিক্স ব্যবহার করতে হবে। এতে লার্ভি প্রতিপালন ট্যাংকে উৎপাদিত সকল ক্ষতিকারক পদার্থ দূরীভূত হবে। বর্তমানে বাজারে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের প্রোবায়োটিক্স পাওয়া যায়। প্রোবায়োটিক্সের ব্যবহারে গলদা হ্যাচারি শিল্পে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটাতে পারে। অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের অনেক ক্ষতিকর দিক রয়েছে। এজন্য অ্যান্টিবায়োটিকের পরিবর্তে প্রোবায়োটিক্স ব্যবহার করতে হবে। তবে গলদা হ্যাচারিতে প্রোবায়োটিক্স-এর ব্যবহারের উপর ব্যাপক গবেষণা করা প্রয়োজন।

৩. বিশুদ্ধ কেমিক্যাল (Pure chemical): সফলভাবে গলদা হ্যাচারি পরিচালনার জন্য বিশুদ্ধ কেমিক্যালের কোনো বিকল্প নেই। এছাড়াও হ্যাচারিতে ব্যবহৃত সকল প্রকার কেমিক্যাল ল্যাব গ্রেড হতে হবে। কোনো কমার্শিয়াল গ্রেড-এর কেমিক্যাল হ্যাচারিতে ব্যবহার করা সমীচীন নয়। হ্যাচারিতে নির্ভেজাল কেমিক্যাল সরবরাহের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরকে জোরালো ভূমিকা পালন করতে হবে। অনেক ঔষধ আমদানিকারক মেয়াদ উত্তীর্ণ কেমিক্যাল এনে নিজেরা লেভেল এঁটে বিক্রয় করে। এজন্য ঔষধ আমদানিকারক এবং সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের উপর নজরদারী যথাযথ ও কার্যকর করতে হবে। যদি কেউ কেমিক্যাল ভেজাল মিশায় কিংবা নকল ঔষধ বিক্রয় করে তাহলে তাকে আইনের আওতায় আনয়নপূর্বক যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়াও বিভিন্ন দোকান থেকে কেমিক্যাল সংগ্রহ করে গবেষণাগারে কেমিক্যাল এর বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। অসাধু ব্যবসায়ীর সামান্য মুনাফা ও অসচেতনতার অভাবে একজন হ্যাচারি মালিকের লক্ষ লক্ষ টাকার চিংড়ি পোনা নষ্ট হওয়া অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনভিপ্রেত।

৪. আর্টিমিয়ার বাজারমূল্য (Market price of Artemia): আর্টিমিয়া অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি হ্যাচারি মালিকদের 'মড়ার উপর খাড়ার ঘা'-এর মত অবস্থা সৃষ্টি করেছে। আর্টিমিয়ার বাজার স্থিতিশীল রাখতে কিংবা সঠিক মূল্যে হ্যাচারি মালিকদের আর্টিমিয়া সরবরাহ করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। এছাড়াও আর্টিমিয়ার বিকল্প হিসেবে Moina এবং Rotifer-এর ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন। যদি Moina এবং Rotifer চাষ করে আর্টিমিয়ার বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যায় তবে পিএল উৎপাদন খরচ অর্ধেকে নেমে আসবে।

৫. পিএল এর বাজার মূল্য (Market price of PL): পিএল ব্যবসার সাথে এক শ্রেণির মধ্যস্বত্বভোগী জড়িত যারা পিএল-এর বাজারমূল্য নিয়ন্ত্রণ করে। অনেক ক্ষেত্রে হ্যাচারি মালিকদের চেয়েও এরা বেশি মুনাফা করে। হ্যাচারি মালিকরা যেন পিএল এর সঠিক ও ন্যায্য মূল্য পায় এজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬. ব্রুড ব্যাংক তৈরি (Develpoment of brood bank): প্রতিটি হ্যাচারিতে নিজস্ব ব্রুড ব্যাংক তৈরি করতে হবে। এতে করে প্রাকৃতিক উৎস থেকে ব্রুড সংগ্রহ করে জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের প্রয়োজন হবে না কিংবা ঘের থেকে অপুষ্টিতে আক্রান্ত ছোট আকৃতির নিম্নমানের ব্রুড সংগ্রহ করতে হবে না। একটি হ্যাচারিতে সাধারণত ৩-৪ লক্ষ টাকার ব্রুডের প্রয়োজন। নিজস্ব ব্রুড ব্যাংক থাকলে একদিকে যেমন অর্থের সাশ্রয় হবে অন্যদিকে সঠিক সময়ে প্রয়োজন মাফিক ব্রুডের প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে।

৭. উপযুক্ত জনবল (Efficient manpower): হ্যাচারির বর্তমান সঙ্কট নিরসনের জন্য সকল হ্যাচারি টেকনিশিয়ানদের জৈবনিরাপত্তা, রোগ, চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। এছাড়াও হ্যাচারি টেকনিশিয়ানরা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ব্যবহারসহ রোগজীবাণু যেন চিহ্নিত করতে পারে তার প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন। প্রতিটি হ্যাচারিতে টেকনিশিয়ানদের সহযোগিতার জন্য মৎস্য বিশেষজ্ঞদের সংশ্লিষ্টতা থাকা জরুরি।

উপসংহার (Conclusion)

বর্তমানে গলদা হ্যাচারি সেক্টরে যে ভয়াবহ দুর্যোগের সৃষ্টি হয়েছে এখান থেকে বের হয়ে আসতে। ইতোমধ্যেই গলদা চিংড়ির হ্যাচারিতে পিএল মড়কের কারণ অনুসন্ধান ও প্রতিকারের সুপারিশ প্রণয়ন করার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। সুস্থ-সবল পর্যাপ্ত চিংড়ির পিএল ঘাটতির অবস্থা চলতে থাকলে গলদা চিংড়ি চাষ হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। তাই বাংলাদেশ হাজার হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন থেকে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। এজন্য সকল স্টেকহোল্ডারদের সমন্বিত প্রচেষ্টা ও কার্যকর উদ্যোগের মাধ্যমেই এ অনভিপ্রেত বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। এপ্রেক্ষিতে রপ্তানির বর্তমান ক্রমধারা অব্যাহত রাখার স্বার্থে সুস্থ-সবল রোগমুক্ত চিংড়ির পিএল উৎপাদনের মাধ্যমে গলদা চিংড়ির চাষকে স্থায়িত্বশীল করার কোনো বিকল্প নেই।

সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, অ্যাকোয়াকালচার বিভাগ, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী (lokman.fri@gmail.com)

ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন : বর্তমান প্রেক্ষাপট, বিদ্যমান সমস্যা ও করণীয়

Hilsa Fishery Development : Present Situation, Problems and Recommendations

ড. নির্মল চন্দ্র রায়[১] ও এ বি এম জাহিদ হাবিব[২]

Abstract

Hilsa is the national fish of Bangladesh that contributes to national economy, protein supply, employment generation and export earnings. It has the highest contribution in country's fish production amounting 1.0% to the GDP. At present the total production of Hilsa is 0.3465 million MT that's current market value is 138,600 million BDT. To ensure the yield of Hilsa in a sustainable manner, it is prerequisite to facilitate safe and unhindered breeding of Hilsa and also to conserve jatka. After ensuring the peak breeding period of Hilsa and detecting major nursery grounds of jatka, Government of Bangladesh framed rules and regulations to conserve and protect habitat of jatka in five sanctuaries and ensure successful breeding of Hilsa in the natural breeding ground during peak spawning period. Moreover, Hilsa research has been done by BFRI. During the banned period of jatka catch, Government provides AIG opportunities and VGF to the poor fishers. Necessary measures are being taken to continue the present success with necessary future action plan through co-ordinated effort to conserve Hilsa in Bangladesh.

ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ। অত্যন্ত সুস্বাদু ও জনপ্রিয় এ মাছ অনাদিকাল থেকেই আমাদের জাতীয় অর্থনীতি, কর্মসংস্থান ও আমিষ জাতীয় খাদ্য সরবরাহে অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনে ইলিশের অবদান সর্বোচ্চ (প্রায় ১১ শতাংশ) এবং জিডিপিতে অবদান ১ শতাংশ। সারা বিশ্বের মোট উৎপাদিত ইলিশের প্রায় ৬০ শতাংশ আহরিত হয় এদেশের নদ-নদী থেকে। গত ২০১০-১১ সালে দেশে ইলিশের মোট উৎপাদন ছিল ৩.৪০ লক্ষ মে.টন, ২০১১-১২ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩.৪৬৫ লক্ষ মে.টন, যার চলতি বাজার মূল্য প্রায় ১৩,৮৬০ কোটি টাকা (প্রতি কেজি গড়ে ৪০০ টাকা হিসেবে)। বর্তমান সরকারের মেয়াদে বিগত চার বছরে ইলিশ উৎপাদনের গড় প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ৪.৫৮ শতাংশ এবং বিগত ২০০৭-০৮ বছরের তুলনায় ২০১১-১২ বছরে ইলিশের রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ২.৩৩ গুণ।

চিত্র: নদী থেকে আহরিত ইলিশ

বাংলাদেশের অধিকাংশ উপকূলীয় এলাকা ও পদ্মা-মেঘনা অববাহিকার প্রায় পাঁচ লক্ষ মৎস্যজীবী প্রত্যক্ষভাবে ইলিশ আহরণ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এছাড়া পরিবহন, বিপণন, জাল-নৌকা তৈরি, বরফ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানি ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে প্রায় ২৫ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইলিশ মাছের ওপর নির্ভর করে তাদের জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। কাজেই এটি সহজেই অনুমেয় দরিদ্র মৎস্যজীবী ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ইলিশের ভূমিকা অপরিসীম।

ইলিশ উৎপাদনের গতিধারায় বিগত ২০০০-০১ সালের তুলনায় ২০০১-০২ ও ২০০২-০৩ সালে ইলিশ উৎপাদন হ্রাস পেয়ে নিম্নমুখী হতে দেখা যায়। তৎপ্রেক্ষিতে সরকার রাজস্ব বাজেটের অধীনে ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য আর্থিক খাত সৃষ্টি করে। পাশাপাশি বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এর গবেষণার ফলাফল এবং মৎস্য অধিদপ্তরের চতুর্থ মৎস্য প্রকল্পের অধীনে পরিচালিত সমীক্ষার ফলাফলের সমন্বয়ে ইলিশ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা (Hilsa Fisheries Management Action Plan- HFMAP) প্রণয়ন করা হয়। ইলিশের সহনশীল উৎপাদন বজায় রাখা ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উক্ত কর্মপরিকল্পনার কৌশলসমূহের মধ্যে নিম্নবর্ণিত কর্মকৌশলসমূহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে:

১. প্রজনন মৌসুমে প্রজননক্ষম ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধকরণ ও প্রাকৃতিক প্রজনন বৃদ্ধি;
২. প্রাকৃতিকভাবে ছোট ইলিশ প্রতিপালন করে বড় মাছ ধরা অর্থাৎ জাটকা আহরণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা;
৩. জাটকা সংরক্ষণ ও অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ;
৪. জেলেদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিকল্প কর্মসংস্থান ও খাদ্য সহায়তা প্রদান;
৫. গণসচেতনতা সৃষ্টি; এবং
৬. ইলিশ গবেষণা কার্যক্রম আব্যাহত রাখা।

উক্ত কর্মকৌশলসমূহকে প্রাধান্য দিয়ে 'জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান এবং গবেষণা প্রকল্প' এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিশেষ অপারেশন

কোডের (৬৬০৫) অর্থায়নে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বর্তমান প্রেক্ষাপট (Present situation)

দেশের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির ফলে অধিক সংখ্যক লোক ইলিশ আহরণ পেশায় নিয়োজিত হওয়া, জাল নৌকার সংখ্যা বৃদ্ধি ও যান্ত্রিকায়ন, অবৈধ কারেন্ট জালের ব্যাপকভিত্তিক ব্যবহার ইত্যাদি কারণে এ মাছের আহরণমাত্রা দ্রুতবৃদ্ধিসহ অবাধে জাটকা ধরার ফলে ২০০১-০২ সালে ইলিশের উৎপাদন নিম্নমুখী হতে দেখা যায়। এছাড়া বিভিন্ন নদ-নদীর পানি প্রবাহ হ্রাস, গতিপথ পরিবর্তন, পলি ভরাট ইত্যাদি কারণে প্রজনন ও বিচরণক্ষেত্র ধ্বংস এবং জলজ পরিবেশ দূষণের ফলে এ মাছের বিস্তৃতি ও উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে বলে বিশেষজ্ঞগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাই ইলিশ মাছের সহনশীল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাটকা সংরক্ষণ, প্রজননক্ষম ইলিশ রক্ষা করে অবাধ প্রজনন সুবিধা সৃষ্টি এবং এতদ্‌সংক্রান্ত কাজে জেলেদের নিবৃত্ত করার জন্য আপদকালীন সকল জেলে পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান ও অন্তত ৫০ শতাংশ জেলেকে বিকল্প কর্মসংস্থানের আওতাভুক্ত করা আবশ্যক। পাশাপাশি জেলেদের দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভাবের ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন একান্ত প্রয়োজন। যাতে তাদের মধ্যে এ উপলব্ধি আসে যে, জাটকা ও মা ইলিশ রক্ষার ফলে তারাই বেশি লাভবান হবেন।

বর্তমান জেলেবান্ধব সরকারের সদিচ্ছায় মৎস্য অধিদপ্তর ইলিশ সম্পদ উন্নয়নে ব্যাপকভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে এগিয়ে যাচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে সরকারের রাজস্ব বাজেটের অধীনে প্রধান দু'টি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর একটি হলো বিশেষ অপারেশন কোডের আওতায় জাটকা ও ইলিশ রক্ষায় আইন বাস্তবায়ন ও জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং অন্যটি হলো জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান এবং গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন, যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে-

- বাস্তবভিত্তিক ও সময়োপযোগী কর্মপন্থা কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে দ্রুতবর্ধনশীল জাটকা নিধন বন্ধ করে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি;
- টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের প্রাকৃতিক জলজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- অভয়াশ্রম এলাকায় সকল প্রকার মাছ রক্ষা করা এবং নদ-নদীর মাছের সার্বিক উৎপাদন বৃদ্ধি;
- জাটকা আহরণে বিরত জেলেদের আপদকালীন জীবিকা পরিচালনার জন্য খাদ্য সহায়তা প্রদান এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং
- ইলিশ উৎপাদন কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে বৃদ্ধির মাধ্যমে মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ।

জাটকা সংরক্ষণ ও বিদ্যমান সমস্যা (Jatka conservation and existing problems)

আজকের জাটকাই আগামী দিনের ইলিশ। 'Jatka is caught-Hilsa is lost' অর্থাৎ সহনশীল পরিমাণের চেয়ে বেশি পরিমাণে জাটকা ধরা হলে ইলিশ সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাবে। আমাদের দেশে প্রচলিতভাবে ৯ ইঞ্চি (২৩ সেমি) আকার পর্যন্ত ছোট ইলিশ 'জাটকা' নামে পরিচিত। বিশেষজ্ঞদের মতে, আমাদের দেশে যে পরিমাণ জাটকা উৎপাদিত হয় তার ১০ শতাংশ বড় হওয়ার সুযোগ পেলে ইলিশের উৎপাদন দ্বিগুণ হবে। বিগত ২০০৩-০৪ সাল হতে জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণের ফলে এর সুফল পাওয়া যাচ্ছে এবং ইলিশের উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ইলিশ সাগরের মাছ হলেও প্রজনন মৌসুমে ডিম ছাড়ার জন্য উপকূলীয় মোহনা ও নদীর উজানে চলে আসে এবং ডিম ছাড়ার পর আবার সাগরে ফিরে যায়। এসময় নদীর মোহনায় উৎপাদিত হয় ইলিশের লক্ষ লক্ষ রেণু, পোনা ও বাচ্চা ইলিশ, যা নদ-নদীতে বিচরণ করে জাটকায় রূপান্তরিত হয়। আমাদের দেশে নভেম্বর-মে মাস পর্যন্ত ইলিশ জাটকা (৯ ইঞ্চির নিচে) অবস্থায় থাকে। মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ (সংশোধিত ২০০৩) এর বিধান অনুযায়ী নভেম্বর হতে মে মাস পর্যন্ত জাটকা ধরা, ক্রয়-বিক্রয়, হেফাজতে রাখা এবং পরিবহন আইনত নিষিদ্ধ। অথচ প্রায়শই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে জাটকা ধরা হচ্ছে এবং হাট-বাজারে বিক্রয় করা হচ্ছে। বাংলাদেশের জেলে সম্প্রদায় ও মৎস্যজীবী নিম্ন আয়ভুক্ত শ্রেণির মানুষ। বিশেষত ইলিশ আহরণে নিয়োজিত জেলে সম্প্রদায়ের জীবন ও জীবিকা প্রধানত জাটকা আহরণের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাদের ধারণা তারা অনন্যোপায় হয়ে জাটকা ধরে। ঠিক তেমনিভাবে মৎস্য ব্যবসায়ী এবং ভোক্তাগণও মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে জাটকা বিক্রয় ও খাওয়া থেকে বিরত থাকেন না। কাজেই সমাজের সকল স্তরের মানুষকে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যক্তি ইচ্ছা থেকে ফিরিয়ে আনতে হতে। এছাড়াও নদ-নদী সংকোচন, ব্যাপকভাবে কারেন্ট জাল উৎপাদন ও ব্যবহার, নদীর গতিপথ পরিবর্তন, উজানে পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ, পানিদূষণ ও বর্জ্য নিষ্কাশন, কর্মসংস্থানের অভাব, জেলেদের দৈন্য, জাটকা আহরণকারী জেলেদের সরকারি অপর্যাপ্ত ভর্তুকি, জলাশয়ে পলি ভরাট, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে অতিরিক্ত চাহিদাজনিত অতিআহরণ, সামগ্রিক জনসচেতনতা ও দেশপ্রেমের অভাব, আইন প্রয়োগকারী ও তদারকি সংস্থার জনবল ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার অভাব, রাজনৈতিক প্রভাব, আইনের দুর্বলতা ও জটিলতা, বাজেট স্বল্পতা, দারিদ্র্য ও আয় সংকোচন, মহাজনী ফাঁদ ও মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং সমন্বয়হীনতা ইত্যাদি নানাবিধ কারণে জাটকা সংরক্ষণ পুরোপুরি সম্ভব হচ্ছে না।

জাটকা নিধন প্রতিরোধ কার্যক্রম ও জাটকা সংরক্ষণে বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ (Implementation of jatka protection conservation project activities to prevent exploitation of jatka)

ইলিশের সহনশীল উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে জাটকা রক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। বিষয়টি অনুধাবন করে বর্তমান সরকার চলমান জাটকা রক্ষা কর্মসূচি আরও ফলপ্রসূকরণে ইলিশ অভয়াশ্রম স্থাপন, জাটকা আহরণে বিরত জেলেদের ভিজিএফ

কর্মসূচির আওতায় আনয়ন, বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে উপকরণ বিতরণ, গণসচেতনতা ও উদ্বুদ্ধকরণ এবং আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ ও বাস্তবায়নসহ সমন্বিত কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনা করছে। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ হলো:

- সরকার ঘোষিত ইলিশ অভয়াশ্রমসমূহে নিষিদ্ধকালীন সময়ে মাছ ধরা কাঠোরভাবে প্রতিরোধ করা;
- অভয়াশ্রম স্থাপন ও অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ;
- জাটকা নিধন রোধ ও মা ইলিশ রক্ষায় ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি ও সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধকরণ;
- জাটকা নিধন রোধে স্থানীয় প্রশাসন, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ পুলিশ ও র‍্যাব এর সহযোগিতায় নভেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত মোট ৭ মাস নদ-নদী, মাছ ঘাট, হাট-বাজারে বিশেষ অভিযান ও ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা;
- প্রধান প্রজনন মৌসুমে ইলিশের নিরাপদ প্রজননের জন্য প্রতি বছর আশ্বিন মাসের প্রথম উদিত চাঁদের পূর্ণিমার দিনসহ আগের পাঁচ দিন ও পরের পাঁচ দিন (মোট ১১ দিন) উপকূলীয় এলাকাসহ সারাদেশব্যাপী ইলিশ আহরণ, পরিবহন, বাজারজাতকরণ, বিক্রয় ও মজুদ নিষিদ্ধ আইনের যথাযথ প্রয়োগ। বিগত ২ বছরে আইন প্রয়োগকারী সকল সংস্থা ও প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ২০১২ সালে মা ইলিশ রক্ষায় অভিযান পরিচালনা কার্যক্রম সকল মহলে প্রশংসিত হয়েছে। উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ১১ দিনে মোট ১,০২০টি মোবাইল কোর্ট ও ৪,৪০২টি অভিযান পরিচালিত হয়েছে। আইন অমান্যকারী মোট ৯০২ জন জেলেকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা প্রদানের পাশাপাশি ১২.২৩ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পূর্ববর্তী বছরসমূহের ক্রমধারায় ২০১২-১৩ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত) ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ১৬টি জেলার মোট ৮৮টি উপজেলায় ২,০৬,২২৯টি জাটকা জেলে পরিবারের মধ্যে ৩০ কেজি হারে চার মাসের জন্য মোট ২৪,৭৪৭.৪৮ মে.টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য জাটকা জেলেদের জন্য ভিজিএফ বরাদ্দ পূর্ববর্তী সরকারের সময়ের চেয়ে ১২.৬১ গুণ বেশি।
- জাটকা সংরক্ষণে জাটকা আহরণকারী জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের পূর্ববর্তী বছরসমূহে লক্ষ্যে পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় চলতি বছরে ১,৭০০ জন সুফলভোগীকে বিষয়ভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান শেষে ১.৩০৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে; এবং
- জাটকা সংরক্ষণ প্রকল্পের গবেষণা অংশে ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও গবেষণার নিমিত্ত একটি আধুনিক গবেষণা জাহাজ বিএফআরআই-এর মাধ্যমে অচিরেই ইলিশ গবেষণার কাজে সংযোজন হতে যাচ্ছে।

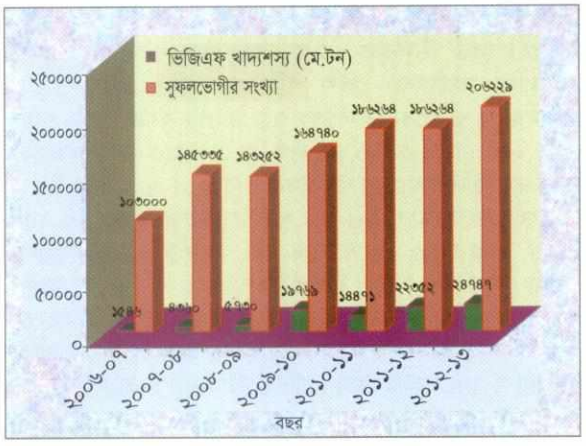

গ্রাফ: বিগত ৭ বছরে ভিজিএফ খাদ্যশস্য বিতরণ ও সুফলভোগীর সংখ্যা

জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন কৌশল
(Techniques of implementation of jatka and brood Hilsa conservation)

জাটকা রক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য জাতীয়, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও টাস্কফোর্সের আওতায় জেলা প্রশাসন, নৌবাহিনী, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, বাংলাদেশ পুলিশ, র‍্যাব, জন প্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সম্পৃক্ত আছেন। জাটকা রক্ষা কার্যক্রম কার্যকরভাবে সমন্বিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে অধিকাংশ জেলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে জাটকা আহরণ থেকে বিরত রয়েছে বলেই প্রতীয়মান হয়।

বিশ্বে বাংলাদেশ ছাড়া অন্য কোনো দেশে ইলিশ সম্পদ উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা নেই। বাংলাদেশ একমাত্র দেশ যেখানে ইলিশের সহনশীল উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা রয়েছে যা আন্তর্জাতিক মহলে প্রশংসিত। যুগোপযোগী এ ব্যবস্থাপনা পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত অনুসরণ করছে। যুক্তরাজ্য সরকার এর অর্থায়নে ইলিশ সম্পদের সহনশীল ব্যবস্থাপনায় বেশকিছু গবেষণা কার্যক্রম বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক শুরু হয়েছে। ইলিশ জেলেদের নিকট সরকার প্রদেয় সকল প্রকার প্রণোদনা ও সহায়তা সঠিকভাবে প্রকৃত জেলেদের নিকট পৌঁছানোর লক্ষ্যে অতি সম্প্রতি জেলেদের পরিচয়পত্র প্রদানের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইলিশ মাছের অভিপ্রয়াণ, প্রজনন, বিচরণক্ষেত্র ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা করা হচ্ছে। গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রয়োগ করে জাটকা নিধন রোধ সময়সূচি নির্ধারণ, ইলিশ অভয়াশ্রম স্থাপন এবং প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ সময়কাল যুগোপযোগী করা হচ্ছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও মৎস্যজীবী সংগঠন ইলিশ সম্পদ উন্নয়নে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

ইলিশের উৎপাদন (Hilsa production)

বঙ্গোপসাগরের উপকূল তথা বাংলাদেশ, ভারত এবং মায়ানমারে সর্বাপেক্ষা বেশি পরিমাণে ইলিশ ধরা পড়ে। মায়ানমার ও ভারতের ইলিশের গড় উৎপাদন যথাক্রমে প্রায় ১.০-১.২৫ এবং ০.৫০-০.৬০ লক্ষ মে.টন/বছর। সার্বিকভাবে সারা বিশ্বে ইলিশ মাছের উৎপাদন প্রায় ৫.০-৬.০ লক্ষ টন। এর মধ্যে বাংলাদেশে ৫০-৬০ শতাংশ, মায়ানমারে ২০-২৫ শতাংশ, ভারতে ১৫-২০ শতাংশ এবং অবশিষ্ট ৫-১০ শতাংশ অন্যান্য দেশে ধরা পড়ে। ইলিশ উৎপাদনের গতিধারায় দেখা যায়, ২০০৭-০৮ হতে ২০১১-১২ অর্থবছর পর্যন্ত ৫ বছরে ১.৯৪ লক্ষ মে.টন বর্ধিত ইলিশ উৎপাদিত হয়েছে, যার বাজার মূল্য প্রায় ৭,৭৬০ কোটি টাকা (প্রতি কেজি ৪০০ টাকা হিসেবে)।

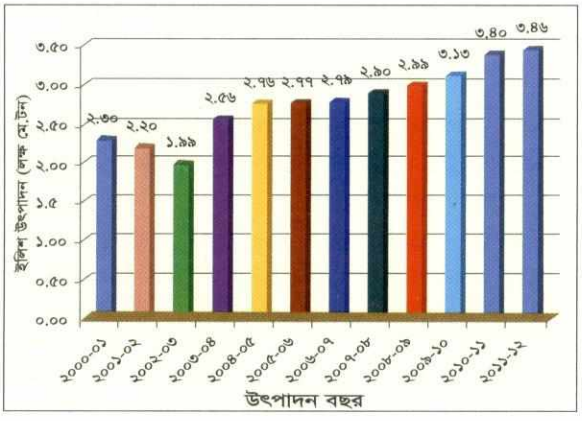

চিত্র: বিগত ১২ বছরের ইলিশ উৎপাদনের তুলনামূলক গ্রাফ

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা (Future plan)

ইলিশ সম্পদের উন্নয়ন আরও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে প্রকল্প সংশোধনীর প্রস্তাবনায় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ হলো:

- জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান কার্যক্রম পূর্বের ৪ জেলার ২১ উপজেলার পরিবর্তে ১৩ জেলার ৬০ উপজেলায় বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে। দুই বছরে ২০,০০০ নতুন সুফলভোগীকে বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ বিতরণ এবং সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণে আইন বাস্তবায়ন কার্যক্রম ২২ জেলার ১০২ উপজেলায় বাস্তবায়ন;
- দুই বছরে জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণে ৪,৩০০টি মোবাইল কোর্ট ও অভিযান পরিচালনা;
  মোবাইল কোর্ট ও অভিযান পরিচালনার জন্য ১০টি অতি দ্রুতগামী যন্ত্রচালিত এফআরপি বোট ক্রয়;
- জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পোস্টার, লিফলেট, বুকলেট এবং ডকুড্রামা, ডকুমেন্টারি, টিভি স্পট ইত্যাদি প্রচারণা সামগ্রী তৈরি ও প্রচার;
- জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রচার-প্রচারণা, সেমিনার/ওয়ার্কশপ ইত্যাদি অনুষ্ঠান; এবং
- বরগুনা জেলায় একটি নতুন ইলিশ অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠাকরণ।

সুপারিশমালা (Recommendations)

ইলিশ সম্পদ উন্নয়নে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক-

- মৎস্য অধিদপ্তরের জনবল কাঠামোতে ইলিশ সেল গঠন এবং ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনায় দক্ষ জনবল তৈরি;
- জাটকা সংরক্ষণ আইন কঠোরভাবে বাস্তবায়ন;
- জাটকা সংরক্ষণ ও ইলিশ উন্নয়ন পদ্ধতি সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন;
- ইলিশ অভয়াশ্রম সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিকভাবে ছোট আকারের ইলিশ/জাটকা প্রতিপালনের সুযোগ বৃদ্ধি;
- জরুরি ভিত্তিতে সরকারের উচ্চ মহলের সহযোগিতায় কারেন্ট জাল উৎপাদন কারখানা বন্ধকরণ;
- ইলিশ মাছের অতি আহরণ মাত্রা নিয়ন্ত্রণ;
- ডিমওয়ালা ইলিশ ও ইলিশের প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র সংরক্ষণ;
- ইলিশ মাছের আবাসস্থল ও পরিবেশ উন্নয়ন;
- ইলিশ মাছের আহরণ পরিসংখ্যান উন্নয়ন;
- ইলিশসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা বৃদ্ধি;
- জাটকা ও ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধকালীন দরিদ্র জেলেদের প্রয়োজন মাফিক খাদ্য সহায়তা প্রদান;
- জাটকা আহরণে বিরত জেলেদের পুনর্বাসন বা বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি;
- ইলিশ জেলেদের জন্য বীমা ব্যবস্থার প্রচলন ও সুদমুক্ত ঋণ প্রদান;
- ইলিশ মাছ পরিবহন, বাজারজাতকরণের পদ্ধতি উন্নয়ন ও মান নিয়ন্ত্রণ; এবং
- দেশের অভ্যন্তরিণ চাহিদা মিটানোর পর ইলিশ রপ্তানি বৃদ্ধি উৎসাহিতকরণ।

উপসংহার (Conclusion)

ইলিশ ও জাটকা আহরণে নিয়োজিত মৎস্যজীবী ও ব্যবসায়ীগণ এ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ সুফলভোগী। এ সম্পদের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য প্রত্যক্ষ সুফলভোগীদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন। ইলিশের উৎপাদন জলজ পরিবেশ ও নদ-নদীতে পানি প্রবাহের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দেশের জলজ পরিবেশের ক্রমশ পরিবর্তন হচ্ছে। সম্প্রসারিত শিল্পায়ন ও কলকারখানার বর্জ্য যথাযথভাবে দূষণমুক্তকরণের ব্যবস্থা না করে নদীতে ফেলার কারণে দেশের জলজ পরিবেশ ক্রমাগতভাতে দূষিত হচ্ছে। দেশের সকল স্তরে সুষম উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে। এ লক্ষ্যে আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ বৃদ্ধিসহ সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১ সহকারী পরিচালক, জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান এবং গবেষণা প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ (ncroy_65@yahoo.com)
২ প্রকল্প পরিচালক, জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান এবং গবেষণা প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

মাছে ফরমালিনের অপব্যবহার প্রতিরোধে মৎস্য অধিদপ্তরের ভূমিকা

Role of Department of Fisheries to Control Abuse of Formalin in Fish

ড. জি এম শামছুল কবীর[১] ও শেখ মনিরুল ইসলাম মনির[২]

Abstract

Fish preserved in formalin is very detrimental to human health due to its toxic and volatile nature. Though there are many harmful effects of formalin on human body, but no-one can escape from the grip of formalin associated health hazards now a days. It may cause various diseases like skin disease, diarrhoea, respiratory ailment, blindness, kidney disease and even cancer. The unabated use of formalin as fish preservative, will create health hazards and it might have negative impact on aquaculture production in Bangladesh. However, it is necessary to protect the abuse of formalin to save human health. At the same time, it is necessary to create awareness among fish traders and other stakeholders about the deleterious effect of formalin in fish. In this circumstance, the Department of Fisheries has undertaken initiative to stop abuse of formalin in fish. As part of its initiative, Department of Fisheries is implementing a project namely 'Control of Formalin use in Fish Preservation and Mass awareness Campaign'. Due to different activities of the project, rampant formalin abuse in fish has significantly decreased in the country.

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক দিক থেকে, নিরাপদ খাদ্যে ও আমিষের চাহিদা পূরণে মৎস্যসম্পদের ভূমিকা ও গুরুত্ব অপরিসীম। মাছ একটি অত্যন্ত সুস্বাদু খাদ্য যার মধ্যে রয়েছে উন্নত ও সহজপ্রাপ্য আমিষ, অত্যাবশ্যকীয় ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড, ভিটামিন ও খনিজ লবণ। ফলশ্রুতিতে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে ও সুস্থ জাতি গঠনে মাছ আমাদের জন্য অত্যন্ত উপযোগী খাদ্য। প্রাকৃতিকভাবে মাছ একটি দ্রুত পচনশীল খাদ্যদ্রব্য। আহরণের পর সঠিক পরিচর্যা ও সংরক্ষণের মাধ্যমে মাছের পচনের গতিকে হ্রাস করা যায় এবং ভোক্তার হাতে গ্রহণযোগ্য অবস্থায় পৌঁছে দেওয়া যায়। কিছু অসাধু ব্যবসায়ী কর্তৃক সংরক্ষণ খরচ কমানের জন্য মাছে ফরমালিন ব্যবহার করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ফরমালিন এমন একটি রাসায়নিক যৌগ যা মানব দেহের জন্য ক্ষতিকর। ফরমালিনযুক্ত মাছ খেলে চর্ম ও কিডনি রোগ এবং ডায়রিয়াসহ অন্যান্য রোগ দেখা দেয়, এমনকি ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। ফলশ্রুতিতে জনস্বাস্থ্যে বিপর্যয় নেমে আসতে পারে এবং মৎস্যচাষে এর বিরূপ প্রভাব দেখা দিতে পারে।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার জনস্বাস্থ্য বিষয়ে খুবই সচেতন। তাই নিরাপদ ও ফরমালিনমুক্ত মাছ প্রাপ্তির লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এবং মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে মৎস্য সংরক্ষণে ফরমালিনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও গণসচেতনতা সৃষ্টি শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের কার্যক্রম দেশব্যাপী বাস্তবায়িত হবার ফলে ফরমালিনের অপব্যবহার রোধে জনগণ যথেষ্ট সচেতন হচ্ছে।

ফরমালিন ডিটেকশন কিটবক্স সরবরাহ

(Supply of formalin detection kit)

মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন 'মৎস্য সংরক্ষণে ফরমালিনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও গণসচেতনতা সৃষ্টি প্রকল্প'-এর মাধ্যমে প্রতিটি জেলায় ১টি করে ফরমালিন শনাক্তকরণ ডিজিটাল ও সেন্সর পদ্ধতির অত্যাধুনিক কিট সরবরাহ করা করা হয়েছে। ইলেক্ট্রোকেমিকেল সেন্সর পদ্ধতিতে নিখুঁতভাবে এ কিটবক্স০ (শূন্য) হতে ৩৪ পিপিএম মাত্রা পর্যন্ত সহজেই ফরমালিন শনাক্ত করতে পারে। এ যন্ত্রের রেজুলেশন হচ্ছে ০.০১ পিপিএম এবং (-) ২০^0 সে হতে (+) ৪০^0 সে পর্যন্ত তাপমাত্রায় এটি একটি কার্যকর যন্ত্র। এ কিটটি অত্যন্ত ব্যবহার বান্ধব এবং সহজেই বহনযোগ্য (ওজন মাত্র ১৭০ গ্রাম)।

বিভিন্ন সংস্থার কার্যক্রম

(Activities of other organisations)

মৎস্য অধিদপ্তরের কার্যক্রমে উৎসাহিত হয়ে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন- জাতীয় ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন, সামরিক বাহিনী, পুলিশ প্রশাসন, ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই, এসিআই, রোটারি ক্লাব ও বিভিন্ন শপিং মল একই ধরনের ফরমালিন শনাক্তকরণ ডিজিটাল কিটবক্স সংগ্রহ করে নিয়মিত ব্যবহার করছে। এ কার্যক্রম মৎস্য অধিদপ্তরীয় 'মৎস্য সংরক্ষণে ফরমালিনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও গণসচেতনতা সৃষ্টি' শীর্ষক প্রকল্পের ইতিবাচক প্রভাব। উল্লেখ্য, মৎস্য অধিদপ্তরই সর্বপ্রথম ফরমালিন শনাক্তকরণ ডিজিটাল কিটবক্স সংগ্রহ করে এবং যার মাধ্যমে যে কোনো মাত্রায় ফরমালিন শনাক্ত সম্ভব হচ্ছে।

ফরমালিনের অপব্যবহার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি

(Raise awareness for abuse of formalin)

মাছে ফরমালিনের অপব্যবহার, মানবদেহে এর ক্ষতিকর প্রভাব, ফরমালিনের অপব্যবহার রোধে প্রচলিত আইন ইত্যাদি সম্পর্কে সর্বসাধারণকে সচেতন করার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরীয় এ প্রকল্পের আওতায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মৎস্য ব্যবসায়ী, মৎস্যজীবী, স্থানীয় মৎস্য বাজার বা মৎস্যআড়ত বা মৎস্য

অবতরণ কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রতিনিধি, মাছ প্যাকিং এর সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের প্রতিনিধি, ক্রেতা ও বিক্রেতার প্রতিনিধি, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিনিধিবৃন্দ এসব সচেতনতামূলক সভায় অংশগ্রহণ করেন।

চিত্র: মাঠ পর্যায়ে অনুষ্ঠিত ফরমালিনের অপব্যবহার রোধ বিষয়ক সচেতনতামূলক সভা

গণসচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে মৎস্য অধিদপ্তর মাছে ফরমালিন শনাক্তকরণ, সংরক্ষণের জন্য মাছে ফরমালিন প্রয়োগের ক্ষতিকর প্রভাব, নিরাপদে মাছ সংরক্ষণ পদ্ধতি, মাছে ফরমালিন ব্যবহার না করার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির উপায় ইত্যাদি বিষয়ে মৎস্য ব্যবসায়ী, মাছ বিক্রেতা ও আড়তদার, বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি, মৎস্যজীবীদের প্রতিনিধিসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারগণ এবং মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করছে।

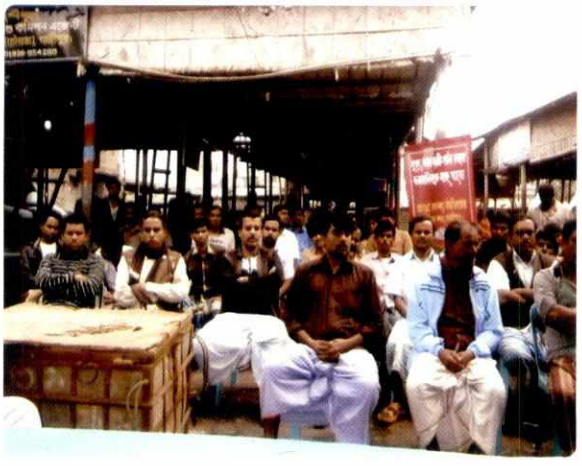

চিত্র: মাছ বিক্রেতা, আড়তদার, বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত ফরমালিনের অপব্যবহার রোধ বিষয়ক সচেতনতামূলক সভা

এর ধারাবাহিকতায় মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক জেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট জেলার বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় জেলা প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিনিধিবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট জেলাধীন মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, মৎস্য ব্যবসায়ী, মৎস্যজীবী এবং মৎস্যবাজার, মৎস্য আড়ত ও মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র এর ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রতিনিধি, মাছ প্যাকিং এর সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ, ক্রেতা ও বিক্রেতা প্রমুখ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। এ পর্যন্ত ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় ৩৩টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ফরমালিনের অপব্যবহার রোধে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিগণের সঙ্গে মতবিনিময় করা হয়। উপরন্তু মৎস্য অধিদপ্তর ও পরিকল্পনা কমিশন এর যৌথ উদ্যোগে 'Indiscriminate use of chemicals on fish and fruits: What can we do about It?' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মশালায় বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ ও গবেষকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

চিত্র: পরিকল্পনা কমিশন ও মৎস্য অধিদপ্তর এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কর্মশালা

চিত্র: জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত ফরমালিনের অপব্যবহার রোধ বিষয়ক কর্মশালা

চিত্র: ফরমালিনের অপব্যবহার রোধে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিগণের সঙ্গে মতবিনিময়

মোবাইল কোর্ট পরিচালনা (Mobile court operation)

মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক অত্যাধুনিক ডিজিটাল কিটবক্সের মাধ্যমে ঢাকা শহরসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় প্রশাসন, র‍্যাব ও পুলিশ প্রশাসন এর সহায়তায় বিভিন্ন মৎস্য বাজার, মৎস্য আড়ত, শপিং মল ইত্যাদিতে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হচ্ছে। এ উদ্যোগ সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। এ প্রকল্পের সহায়তায় দেশব্যাপী এ পর্যন্ত জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ২,৮৩২টি এবং ঢাকাস্থ মৎস্যবাজার ও মৎস্য আড়তে ১০৯টি মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়েছে। এ পর্যন্ত ৪৬.৭৩ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে, ০৬ জনকে ০১ মাস করে জেল দেয়া হয়েছে এবং ৬.৭১ মে.টন মাছ বিনষ্ট করা হয়েছে। তাছাড়াও মৎস্য অধিদপ্তর ও জাতীয় ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তর যৌথভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে থাকে। মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক এ ধরনের উদ্যোগ ফরমালিনের অপব্যবহার রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

চিত্র: ঢাকাস্থ মৎস্যবাজারে ফরমালিনের অপব্যবহার রোধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

ফরমালিনমুক্ত বাজার ঘোষণা (Declaration of formalin free market)

ফরমালিনমুক্ত বাজার ঘোষণা এখন সময়ের দাবী। মৎস্য অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসন, এফবিসিসিআই ও বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এর সহযোগিতায় এ পর্যন্ত ৩১টি বাজারকে ফরমালিনমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। এ কার্যক্রমকে আরও বেগবান করা হচ্ছে। এছাড়াও বিভিন্ন শপিং মল এ কার্যক্রমের সাথে শরিক হয়ে নিজস্ব অর্থায়নে ফরমালিন শনাক্তকরণ ডিজিটাল কিট ক্রয় করে তা ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের শপিং মল ফরমালিনমুক্ত ঘোষণা করেছে।

ফরমালিনের আমদানি নিয়ন্ত্রণ (Control of formalin import)

ফরমালিনের অপব্যবহার রোধে বাজারে ফরমালিন ক্রয়-বিক্রয়ে শর্ত আরোপ করা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সর্বশেষ প্রচলিত আইন অনুযায়ী ফরমালিন আমদানির আগে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সুপারিশসহ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিতে হবে, ফরমালিন আমদানি, বিক্রয় ও ব্যবহারের বিস্তারিত বিবরণ রেজিস্টারে সংরক্ষণ করতে হবে এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও সরকারের বিভিন্ন সংস্থা এ রেজিস্টারগুলো নিয়মিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন। ফরমালিন অপব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে।

উপসংহার (Conclusion)

মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন জেলায় ও উপজেলায় সচেতনতামূলক সভা, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ফলে জনসাধারণের মধ্যে মাছ সংরক্ষণে ফরমালিনের অপব্যবহার রোধে অনেকাংশে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে অসাধু মাছ ব্যবসায়ী কর্তৃক ফরমালিন মিশিয়ে মাছ বাজারজাতকরণ আশানুরূপ হারে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। মৎস্য অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রম ফরমালিনমুক্ত ও নিরাপদ মাছ প্রাপ্তিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। এ উদ্যোগকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য সরকারি-বেসরকারি সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। বিশেষত জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে সরকারি- বেসরকারি উদ্যোগ কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। ভোক্তার জন্য ফরমালিনমুক্ত পণ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে একাধিক বাজারকে ফরমালিনমুক্ত বাজার হিসেবে ঘোষণা করার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

[১]প্রকল্প পরিচালক, মৎস্য সংরক্ষণে ফরমালিনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও গণসচেতনতা সৃষ্টি প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ (gmskabir@gmail.com)
[২]সহকারী পরিচালক, মৎস্য সংরক্ষণে ফরমালিনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও গণসচেতনতা সৃষ্টি প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

মৎস্যচাষের অপার সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল

Aquaculture Potentials in Bangladesh Coastal Zone

প্রফুল্ল কুমার সরকার[১] ও সরোজ কুমার মিস্ত্রী[২]

Abstract

Coastal aquaculture has ample potentials in fish production, animal protein supply, reducing poverty, employment generation and export earning for Bangladesh. It has 710 km long coast line including 19 districts and 146 upazilas characterised by saline, brackish and fresh water rivers, canals, floodplains and shrimp ghers (farm), suitable for adopting variety of aquaculture technologies. Almost 90% of exportable fisheries commodities currently is being supported from coastal aquaculture. A number of promising candidates of brackish water shrimp and fish including mollusks, marine algae are adding to export volume and value. Coastal aquaculture has immense potential not only to impart in contributing the national economy but also to cope with the ensuring climate change scenario in tandem in providing livelihood security to the coastal fisher. Effects of climate change, poor infrastucture, traditional technology, supply of quality seed and feed etc. are the chalenges in achiving sucess.

সাগরের কাছাকাছি অঞ্চল, জোয়ারে ভাসে যার কূল, তার নাম উপকূল। জোয়ার-ভাটার প্রভাব বলয় যতদূর, উপকূল ততদূর। বঙ্গোপসাগরের তীর বরাবর ৭১০ কিমি এবং বাংলাদেশের দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের ১৯ টি জেলার ১৪৬ টি উপজেলায় উপকূলীয় অঞ্চল বিস্তৃত। অসংখ্য নদ-নদী, খাল, পুকুর, ডোবা, প্লাবনভুমি মৎস্য ঘের, মোহনা ইত্যাদি সবকিছু মিলেমিশে এক বিশাল জলভাণ্ডার যা এ অঞ্চলকে করেছে মৎস্যসম্পদে সমৃদ্ধ। প্রাকৃতিক মাছের প্রাচুর্যের পাশাপাশি সৃষ্টি হয়েছে নানা জাতের

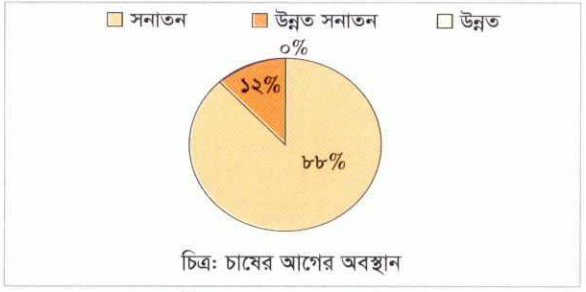

চিত্র: চাষের আগের অবস্থান

মাছ চাষের অবারিত সুযোগ। বর্তমানে দেশের মোট রপ্তানিযোগ্য মৎস্যসম্পদের প্রায় শতভাগ উপকূলীয় অঞ্চলের অবদান। আশির দশকের শুরুতে এ অঞ্চলে চিংড়ি চাষের গোড়াপত্তন। বাগদা ও গলদা চিংড়ি চাষের প্রসার এ অঞ্চলের অর্থনীতিকে করেছে মজবুত। সেই সঙ্গে বর্তমান সময়ে থাই পাঙ্গাস, তেলাপিয়া, কৈ, টেংরা, কাঁকড়া, কুঁচে, ভেটকি, পারসে, খরশুলা ইত্যাদি মাছ চাষ উপকূলীয় অঞ্চলে ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ভবিষ্যতে রপ্তানিযোগ্য মোলাস্ক ও সামুদ্রিক শেওলা হয়ে উঠতে পারে এ অঞ্চলের সম্ভাবনাময় চাষ। অতি সংক্ষেপে উপকূলীয় অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় মাছ চাষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রেক্ষিত আলোচনা করা হলো।

উপকূলীয় অঞ্চলে বাগদা চিংড়ি চাষ (Shrimp farming in coastal waters)

দেশের রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসারের জন্য উপকূলীয় অঞ্চলে বাগদা চিংড়ি চাষ গুরুত্বপুর্ণ ও সম্ভাবনাময়। বর্তমানে

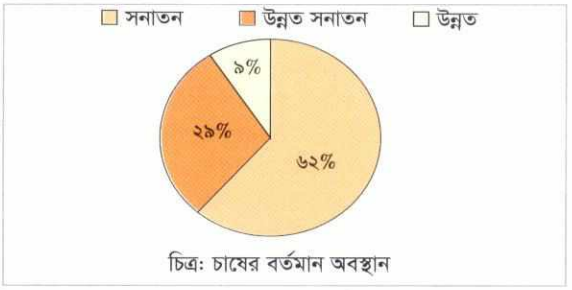

চিত্র: চাষের বর্তমান অবস্থান

উপকূলের প্রায় ২,১৬,০০০ হে. জমিতে বাগদা চিংড়ি চাষ হচ্ছে। তন্মধ্যে ১,৯০,০৮০ হে. জমিতে সনাতনী/ সম্প্রসারিত পদ্ধতির চাষ হচ্ছে। এ পদ্ধতিতে পোনা মজুদ ও পানি বদল ছাড়া তেমন কোন ব্যবস্থাপনা নেই। হেক্টর প্রতি উৎপাদন কমবেশি ৩০০ কেজি। তবে ধান ও চিংড়ি পর্যায়ক্রমে চাষ করা যায়। খুলনা জেলার পাইকগাছা অঞ্চলের এক সমীক্ষায় দেখা যায় এ চাষে হেক্টর প্রতি ৮২ হাজার টাকা ব্যয় করে ১৬২ হাজার টাকার চিংড়ি উৎপাদন হয়, যাতে হেক্টর প্রতি কমবেশি ৮০ হাজার টাকা নীট লাভ থাকে।

উন্নত সম্প্রসারিত বাগদা চিংড়ি চাষ ও মৎস্য অধিদপ্তরের সাম্প্রতিক উদ্যোগ (DoF initiative in introducing improved shrimp farming)

সম্প্রসারিত চাষের কিছু খামার উন্নত সম্প্রসারিত খামারে রুপান্তর করা গেলে চিংড়ির উৎপাদন ও লাভ আরও বেড়ে যাবে। মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এর সাম্প্রতিক উদ্যোগে এ পদ্ধতিতে সংযোগ চাষিদের বাগদা চিংড়ি চাষের ফলাফল খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলার ১৬৮ টি (২৩৩.৫৮ হে.) খামারে এ কার্যক্রমের আওতায় ঘেরের পাড় উঁচু ও মজবুত করে, ৩-৪ ফুট গভীর করে ভাইরাসমুক্ত সুস্থ ও সবল পোনা নার্সিং করে এবং প্রাকৃতিক খাবারের পাশাপাশি কিছু সম্পূরক খাবার দেয়া হয়েছে।

প্রাথমিক ফলাফলে এসব খামারে একক ফসলে হেক্টর প্রতি ৬০০ থেকে ৭০০ কেজি উৎপাদন পাওয়া যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এতে হেক্টর প্রতি ২ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ৩.৯ লক্ষ টাকার চিংড়ি উৎপাদন এবং হেক্টর প্রতি প্রায় ১.৯ লক্ষ টাকা লাভ করা সম্ভব। বর্তমানে ২৫,৩৮০হেক্টর (শতকরা ১২ ভাগ) জমিতে এ পদ্ধতির চাষ হয়। বাগদা চিংড়ির চাষের আয়তন না বাড়িয়ে এ পদ্ধতির চাষের বর্তমান অবস্থান শতকরা ১২ হতে ২৯ ভাগে উন্নীত করা সম্ভব হলে বছরে ২১,৬২৪ মে.টন অতিরিক্ত উৎপাদন সম্ভব হবে।

আধা নিবিড় বাগদা চিংড়ি চাষ
(Semi intensive shrimp farming)

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে উন্নত বদ্ধ পদ্ধতির চাষ হতে পারে একটি খুবই সম্ভাবনাময় বিনিয়োগ। স্থানীয় একাধিক সমীক্ষা থেকে জানা যায়, বর্তমানে মাত্র প্রায় ৫০০ হেক্টর জমিতে এ পদ্ধতির চাষ হয় এবং উৎপাদন হেক্টর প্রতি ৪ থেকে ৫ মে.টন। অবকাঠামো ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন করে এ উৎপাদন ৮ মে.টনে উন্নীত করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে হেক্টর প্রতি ১৬-২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ৩০-৩২ লক্ষ টাকার চিংড়ি উৎপাদন সম্ভব। এ চাষে পরিকল্পিত পুকুর, পর্যাপ্ত দূষণমুক্ত পানি, রোগমুক্ত সুস্থ-সবল পোনা, পুষ্টি সমৃদ্ধ মানসম্পন্ন খাবার, পরিমিত পরিচর্যা ও পর্যবেক্ষণ খুবই জরুরি। মাত্র ২০ হাজার হেক্টর জমিতে (শতকরা ৯ ভাগ) এ চাষ সম্প্রসারণ করা গেলে বছরে অতিরিক্ত এক লাখ মে.টন বাগদা চিংড়ি জাতীয় উৎপাদনে যোগ করা সম্ভব। এ পদ্ধতির চাষ পরিবেশবান্ধব, নিয়ন্ত্রণযোগ্য, অল্প জায়গায় সম্ভব বলে সম্প্রসারিত চাষের সামাজিক সমস্যাগুলো এড়িয়ে চলা সম্ভব। এ চাষে বিনিয়োগর পরিমাণ বেশি বলে সামর্থ্যবান চাষি, ব্যাংক, বীমা, বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ও এন্টারপ্রাইজকে এগিয়ে আসতে হবে। উন্নত বদ্ধ পদ্ধতির বাগদা চিংড়ি চাষ হতে পারে উপকূলীয় অঞ্চলের সেরা বিনিয়োগ।

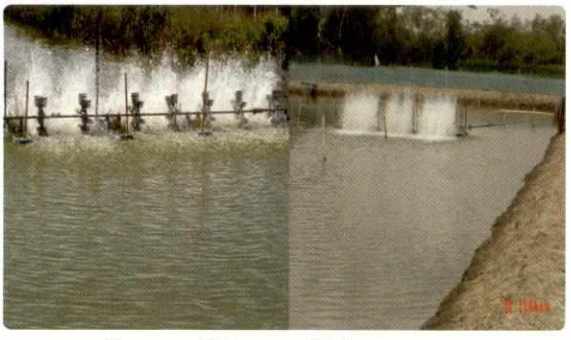

চিত্র: আধা-নিবিড় বাগদা চিংড়ি চাষের পুকুর

গলদা চিংড়ি চাষ (Freshwater prawn farming)

দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় ৭টি জেলার প্রায় ৬০ হাজার হেক্টর জমিতে গলদা চিংড়ির চাষ হচ্ছে এবং এ অঞ্চলে গলদা চিংড়ি চাষ পরিবেশবান্ধব ও উপযোগী চাষ ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচিত। গলদা চিংড়ির খামারের ধান, সবজি, মাছ ও চিংড়ির সমন্বিত চাষ হয়। গলদা খামারের ক্যানালের পানিতেই ধান ও সবজির আবাদ চলে এবং ধানের ফলনও ভাল হয়। পৃথক সেচ ব্যবস্থার প্রয়োজনই পড়ে না। ফলে উৎপাদন ব্যয়ও তুলনামূলকভাবে কম। এ পদ্ধতিতে হেক্টর প্রতি গলদা চিংড়ির উৎপাদন ৪৫০ থেকে ৫৫০ কেজি ও ৩-৪ লক্ষ টাকার চিংড়ি পাওয়া যায়। তবে পরিকল্পিত পুকুর বা খামারে গুড অ্যাকোয়াকালচার প্রাকটিস অনুসরণে সারা বছর চাষ করলে এই উৎপাদন হেক্টর প্রতি ১,০০০-১,২০০ কেজিতে উন্নীত করা সম্ভব। ভবিষ্যতে সিডব্যাংকে পোনা সংরক্ষণ ও সম্পূর্ণ পুরুষ গলদার চাষ এই সম্ভাবনাকে আরও উজ্জ্বল করবে।

উপকূলীয় অঞ্চলে কাঁকড়া চাষ
(Crab fattening in coastal water)

কাঁকড়া উপকূলীয় অঞ্চলের অন্যতম প্রধান সম্ভাবনাময় ফসল। একাধিক সমীক্ষা থেকে জানা যায়, বর্তমানে দেশে বছরে প্রায় ১০ হাজার মে.টন কাঁকড়া সংগৃহীত হচ্ছে। যার সিংহভাগ আসে প্রাকৃতিক উৎস- প্যারাবন ও সংলগ্ন নদ-নদী, খাল, প্লাবনভূমি এবং চিংড়ি ও কাঁকড়া ঘের হতে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্যানুযায়ী ২০১১-১২ অর্থবছরে প্রায় ৪ হাজার মে.টন কাঁকড়া রপ্তানি করা হয়েছে। দেশের চাষযোগ্য শীলা কাঁকড়া বা মাড ক্রাব ২-৫০ পিপিটি লবণাক্ততা এবং ১২-৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে বিধায় উপকূলীয় অঞ্চল তথা খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী, বরগুনা, লক্ষ্মীপুর ও কক্সবাজার অঞ্চলে কাঁকড়া চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। ইতোমধ্যে বাগেরহাট জেলার রামপাল, মংলা; খুলনা জেলার দাকোপ, পাইকগাছা, কয়রা; সাতক্ষীরা জেলার কালীগঞ্জ, দেবহাটা, শ্যামনগর উপজেলায় এ চাষের বিস্তৃতি বাড়ছে। এসব অঞ্চলের বাড়ির আশেপাশে পতিত, ডোবা, নালা, চরাঞ্চল, চিংড়ি ঘের, নদীর পাড় ইত্যাদি জায়গায় সাধারণত বাঁশ অথবা সুপারির চটা দিয়ে ছোট বড় যে কোনো আকারের কাঁকড়া ঘের বানানো হয়। খুলনা জেলার দাকোপ অঞ্চলে এক সমীক্ষায় দেখা যায়, চারটি খাঁচায় মাসে একটি পরিবার প্রায় ১০ (দশ) হাজার টাকা আয় করতে পারে। পাইকগাছা অঞ্চলে এক সমীক্ষায় দেখা যায়, মাত্র ৫ শতাংশ জায়গায় কাঁকড়া মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে মাসিক ৪-৫ হাজার টাকা আয় করা সম্ভব। বর্তমানে উপকূলীয় অঞ্চলের ৫০ হাজারের অধিক লোক কাঁকড়া আহরণ, মোটাতাজাকরণ ও বিপণনের সাথে জড়িত বলে একাধিক সমীক্ষায় জানা যায়।

উপকূলীয় অঞ্চলে পেন ও খাঁচায় মাছ চাষ
(Pen and cage potentials in coastal area)

বিশ্বের অনেক দেশে পেন এবং খাঁচায় মাছ চাষ ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া স্কটল্যান্ডে চাষের মোট মাছের উল্লেখযোগ্য উৎপাদন আসে খাঁচায় মাছ চাষ হতে। বাংলাদেশের উপকূলের প্রায় সকল জেলার জলাশয়ে পেন ও খাঁচায় মাছ চাষের সুযোগ রয়েছে। এ চাষের বড় সুবিধা হলো ফসলী জমি নষ্ট না করেও মাছ চাষের সুযোগ সৃষ্টি। বরিশাল অঞ্চলের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ২০ ফুট লম্বা, ১০ ফুট চওড়া, ৬ ফুট উচ্চতার একটি খাঁচায় ১,০০০ তেলাপিয়া পোনা অবমুক্ত করে ৩/৪

মাসে ৩৫০/৪০০ কেজি মাছ উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। খাঁচার অবচয়ন ব্যয়সহ প্রতি ফসলের উৎপাদন ব্যয় দাঁড়ায় ২৬ থেকে ২৭ হাজার টাকা। উৎপাদিত মাছের মুল্য প্রায় ৩৬ থেকে ৩৭ হাজার টাকা। বছরে দুই ফসলে উৎপাদন দ্বিগুণ হবে। খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাটের পোল্ডার এলাকার আধা-উন্মুক্ত নদী ও খালে এ চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। পিরোজপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী, চাঁদপুর ও নোয়াখালী অঞ্চলে এ চাষ ইতোমধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ওয়ার্ল্ডফিস এর আর্থিক সহায়তায় খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলায় পরীক্ষামূলকভাবে খাঁচায় মাছ চাষ কার্যক্রমটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে যা বেশ উৎসাহব্যঞ্জক। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত প্রশমনে এটি হতে পারে অন্যতম অভিযোজন কৌশল।

উপকূলীয় অঞ্চলে পাঙ্গাস, তেলাপিয়া ও কৈ মাছের চাষ (Semi intensive farming of pangas and perch)

উপকূলীয় অঞ্চলে ইতোমধ্যেই বাণিজ্যিক ভিত্তিতে শত শত হেক্টর জমিতে থাই পাঙ্গাস, তেলাপিয়া ও থাই কৈ মাছের বাণিজ্যিক চাষ শুরু হয়েছে। এ অঞ্চলে পাঙ্গাস, তেলাপিয়া ও কৈ মাছের হেক্টর প্রতি দুই ফসলে বার্ষিক উৎপাদন গড়ে প্রায় যথাক্রমে ৮০-৯০ মে.টন; ২৫-৩০ মে.টন এবং ৩০-৩২ মে.টন। খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার জলমা, গুপ্তমারী, দাউনিয়াফাঁদ, তেতুঁলতলা এখন মৎস্য চাষ পল্লী। প্রতিদিন কয়েক ট্রাক মাছ এ অঞ্চল হতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সরবরাহ হয়ে থাকে। এ এলাকার কোনো কোনো চাষি বছরে প্রায় ১,০০০ থেকে ৩,০০০ মে.টন পর্যন্ত মাছ উৎপাদন করে থাকে। উপকূলীয় অঞ্চলের অধিকাংশ পোল্ডারে এবং বিশেষ করে বরিশাল অঞ্চলে এ রকম বাণিজ্যিক মৎস্যচাষ পল্লী গড়ে তোলা সম্ভব। এ অঞ্চলে এ ধরনের চাষের একটি বাড়তি সুবিধা হলো উপকূলীয় নদ-নদীর পানি সব সময়, সব স্থানে নোনা থাকে না। জোয়ার-ভাটা আছে বলে পানির তেমন অভাব হয় না। প্রয়োজনে পানি অদল-বদল করা যায়। তাই মাছের উৎপাদন খুবই সন্তোষজনক। বেড়ী বাঁধ সংলগ্ন বরোপিট, ডোবা, পুকুর, দীঘি, মরা খাল, মরা নদীতে এবং প্রবাহমান নদীতে খাঁচায় এসব মাছের চাষ চলে। জোয়ারভাটা প্রবণ গোটা উপকূল জুড়ে সুবিধাজনক জায়গায় এধরনের বাণিজ্যিক খামার গড়ে উঠলে সৃষ্টি হবে ব্যাপক কর্মসংস্থান।

ভেটকি, পারশে, নোনা টেংরার চাষ (Brackishwater finfish farming)

উপকূল হলো সাগর ও নদীর মিলন মেলা, পাওয়া যায় পারশে, ভেটকি, ভাঙ্গন, ভোলা। এ অঞ্চলের বড় সুস্বাদু ও মূল্যবান মাছ। একদা এ অঞ্চলের নদনদী ও প্লাবনভূমিতে এবং সনাতনী বাগদা চিংড়ি ঘেরে সাথী ফসল হিসেবে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যেত। উপকূলীয় প্রাকৃতিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে এসব মাছ আর আগের মত পাওয়া যায় না। তবে এ অঞ্চলে এসব মাছ চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। পারশে, ভাঙ্গন, নোনা টেংরা, চিত্রা ইত্যাদি বাগদা চিংড়ির সাথে সাথী ফসল হিসেবে চাষ শুরু হয়েছে। খরসুলা মাছ গলদা চিংড়ির ঘেরে অন্যতম প্রধান সাথী ফসল। চিংড়ি খামারে পানির পরিবেশ ভাল রাখা ও চাষের ঝুঁকি কমাতে সাথী ফসল হিসেবে এসব মাছের চাষ বেশ গুরুত্বপূর্ণ। মিশ্র অথবা একক পদ্ধতিতে এ সব মাছের চাষ করা যায়। হ্যাচারিতে পোনা উৎপাদন সম্ভব হলে উপকূলীয় অঞ্চলে এসব মাছের চাষ সম্প্রসারণের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

উপসংহার (Conclusion)

নানা রকম মাছ ও জলজ জীব চাষের অপার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও উপকূলীয় জমি ও জলকে আমরা এখনও পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করতে পারছি না। পরিকল্পিত পুকুর, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, উন্নত পোনা, মানসম্পন্ন খাবার, লাগসই ও টেকসই প্রযুক্তি এবং পর্যাপ্ত পুঁজির অভাবে উপকূলীয় অঞ্চলে মাছ চাষের এসব সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগানো যাচ্ছে না। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আবহাওয়ার বিরূপ আচরণ মাছ চাষকে করছে ঝুঁকিপূর্ণ। জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় আগামী দিনের লাগসই ও টেকসই প্রযুক্তি কী হবে তা নিয়ে ভাববার সময় এখনই। এলক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর চাষাবাদের কোনো বিকল্প নেই। প্রশিক্ষণ, সম্প্রসারণ ও উপকূলীয় অঞ্চলের অগ্রাধিকারভিত্তিক উন্নয়ন কাজের মাধ্যমে এসব বিষয় উপকূলীয় চাষিদের নিকট সহজলভ্য করতে হবে। তাছাড়া জল ও জমির ওপর উপকূলীয় নানা মানুষ, গোষ্ঠী, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের নানা রকম স্বার্থ নানাভাবে জড়িত। তাই বিচ্ছিন্ন কোনো প্রয়াস ও উদ্যোগ তেমন কোনো কাজে আসবে না। উপকূলীয় পরিবেশ ও জনগণের সহনশীল আচরণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে পরিকল্পিত ও সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। তবেই উপকূলীয় অঞ্চলে মাছ চাষের বিদ্যমান সম্ভাবনাকে আরও বিকশিত করা যাবে। উপকূলীয় অঞ্চলে মৎস্য চাষের যে অপার সম্ভাবনা রয়েছে তা যদি আমরা যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারি তবেই উপকুলীয় জীবন-জীবিকায় ফিরে আসবে স্বস্তি ও সচ্ছলতা।

১ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
২ সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ (sarojfmrt@yahoo.com)

স্থায়িত্বশীল মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় অভয়াশ্রমের গুরুত্ব

Importance of Fish Sanctuary in Sustainable Managemant

অজিত কুমার পাল[১] ও ড. আব্দুল কাদির[২]

Abstract

Bangladesh is placed 3rd in Asian countries after China and India in respect of aquatic biodiversity. Diversity of fishes in Bangladesh is now at stake like many other parts of the world due to overfishing, aquaculture practice, introduction of exotic species, habitat loss and degradation, sedimentation, pollution, alterations to hydrology, dredging etc. Establishment of fish sanctuary in different waterbodies has shown significant positive change in conservation and biodiversity in wetlands, seasonal and perennial waterbodies and rivers. Total production of these waterbodies increased. Fish species that seemed as threatened were found to reappear. To achieve sustainable result from fish sanctuary, the issues of proper implementation of Fish Conservation Act, baseline information of different parameters regarding targeted fish species and ecosystem, biological management of waterbodies must be ensured. Relevant stakeholders might not be only the users of fisheries resources, rather they have to act as custodian.

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার স্বার্থেই জলজ জীবের জীববৈচিত্র্য রক্ষা অতীব জরুরি। জীববৈচিত্র্যের বিচারে এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়। বাংলাদেশে সামুদ্রিক, আধা-লবণাক্ত ও স্বাদুপানির মাছের প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ৮০০। এর মধ্যে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে দেশজ (native) প্রজাতির সংখ্যাই ২৬০। IUCN (International Union for Conservation of Nature) Red List (২০০০) অনুযায়ী বাংলাদেশের স্বাদুপানির ৫৪টি মৎস্য প্রজাতি হুমকির (threatened) মুখে যার মধ্যে ১২টি অতিবিপন্ন (critically endangered), ২৮টি বিপন্ন (endangered) এবং ১৪টি ঝুঁকিপূর্ণ (vulnerable)। মাছের অতিআহরণ, চাষের জন্য প্রাকৃতিক উৎসের পোনা সংগ্রহ, বিদেশী প্রজাতির মাছ অন্তর্ভুক্তি, জলাশয় ভরাট, দূষণ ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশে মাছের জীববৈচিত্র্য ক্রমাগতই হ্রাস পাচ্ছে। যে সমস্ত পদক্ষেপ মাছের সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে তার মধ্যে অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা মাছের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বেশি ফলপ্রসু বিবেচিত হচ্ছে।

মৎস্য অভয়াশ্রমের ধারণা

(Concept of fish sanctuary)

মৎস্য অভয়াশ্রম হচ্ছে কোনো জলাশয়ের এমন এলাকা যা মাছের বংশবিস্তার বা বয়োঃপ্রাপ্ত হওয়া বা বসবাসের জন্য সংরক্ষণ করা হয়। অভয়াশ্রম সাগর, নদ-নদী, মোহনা, বিল, বাঁওড় প্রভৃতি জলাশয়ে স্থাপন করা হয়ে থাকে। স্থায়িত্বের ভিত্তিতে অভয়াশ্রম তিন প্রকার হয়ে থাকে; যেমন- মৌসুমী, বাৎসরিক ও স্থায়ী। মৌসুমী অভয়াশ্রম সাধারণত প্লাবনভূমিতে স্থাপন করা হয়ে থাকে যেখানে স্বল্প সময়ে প্রজনন পরিপক্বতা অর্জনকারী মাছের বংশবিস্তার নিশ্চিত করা যায়। প্রজননকালীন সময়ে ইলিশ মাছের প্রজনন নির্বিঘ্ন করার জন্য যে অভয়াশ্রম ঘোষণা করা হয় সেটি মৌসুমী অভয়াশ্রম। বাৎসরিক অভয়াশ্রমের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে সিলেটের হাওর অঞ্চলের পাইল ফিসারি। স্থায়ী অভয়াশ্রম হচ্ছে দীর্ঘ মেয়াদে স্থাপিত অভয়াশ্রম যা বছরের পর বছর পরিচালিত হয়। গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়া উপজেলার বন্যাবাড়ীসহ দেশে অনেক স্থায়ী অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়েছে।

মৎস্য অভয়াশ্রমের লক্ষ্য

(Objectives of fish sanctuary)

মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন বা ঘোষণার মূল লক্ষ্য হলো নিম্নরূপ:

- মাছের নিরাপদ আবাসস্থল নিশ্চিত করা;
- মাছের অবাধ প্রজনন নিশ্চিত করা ও বিচরণক্ষেত্র সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করা;
- মা মাছ ও পোনা মাছকে সঙ্কটময় মুহূর্তে রক্ষা করা;
- নিরাপদ আশ্রয় সৃষ্টির মাধ্যমে বিলুপ্তপ্রায় বা বিপন্ন প্রজাতির মাছ সংরক্ষণ করা;
- মাছের কৌলিতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করা;
- মাছের জন্য পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য নিশ্চিত করা; এবং
- সার্বিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষনের মাধ্যমে পর্যটক আকর্ষণ।

অভয়াশ্রমের উপযোগী জলাশয় ও স্থান

(Suitable waterbodies and location for sanctuary)

নদী, খাল, হাওর, বাঁওড়, বিল ও প্লাবনভূমির গভীর অংশ যেখানে পানির স্রোত কম, পলি জমার সম্ভাবনা কম এবং জলযান ও মানুষের যাতায়াত কম সাধারণত সেখানেই অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হয়। এছাড়াও হ্রদ, সাগর, ফিয়র্ড ইত্যাদি জলাশয়েও অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হয়। অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জনের জন্য নদী, হাওর, বাঁওড়, বিল ও প্লাবনভূমির নির্দিষ্ট গভীরতায় অভয়াশ্রম স্থাপন না করে জলাশয়ের সামগ্রিক ইকোসিস্টেম অন্তর্ভুক্ত করে অভয়াশ্রম স্থাপন জরুরি।

অভয়াশ্রমের উপযোগী উপকরণ ও প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি

(Suitable materials and methods for fish sanctuary)

বাংলাদেশে স্থানীয়ভাবে সহজপ্রাপ্য হিজল, শেওড়া, করচ, বরুন, গাব, বাবলা প্রভৃতি গাছের ডাল দ্বারা ঘেরা অবকাঠামোর মধ্যে স্থাপন করে অভয়াশ্রম তৈরি করা হয়।

অভয়াশ্রমের চারপাশে বাঁশ দিয়ে সীমানা নির্ধারণ করা হয় এবং ভেতরের অংশে নির্দিষ্ট দূরত্বে আরও বাঁশ পুঁতে সেগুলোর সাথে গাছের ডাল বা অন্য উপযোগী অবকাঠামো বেঁধে দেয়া হয় যাতে স্রোতে ভেসে যেতে না পারে।

চিত্র: মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার ফলে পুনরাবির্ভূত গজার মাছ

অভয়াশ্রমের সীমানা নির্ধারণপূর্বক লাল পতাকা টানিয়ে দেয়া হয় এবং অভয়াশ্রম চিহ্নিত করে সে এলাকায় 'মৎস্য অভয়াশ্রম, মাছ ধরা নিষেধ' লেখা সাইনবোর্ড টাঙানো হয়। জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক প্রচারণার ব্যবস্থা করা হয়। সেই সাথে পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। বায়োডিগ্রেডেবল (biodegradable) Predator Prevention Device (PPD) যেমন- বাঁশের তৈরি খাঁচার মত অবকাঠামো বেশি সংখ্যায় স্থাপন করলে মাছ ধরা পড়ার ঝুঁকি যেমন কমে যায় তেমন ছোট মাছ শিকারী মাছের হাত থেকে সহজেই রক্ষা পায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আরসিসি পাইপ বা টেট্রাপোড ব্যবহার করেও মাছের দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণ নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। যদিও বর্তমানে পরিবেশবান্ধব না হওয়ায় এগুলোকে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে।

বাংলাদেশে অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার প্রভাব
(Impact of establishing fish sanctuary in Bangladesh)

এক রিপোর্টে দেখা গেছে Sustainable Environmental Management Programme (SEMP) এর আওতায় বিল, হাওর, ক্রিক, খাল, নদী, বাঁওড়, প্লাবনভূমিতে অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার ফলে ১৯৯৮ থেকে ২০০৩ সালের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জলাশয়ে জীববৈচিত্র্য, ধৃত মাছের মোট ওজন এবং মাছের প্রাচুর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ঐ সমস্ত অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে বড় অর্জন হচ্ছে স্থানীয়ভাবে বিলুপ্ত, দুর্লভ ও বিপন্ন কিছু প্রজাতির মাছের পুনরাবির্ভাব। এলাকায় দুর্লভ মাছ যেমন একঠোঁট (*Dermogenys pussillus*), টেরিপুঁটি (*Puntius terio*), মেনি (*Nundus nundus*), রানী (*Botia dario*), গোড়া গুতুম (*Somileptis gongota*) এবং কুনা কুমিরের খিল (*Doryicthys cuncalus*) তাৎপর্যপূর্ণভাবে পুনরাবির্ভূত হয়েছে। অভয়াশ্রমসমূহে সরপুঁটি (*Puntius sarana*), পাবদা (*Ompok pabda*) এবং মাগুর (*Clarias batrachus*) এর পোনা ছাড়ার ফলে এসমস্ত মাছের প্রাচুর্যও বৃদ্ধি পেয়েছে। অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার ফলে সংশ্লিষ্ট জলাশয়সমূহের মাছের উৎপাদন ১৯৯৯ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে শতকরা ১৪০ ভাগ বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে। একই সময়ে হেক্টর প্রতি মাছের উৎপাদন ৫৮-১৭১ কেজি থেকে ৩১৫-৩৯০ কেজিতে উন্নীত হয়েছে। এক গবেষণায় (Azher *et al.*, ২০০৭) দেখা গেছে জোয়ানশাহী হাওরের দোপি বিলে ২০০৩ সালের জানুয়ারিতে মাছের মোট প্রজাতি সংখ্যা ৫৭ ছিল যা অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার ফলে ২০০৪ সালে ৬০ ও ২০০৫ সালে ৬২-তে উন্নীত হয়। পক্ষান্তরে ছোটদীঘা-বড়দীঘা বিলে ২০০৩ সালের জানুয়ারিতে মাছের মোট প্রজাতি সংখ্যা ৬০ ছিল যা অভয়াশ্রম না থাকায় ২০০৪ সালে ৫৫ ও ২০০৫ সালে ৫০-এ নেমে যায়। একই সময়ে দোপি বিলে মাছের মোট উৎপাদন ছোটদীঘা-বড়দীঘা বিলের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির মাছ দোপি বিলে পুনরাবির্ভূত হয় কিন্তু ছোটদীঘা-বড়দীঘা বিলে বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির মাছের সংখ্যা হ্রাস লক্ষ্য করা গেছে। অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার ফলে ইলিশের উৎপাদন ২০০১ সালে ১,৯৯,০০০ মে.টন থেকে ২০০৮ সালে ৩,০০,০০০ মে.টন এ উন্নীত হয়েছে।

মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনায় সম্ভাব্য বাধাসমূহ
(Hindrances of fish sanctuary management)

- প্রজনন মৌসুমে অভয়াশ্রমে আশ্রিত মা ও পোনা মাছ শিকার;
- মৎস্য আহরণের এলাকা সংকুচিত হবে এ শঙ্কায় মৎস্যজীবীদের কর্তৃক মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনে অনাগ্রহ প্রকাশ;
- অভয়াশ্রম সংলগ্ন এলাকায় অবৈধ জাল ও সরঞ্জাম ব্যবহার করে মাছ ধরা;
- অপরিকল্পিত কালভার্ট, ব্রিজ নির্মাণের ফলে প্রজনন মৌসুমে মাছের/পোনার চলাচল বাধাগ্রস্ত হওয়া;
- পর্যাপ্ত পাহারার অভাব;
- প্রচলিত ইজারা পদ্ধতিতে ইজারা গ্রহণকারীগণ কর্তৃক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের বিষয়টি বিবেচনায় না এনে নির্বিচারে মৎস্য নিধন; এবং
- দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্বশীলতার জন্য অভয়াশ্রম রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ ও আইনি পরিকাঠামোর অভাব।

উপসংহার (Conclusion)

বাংলাদেশে মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার সুফল ইতোমধ্যেই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার সুফল টেকসই করতে হলে মৎস্য সংরক্ষণ আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন, মৎস্যজীবীদের জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করা, অপরিকল্পিত অবকাঠামো নির্মাণ রোধ, প্রারম্ভিক তথ্যের পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করা এবং জলাশয়ে/জলমহালে জৈবিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

[১]সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর
[২]প্রকল্প পরিচালক, বৃহত্তর ফরিদপুর মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর (akadir_bau@yahoo.com)

মাছের হ্যাচারি ও নার্সারিতে রোগের প্রাদুর্ভাব ও তার প্রতিকার

Disease Outbreaks in Fish Hatcheries and Nurseries : Prevention and Control Measures

ড. মোঃ আলী রেজা ফারুক

Abstract

With the rampant expansion of aquaculture, fish disease becomes a common problem. A basic understanding of the nature and causes of fish disease is important for the farm operator. So farm operators should be well equipped to prevent and handle diseases outbreak. Fish like other animals are prone to a variety of diseases. Specially disease induced mortality is a serious issue for the fish seed industry. On the other hand, quality and healthy fish seed is the prerequisite for sustainable aquaculture. The immature immune system in fish makes the early developmental stages more susceptible to infectious diseases. Common fish diseases in hatcheries and in early rearing systems are caused by protozoan ciliates, myxosporodians, worms, opportunistic bacteria and fungi. The paper highlights the different types of diseases, causative agents and their prevention and control measures in freshwater fish hatcheries and nurseries.

বাংলাদেশে মৎস্যচাষে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার দ্রুত বাড়ছে। অ্যাকোয়াকালচারের মাধ্যমে উৎপাদিত মাছের পরিমাণের দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের ৫ম স্থান দখলকারী দেশ। দেশে উৎপাদিত মোট মাছের শতকরা প্রায় ৫৩ ভাগ আসে অ্যাকোয়াকালচার থেকে। মাছ চাষের জন্য গুণগত ও মানসম্পন্ন পোনা প্রাপ্তি অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ। নব্বই দশকের শুরুতে যখন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিপুল সংখ্যক মৎস্য হ্যাচারি স্থাপন শুরু হয়। বর্তমানে দেশে প্রায় ৭৬টি সরকারি এবং ৮৪৫টি বেসরকারি মিলে মোট ৯২১টি মৎস্য হ্যাচারি এবং ১০,৪০২টি নার্সারি আছে। বর্তমানে হ্যাচারি ও নার্সারিতে রোগের প্রাদুর্ভাবের জন্য পোনার মৃত্যু একটি দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রোগের কারণ (Causes of diseases)

অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মাছের শরীরের ইমিউন সিস্টেম রোগ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই ইমিউন সিস্টেম পানিতে বিদ্যমান রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে মাছকে সুস্থ থাকতে সাহায্য করে। প্রজাতির ওপর ভিত্তি করে মাছের ইমিউন সিস্টেমের বিভিন্ন অংশগুলো গঠিত ও সক্রিয় হতে ডিম থেকে রেণু হওয়ার পর আরও ৪ থেকে ৮ সপ্তাহ সময় লাগে। হ্যাচারি ও নার্সারিতে পোনা এমনিতেই অত্যন্ত চাপের মধ্যে থাকে ফলে তাদের অপরিপক্ব ইমিউন সিস্টেমের জন্য খুব সহজেই তারা রোগে আক্রান্ত হতে পারে। রোগের প্রকৃতি ও তীব্রতার ওপর ভিত্তি করে পোনার মড়ক এবং সর্বোপরি তাদের গুণগত মান কমে যেতে পারে। রোগাক্রান্ত হ্যাচারি থেকে যে সমস্ত পোনা চাষের পুকুরে ছাড়া হয় তারা সেখানে রোগজীবাণু বহন করে নিয়ে যায় এবং মজুদকৃত মাছের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। নিম্নে মাছের হ্যাচারি ও নার্সারিতে সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু রোগ, এর কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

পরজীবীঘটিত রোগ (Parasitic diseases)

ইকথায়োপথিরিয়াসিস (Ichthyophthiriasis): *Ichthyophthirius multifiliis* নামক এককোষী পরজীবী এ রোগ ঘটায়। এটিকে সাদাদাগ রোগও বলা হয়ে থাকে। এককোষী পরজীবীর দ্বারা সংঘটিত রোগের মধ্যে এটি খুবই মারাত্মক রোগ। কার্পজাতীয় মাছের আঙ্গুলে পোনার ক্ষেত্রে এ রোগের সংক্রমণের তীব্রতা বেশি হয়। এ রোগের ফলে মাছের ত্বক, পাখনা ও ফুলকায় বিন্দুর মত সাদা দাগ দেখা যায়। আক্রান্ত পোনার গায়ের পিচ্ছিল আবরণ কমে যায়। পুকুরে অতিরিক্ত সংখ্যায় পোনা মজুদ এ রোগের একটি অন্যতম সহায়ক কারণ। এ রোগ সাধারণত গরমকালে হয়। পরজীবীটি দেখতে অনেকটা গোলাকৃতির এবং এর চারিদিক সিলিয়া দ্বারা আবৃত থাকে। অশ্ব ক্ষুরাকৃতি নিউক্লিয়াস দেখে এই পরজীবীটি সহজেই শনাক্ত করা যায়। এ রোগ প্রতিরোধে প্রথমেই বলা যায় আক্রান্ত পুকুরে পোনা না ছাড়া। তবে যদি পুকুর আক্রান্ত হয়েই যায় দ্রুত পরজীবী শনাক্ত করে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে। ম্যালাকাইট গ্রীন, পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট বা পটাশ এবং সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্বারা এ রোগের চিকিৎসা করা যায়। আক্রান্ত মাছকে শতকরা ২.৫ ভাগ লবণ পানিতে কয়েক মিনিটের জন্য রেখে বা ম্যালাকাইট গ্রীনের ০.১৫-০.২০ পিপিএম দ্রবণে মাছকে প্রতিদিন ১ ঘণ্টা করে ২-৩ দিন গোসল করালে ভাল ফল পাওয়া যায়।

ট্রাইকোডিনিয়াসিস (Trichodiniasis): এটি একটি এককোষী সিলিয়াযুক্ত পরজীবী *Trichodina* sp. দ্বারা সংঘটিত রোগ। এ রোগ কার্প, ক্যাটফিস ও তেলাপিয়া মাছের পোনার ব্যাপক মৃত্যু ঘটাতে সক্ষম। ধানী পোনা ও আঙ্গুলে পোনার ক্ষেত্রে এ রোগের প্রকোপ বেশি দেখা যায়। আক্রান্ত মাছের স্পর্শে এবং পানির মাধ্যমে এ রোগ ছড়ায়। মে থেকে আগস্ট মাসের মধ্যে এ রোগ বেশি দেখা দেয়। অপেক্ষাকৃত ছোট ও অগভীর জলাশয়ে এবং পানির গুণাগুণ খারাপ হলে এ রোগের দ্রুত সংক্রমণ ঘটে থাকে। নার্সারি পুকুরে মাত্রাতিরিক্ত পোনা মজুদ

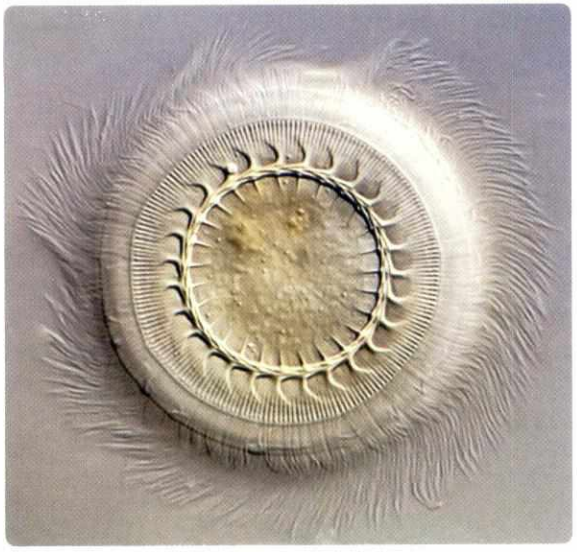

চিত্র: *Trichodina* sp.

এ রোগের একটি সহায়ক কারণ। আক্রান্ত পোনার শরীরে অধিক বিজল দেখা দেয়, ফুলকায় রক্তক্ষরণ হয়, খাদ্য গ্রহণে অনীহা দেখায় এবং দেহের বিভিন্ন অংশে গোলাকার হলদে দাগ দেখা য়ায। মাছ দ্রুত ও অবিশ্রান্তভাবে চলাফেরা করতে থাকে এবং আক্রান্ত পোনা দ্রুত মারা যায়। এ রোগ প্রতিরোধের প্রধানতম উপায় হল পানির গুণাগুণ বৃদ্ধিকরণ এবং পোনার ঘনত্ব কমানো। ফরমালিন, সোডিয়াম ক্লোরাইড অথবা পটাশ প্রয়োগ করে এ রোগের চিকিৎসা করা যায়। আক্রান্ত মাছকে ২৫০ পিপিএম ফরমালিনে ৩-৫ মিনিট গোসল দেয়া অথবা পুকুরে ৪ পিপিএম হারে পটাশ প্রয়োগ করা যেতে পারে। এছাড়া মাছকে শতকরা ২-৩ ভাগ লবণ পানিতে কয়েক মিনিটের জন্য গোসল দেয়া যেতে পারে।

মিক্সোসস্পরিডিয়াসিস (Myxosporidiasis): মিক্সোবোলাস গণের কয়েকটি প্রজাতির সংক্রমণে এ রোগ সৃষ্টি হয়। পরজীবীগুলোর পূর্ণবয়স্ক স্পোর এ রোগের মূল কারণ। সাধারণত কার্প জাতীয় মাছের পোনায় এ রোগ দেখা যায়। রোগজীবাণু মাছের ফুলকা, মাংশপেশী, পাখনা, পায়ুপথ ইত্যাদিতে সংক্রমণ ঘটিয়ে রোগ সৃষ্টি করে। *Myxosoma cerebralis* এর আক্রমণে পোনা ঘুর্ণায়মানভাবে সাঁতার (whirling swimming) কাটে। *Myxoboler pfeiffteri* এবং *Myxobolus piriformis* এর আক্রমণে দেহের উপরিভাগে ফোড়া বা সিস্টের মত হতে পারে। আক্রান্ত মাছকে পুকুর থেকে সরিয়ে ফেলা এবং পুকুর জীবাণুমুক্তকরণ হলো এ রোগ নিয়ন্ত্রণের সর্বোত্তম উপায়। মহুয়া খৈল দ্বারা চিকিৎসা করলে ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে। এছাড়া প্রতি শতক জলাশয়ে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করলে পানির গুণাগুণ বৃদ্ধি পেয়ে অম্লত্ব দূর হয়। পরজীবীগুলো ক্রমান্বয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং মাছ নিষ্কৃতি লাভ করে। শতকরা ৩-৫ ভাগ লবণ দ্রবণ এ পরজীবীগুলোর স্পোর ও জীবনচক্রের প্রাথমিক স্তর ধ্বংস করতে সক্ষম।

কৃমিজাতীয় রোগ (Worm diseases): এই পরজীবীগুলো মূলত মাছের ত্বক, ফুলকা ও পাখনায় আক্রমণ করে। *Dactylogyrus* spp. ফুলকা কৃমি নামে এবং *Gyrodactylus* spp. ত্বক কৃমি নামে পরিচিত। এদের শরীরের অত্যন্ত সুগঠিত হেপ্টর ও খাবার খাওয়ার বিশেষ অঙ্গের সাহায্যে এরা মাছের শরীরে প্রচুর ক্ষতের সৃষ্টি করে ও মাছের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। ফুলকা কৃমির আক্রমণে মাছ ঘন ঘন শ্বাস নেয়, ফুলকা বড় হয়ে ফুলে ও ফ্যাকাসে বর্ণের হয়ে যায়। নার্সারি পুকুরে হলে রোগ দ্রুত বাড়তে থাকে। অন্যদিকে কৃমির আক্রমণে ত্বক ফ্যাকাসে বর্ণের হয়ে যায়, বিজল বেশি হয়, ত্বকে বিন্দু বিন্দু রক্ত ক্ষরণ হয় এবং রোগ বেড়ে গেলে মাছের আঁইশ পড়ে যায়। কার্প জাতীয় মাছের ৪-৫ গ্রাম ওজনের পোনায় এ রোগের প্রকোপ বেশি দেখা যায়। সংক্রমণের তীব্রতা বেশি হলে এ রোগে পোনার ব্যাপক মড়ক দেখা দেয়। পটাশ ও ফরমালিন দ্বারা এই রোগের চিকিৎসা করা যায়। এছাড়া *Diplostomus* spp. নামক এক প্রকার মনোজিনিয়ার মেটাসারকারিয়াল লার্ভার আক্রমণে কার্প জাতীয় মাছের পোনার কালো দাগ রোগ হয়। আক্রান্ত পুকুরের শামুক (পরজীবীর জীবনচক্রের ১ম পোষক) এবং জলজ পাখির (শেষ পোষক) নিয়ন্ত্রণ করে কালো দাগ রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। কৃমিজাতীয় পরজীবীঘটিত রোগের চিকিৎসার জন্য আক্রান্ত মাছকে ২৫০ পিপিএম ফরমালিন দ্রবণে মাছকে গোসল করালে ভাল ফল পাওয়া যায়। এছাড়াও আক্রান্ত পুকুরে ১০-২০ পিপিএম হারে পটাশ প্রয়োগ করা যেতে পারে।

উঁকুনজনিত রোগ (Crustaceans diseases): এ জাতীয় পরজীবী মাছের পোনা, আঙ্গুলে পোনা ও বড় মাছ সব ধরনের মাছের ক্ষতি করে থাকে। নার্সারি পুকুর, লালন পুকুর ও মজুদ পুকুরে এ জাতীয় পরজীবীর সংক্রমণ ঘটে। এপ্রিল থেকে অক্টোবর মাসে এদের প্রকোপ বেশি ঘটে থাকে। বহুকোষী পরজীবী ক্রাস্টাশিয়া দ্বারা সংঘটিত অন্যতম প্রধান রোগ হলো আরগুলোসিস (Argulosis)। এটি *Argulus* spp. নামক পরজীবী দ্বারা হয়। এই পরজীবীকে মাছের উঁকুনও বলা হয়। এদের অত্যন্ত সুগঠিত লেগে থাকার অঙ্গ ও মুখ দ্বারা মাছের শরীর আটকে থাকে এবং সেখানে ক্ষত সৃষ্টি করে ও খাবার খায়। পরে ক্ষত স্থানে বিভিন্ন প্রকার ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আবার আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত পোনা অস্থির হয়ে দ্রুত ও

চিত্র: মাছের উকুন (*Argulus* spp.)

অবিশ্রান্তভাবে সাঁতার কাটতে থাকে এবং পরজীবীর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য শক্ত কিছুর সাথে গা ঘঁষতে থাকে। মাছের দেহ ক্ষীণ হয়ে যায় ও বৃদ্ধি হ্রাস পায়। এ রোগ প্রতিরোধের উপায় হচ্ছে পুকুরে পরজীবীটিকে প্রবেশ করতে না দেয়া। তাছাড়া আক্রান্ত পুকুরে বাঁশের খুঁটি পুঁতে রাখা যেতে পারে যেখানে পরজীবী ডিম পারবে এবং এগুলো কিছুদিন পরপর তুলে এনে রোদে শুকিয়ে ডিমগুলো মেরে আরগুলোসিস নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। আক্রান্ত পুকুরে ০.৫ পিপিএম হারে ডিপ্টারেক্স সপ্তাহে একবার করে ৫ সপ্তাহ পর্যন্ত প্রয়োগ করা যায় অথবা সুমিথিয়ন ০.৮ পিপিএম হারে একই সময়ের জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে। এছাড়াও পটাশ ও ফরমালিন প্রয়োগেও আরগুলোসিস এর চিকিৎসা করা যায়।

আরেক ধরনের পরজীবী ক্রাস্টাসিয়া *Lernea* spp. লারনিয়াসিস (Lernaesis) রোগ সৃষ্টি করে। এদের দেহের অগ্রভাগে নোঙ্গর জাতীয় এক ধরনের উপাঙ্গ এবং শেষভাগে ডিম্বথলি থাকে। এ নোঙ্গরের সাহায্যে মাছের শরীরে গভীর গর্ত করে দেহের রস পান করে। নার্সারি পুকুরে কার্প জাতীয় মাছের আঙ্গুলি পোনা এদের আক্রান্ত হয়। এরা প্রধানত ফুলকার গোড়ায় সংক্রমণ করে। তবে সারা দেহেই সংক্রমণ বিস্তার লাভ করতে পারে। ক্ষত স্থানে পরবর্তীতে ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের আক্রমণ হতে পারে। ৪ পিপিএম পটাশ দ্বারা এ রোগের চিকিৎসা করা যেতে পারে অথবা ৩০ শতাংশ লবণে দ্রুত গোসলের পর ০.২ শতাংশ লবণে দীর্ঘ সময় গোসল করিয়ে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

ছত্রাকজনিত রোগ (Fungal diseases)

ছত্রাকজনিত রোগ মাছের ডিম ও রেণুর একটি প্রধান রোগ। সাধারণত ডিম স্ফুটন এবং রেণু অবস্থায় সকল স্বাদুপানির মাছেরই বহিঃছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। অধিকাংশ জলজ ছত্রাকই স্যাপ্রোফাটিক এবং এরা পচনশীল জৈব পদার্থ থেকে খাবার সংগ্রহ করে। এরা সাধারণত প্রাথমিক পর্যায়ের অথবা দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুপ্রবেশকারী। হ্যাচারিতে ডিম স্ফুটনের সময় ছত্রাকের সংক্রমণ মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি করে। প্রথমে ছত্রাকগুলো মৃত ও অনিষিক্ত ডিমগুলোর উপর বাসা বাঁধে এবং আস্তে আস্তে সুস্থ সবল ডিমগুলোর দিকে ছড়িয়ে গিয়ে একটি ব্যাচের সমস্ত ডিমগুলোকে ধ্বংস করে দিতে পারে। পরিবেশগত পীড়নে অথবা ব্যাকটেরিয়া বা পরজীবীর সংক্রমণে মাছের দেহে ক্ষত সৃষ্টি হলে উক্ত ক্ষতে ছত্রাকের সংক্রমণ সহজ হয়। একটানা বৃষ্টির সাথে স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া হ্যাচারিতে ছত্রাকজনিত রোগ বিস্তারে সহায়তা করে। স্যাক্রোলেগনিয়াসিস বা কটন উল একটি পরিচিত ছত্রাকজনিত রোগ যেটি *Saprolegnia* spp. দ্বারা সংঘঠিত হয়। কার্প জাতীয় মাছের ডিম, পোনা ও আঙ্গুলি পোনা এ ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত মাছ বা ডিমে মিহি সাদা সুতার মত উজ্জ্বল বস্তু দেখে এ রোগ সহজেই চেনা যায়। পানির গুণাগুণ নষ্ট হয়ে গেলে এবং পানিতে অত্যধিক জৈব পদার্থ যেমন মরা ডিম বা ডিমের খোসা থাকলে এই রোগ সহজেই সংক্রমিত হয়। ডিম ধৌত করে, নষ্ট এবং

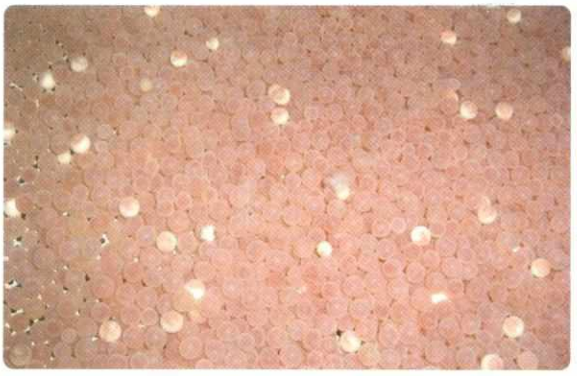

চিত্র: ছত্রাক আক্রান্ত মাছের ডিম

অনিষিক্ত ডিমগুলো সরিয়ে, পানির প্রবাহ বাড়িয়ে এবং ডিমের ঘনত্ব কমিয়ে হ্যাচারিতে এ রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। ম্যালাকাইট গ্রীণ হচ্ছে ছত্রাকজনিত রোগের সবচেয়ে উত্তম চিকিৎসা। পটাশও ব্যবহার করা যেতে পারে। হ্যাচারিতে লালনকৃত ডিমগুলোকে ২৫০ পিপিএম ফরমালিন দিয়ে ধৌত করা অথবা আক্রান্ত মাছগুলোকে শতকরা ৩-৫ ভাগ ফরমালিন দিয়ে ২-৩ মিনিট গোসল দেয়া যেতে পারে। অথবা ম্যালাকাইট গ্রীন ০.১৫-০.২০ পিপিএম হারে পুকুরে প্রতি সপ্তাহে একবার করে ২-৩ সপ্তাহ পর্যন্ত প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায় অথবা মিথিলিন ব্লু ০.১০-০.১৫ পিপিএম দ্বার আক্রান্ত পোনা অথবা ডিম ধৌত করালে অথবা দ্রবণে ১ থেকে ২ বার গোসল করালে প্রতিকার পাওয়া যায়।

চিত্র: ছত্রাক আক্রান্ত মাছের ডিম

ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ (Bacterial diseases)

বিভিন্ন প্রকার ব্যাকটেরিয়া যেমন- motile, Aeromonas, Pseudomonas, Vibrio অনেক সময় মাছের হ্যাচারি ও নার্সারির পোনার মৃত্যু ঘটিয়ে থাকে। এ সমস্ত ব্যাকটেরিয়া হয় প্রাথমিক রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু হিসেবে অথবা সুবিধাবাদী সেকেন্ডারি অনুপ্রবেশকারী জীবাণু হিসেবে রোগ সৃষ্টি করে। বহিঃক্ষত যেমন লেজ পচা এবং পাখনা পচা জাতীয় রোগগুলো সাধারণত উল্লিখিত বিভিন্ন প্রজাতির জীবাণু দ্বারা সংঘটিত হয়। এই জাতীয় রোগ এক সময় সমস্ত শরীরের অভ্যন্তরীণ

অঙ্গে ছড়িয়ে যেতে পারে এবং কম সময়ে মাছের ব্যাপক মৃত্যুর কারণ হতে পারে। কার্প জাতীয় মাছের পোনার জন্য *Aeromonas hydrophila* ঘটিত ব্যাকটেরিয়াল হেমোরেজিক সেপটিসেমিয়া একটি মারাত্মক সমস্যা। পানির গুণাগুণ নষ্ট হওয়া, জৈব দূষণ, তাপমাত্রার উঠানামা এবং অধিক মজুদ ঘনত্ব মাছের পোনাকে সহজেই ব্যাকটেরিয়া রোগের সংক্রমণ ঘটতে সাহায্য করে। এছাড়া *Aeromonas hydrophila* কার্প জাতীয় মাছের আঙ্গুলি পোনার পেট ফোলা রোগের জন্য দায়ী। *Edwardsiella ictaluri* পাঙ্গাস মাছে বেসিলারি নেক্রোসিস অব পাঙ্গাসিয়াস (bacillary necrosis of Pangasius) নামক রোগ সৃষ্টি করে। এ রোগ সব বয়সের মাছকে সংক্রমণ করলেও পোনার ক্ষেত্রে মৃত্যু অনেক বেশি হয়। ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ বিশেষ করে পোনার পেট ফোলা রোগের জন্য আক্রান্ত পুকুরে ৫ পিপিএম হারে পটাশ প্রয়োগ করা যেতে পারে অথবা খাবারের সাথে অক্সিটেট্রাসাইক্লিন ৫০-৬০ মিগ্রা/প্রতি কেজি মাছের ওজনের জন্য ১০ দিন পর্যন্ত দিতে হবে। এ ঔষধ ব্যবহারের ২৫ দিনের মধ্যে মাছ আহরণ না করাই শ্রেয়।

ভাইরাসজনিত রোগ (Viral diseases)

কার্প, তেলাপিয়া ও ক্যাটফিস মাছের পোনার ভাইরাস রোগের প্রাদুর্ভাব সম্বন্ধে খুব কম তথ্য পাওয়া যায়। গ্রাস কার্প হেমোরেজিক ভাইরাস (grass carp hemorrhagic virus) চাইনিজ কার্পের পোনার মৃত্যুর জন্য দায়ী। এছাড়া কৈ হারপিস ভাইরাস (koi herpes virus) নামক এক ধরনের ভাইরাস কমন কার্প ও কৈ কার্পের রোগ সৃষ্টি করে। যে কোনো বয়সের মাছের এ রোগে আক্রান্ত হলেও পোনার মৃত্যুহার অনেক বেশি হয়। ভাইরাসজনিত রোগের কোনো চিকিৎসা নেই। উত্তম পরিচ্ছন্নতা এবং জৈবনিরাপত্তা (biosecurity) পদ্ধতি অনুসরণই হচ্ছে ভাইরাসজনিত রোগ প্রতিরোধের প্রধান উপায়।

পরিবেশজনিত রোগ (Environmental mediated diseases)

পুকুরে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন নামক গ্যাসের অতিমাত্রায় দ্রবণ এবং পুকুরের তলায় অত্যধিক জৈব পদার্থ থাকলে মাছের পোনা গ্যাস বাবল রোগে আক্রান্ত হতে পারে। কার্প জাতীয় মাছের পোনার পুকুরে নীল সবুজ শৈবালের (*Microcystis* ও *Anabaena* spp.) উপস্থিতিতে বিষাক্ত পরিবেশের সৃষ্টি। হতে পারে। নার্সারি পুকুরে মাঝে মধ্যে হাঁসপোকার আক্রমণ দেখা যায়। এছাড়াও হ্যাচারিতে অজানা কারণে অনেক সময় ব্যাপক হারে রেণু ও পোনার মৃত্যু হতে পারে। কোনো কোনো সময় অত্যধিক ঠাণ্ডায় বা কোল্ড শকের মাধ্যমে এবং অক্সিজেন স্বল্পতায় অনেক সময় সদ্য প্রস্ফুটিত রেণুর হঠাৎ ব্যাপক মৃত্যু হতে পারে।

রোগ প্রতিরোধের জন্য করণীয় (Disease prevention)

মাছের হ্যাচারি ও নার্সারিতে রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম্নলিখিত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে :

- গুণগুত মানসম্পন্ন, পর্যাপ্ত অক্সিজেনসমৃদ্ধ এবং দূষণ ও রোগজীবাণুমুক্ত পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;
- রোগের প্রতিরোধ এবং বিস্তার রোধে জৈবনিরাপত্তা (bio security) পদ্ধতি অনুসরণ;
- উৎপাদনের শুরুতে এবং উৎপাদন চক্রের মাঝে সমস্ত হ্যাচারি ইউনিট এবং সরঞ্জামাদি পরিষ্কার এবং ব্লিচিং পাউডার দিয়ে জীবাণুমুক্তকরণ;
- নার্সারি পুকুর ও ব্রুড রাখার পুকুর নিয়মিত জীবাণুমুক্তকরণ;
- আমদানিকৃত সমস্ত ডিম, পোনা অথবা ব্রুড জীবাণুমুক্তকরণ;
- নিষিক্ত ডিম ও পোনাগুলোকে সঠিকভাবে জীবাণুমুক্তকরণ;
- পোনাকে খুব সতর্কতার সাথে নাড়াচাড়া করা;
- মৃত এবং অসুস্থ মাছ দেখা মাত্র সরিয়ে ফেলা;
- মাছ খাদক রাক্ষুসে প্রাণী বিশেষ করে পাখি এবং স্তন্যপায়ী প্রাণী নিয়ন্ত্রণ করা;
- সাধারণের প্রবেশাধিকার সীমিত করা এবং প্রবেশ পথে ফুটপাথ (footpath) ব্যবহার করা;
- সর্বদা সুষম ও জীবাণুমুক্ত খাদ্য সরবরাহ করা। খাবারগুলো সঠিকভাবে ঠাণ্ডা ও শুকনো জায়গায় সংরক্ষণ করা;
- রোগের চিকিৎসার জন্য যথেচ্ছা ড্রাগ ব্যবহার না করা;
- শুধুমাত্র অনুমোদিত ড্রাগ নির্দিষ্ট পরিমাণে, মাত্রায় ও যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করে ব্যবহার করা; এবং
- হ্যাচারি ও নার্সারি কার্যক্রমের সকল রেকর্ড যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করা।

উপসংহার (Conclusion)

বর্তমানে রেণু উৎপাদনের প্রায় ৯৯ শতাংশ রেণু আসে হ্যাচারি থেকে। নার্সারিতে উৎপাদন হচ্ছে ৮২ হাজার লক্ষের অধিক পোনা। হ্যাচারি ও নার্সারিতে উৎপাদিত রেণু/পোনা রোগ ব্যাধি মুক্ত রাখতে পারলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির গতি অব্যাহত রাখা সম্ভব। রোগ ব্যাধি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই সর্বোত্তম পন্থা হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

প্রফেসর, অ্যাকোয়াকালচার বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ (hasin96@yahoo.com)

মাছের উচ্ছিষ্টাংশ ব্যবহারের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা

Fisheries Waste and its Probable Commercial Utilization

এস এম ইসতিয়াক

Abstract

Present fish production of Bangladesh is more than 3.26 million metric tons of which 2.2 metric tons (70%) are using for human consumption and rest of 1.0 million metric tons (30%) are discarding as wastes or by-products in terms of fins, scale, tails, guts, shell, bone, skull, viscera, etc. The major ingredient of fish feed is fish meal that can be produced using wastes. Simultaneously, other essential and costly value added products like fish oil, omega -3 enriched tooth paste, liver oil, vitamin premix, ladies purse, binder, gelatin, cosmetics, flavor, glucosamine, etc can be produced from by-products like head, collarbone, cut-off, skin, backbone, roe, milt, liver, bile, viscera, cheeks and tongue, shell etc. The processing of by-products is more profitable to be higher than for food fish production. Bangladesh has ample of opportunity to utilize the fisheries by-products through proper.

জলজ সম্পদের প্রাচুর্যে ভরপুর বাংলাদেশের ১৬ কোটি মানুষের সুস্বাস্থ্য রক্ষায় মাছ হচ্ছে গ্রহণকৃত আমিষের একমাত্র সাশ্রয়ী উৎস। প্রায় ৪৭.০৫ লক্ষ হেক্টর অভ্যন্তরীণ ও বিস্তীর্ণ সামুদ্রিক জলসম্পদ থেকে গত ২০১১-১২ সালে উৎপাদিত হয়েছে ৩২.৬২ লক্ষ মে.টন মাছ। বাংলাদেশের মৎস্য উৎপাদনের মোটামুটি ৩টি বড় উৎস যথা- লোনাপানির থেকে আহরণ, স্বাদুপানি থেকে আহরণ এবং চাষের মাধ্যমে উৎপাদন। উৎপাদিত বিপুল পরিমাণ মাছের কতটুকু আমরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করছি? গড়ে একটি মধ্যম আকৃতির মাছের প্রায় শতকরা ৭০-৭৫ ভাগ মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয় যার মধ্যে প্রায় শতকরা ৪৫ ভাগ মাংসল অংশ থাকে (গানারসন, ২০১৩)। বাকী শতকরা ২৫-৩০ ভাগ যেমন আঁইশ, পরিপাকতন্ত্র, পাখনা, কাঁটা, চিংড়ির মাথা ও খোসা বর্জ্য আকারে ফেলে দেয়া হয় (Nnali and Oke, ২০১৩)। বাংলাদেশে বর্তমানে ৩৮টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রলার সমুদ্র থেকে চিংড়ি আহরণে নিয়োজিত। এসব ট্রলারে চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণের সব ব্যবস্থা আছে। চিংড়ির মাথা ছাড়ানোর পর প্রায় শতকরা ৩০-৩৫ ভাগ উপজাত (by-products) ট্রলার থেকে সমুদ্রে ফেলে দেয়া হয় যার পরিমাণ বছরে ৩-৪ হাজার মে.টন। এছাড়া ছোট আকৃতির এবং আহরণজনিত পীড়ন ও আহরণপরবর্তী অব্যবস্থাপনার কারণে নষ্ট হয়ে যাওয়া মাছগুলোও ক্ষেত্র বিশেষে সমুদ্রে ফেলে দেয়া হয় - যার পরিমাণও বছরে ৩-৪ হাজার মে.টন (ট্রলার এর স্কীপারদের তথ্য মতে)-এর কম হবে না। নাগরিক জীবনের উন্নয়নের সাথে সাথে মানুষের জীবনযাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে, বেড়েছে সব ধরনের পণ্য প্রাপ্তির সুযোগ আর বাড়ছে জীবনযাত্রার ব্যয়। সময় ও জীবনযাত্রার অগ্রযাত্রার সাথে সাথে মাছের বাজারগুলোতে বিশেষ করে শহরের মাছের বাজারগুলোতে গড়ে উঠেছে মাছ কাটাকুটির জন্য এক বিশেষ পেশাজীবী সম্প্রদায় যারা ক্রেতাকে মাছ কেটে দেয় এবং মাছের উচ্ছিষ্টাংশ ফেলে দেয় কোনো ভাগাড়ে বা জলাশয়ে যা পরিবেশ দূষণের জন্য একটি প্রত্যক্ষ কারণও বটে। বাংলাদেশে উৎপাদিত শতকরা ৭০-৮০ ভাগ মাছের উচ্ছিষ্টাংশ প্রক্রিয়াজাত করে বাজারজাতকরণের ব্যাপক সুযোগ বিদ্যমান।

মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার্য অংশ ও উচ্ছিষ্টাংশ
(Direct consumable and by-products of a Fish)

মোটামুটি একটি বড় আকৃতির মাছের শতকরা ৪৫ ভাগ হয় মাংসল অংশ, শতকরা ২৪-২৭ ভাগ মাথা, শতকরা ১২ ভাগ কঙ্কাল, ডিম-যকৃৎ-মিল্ট-পরিপাকতন্ত্র মিলে শতকরা ১২ ভাগ,

চিত্র: মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার্য অংশ ও উচ্ছিষ্টাংশ

কাট অফ শতকরা ৪ ভাগ ও চামড়া শতকরা ৩ ভাগ (গানারসন, ২০১৩)। আমাদের দেশে মানুষ সরাসরি একটি মাছের শতকরা ৪৫ ভাগ মাংসল অংশসহ সর্বোচ্চ শতকরা ৭০ ভাগ অংশ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে।

মাছের মাংসল অংশ অপেক্ষা উচ্ছিষ্টাংশ লাভজনক
(By-products profitable than a edible flesh)

ইউরোপের একটি ছোট দ্বীপ রাষ্ট্র হলো আইসল্যান্ড যারা সরাসরি একটি মাছ বিক্রি করে যা আয় করে তার থেকে সে মাছের বিভিন্ন উপজাত থেকে ৮০০ গুণ বেশি আয় করে। ধরা যাক, একটি আস্ত বড় আকৃতির মাছের মূল্য ১১৫ ডলার। যখন সেই মাছটি থেকে মাংসল অংশ (ফিলেট) আলাদা করা হয়। তখন ফিলেট/মাংসল অংশ থেকে আয় হয় ৪৯.৪৫ ডলার (৪৩%), মাথা প্রক্রিয়াজাতের মাধ্যমে ২৭.৬০ ডলার (২৪%), মেরুদণ্ডের কাঁটা প্রক্রিয়াজাত করে ১৩.৮০ ডলার (১২%), কাট-অফ থেকে ৬.৯০ ডলার (৬%), লিভার প্রক্রিয়াজাতের মাধ্যমে ৫.৭৫ ডলার (৫%), ভিসেরা ৫.৭৫

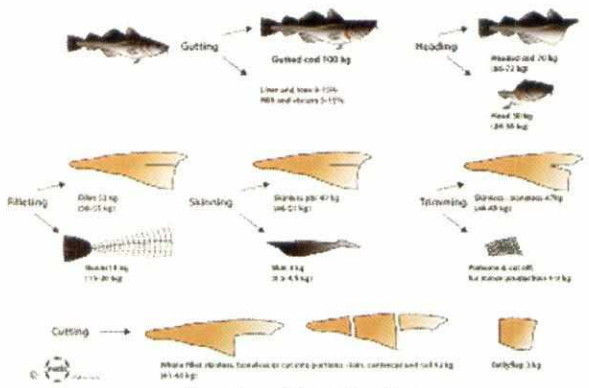

চিত্র: মাছের বিভিন্ন উচ্ছিষ্টাংশ

ডলার (৫%), চামড়া প্রক্রিয়াজাত করে ৩.৪৫ ডলার (৩%), ডিম এবং মিল্ট প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে ২.৩০ ডলার (২%) যা সাকুল্যে ১১৫ ডলার।

মাছের উচ্ছিষ্টাংশ প্রক্রিয়াজাত করে ফিসমিল উৎপাদন
(Fish meal production from fish by-products)

বাংলাদেশে বিগত ২০১০-১১ আর্থিকসালে মোট উৎপাদিত মাছের প্রায় শতকরা ৪৭.৭১ ভাগ অর্থাৎ ১৪,৬০,৭৬৯ মে.টন এসেছে চাষের মাধ্যমে। প্রতি কেজি মাছ উৎপাদনের জন্য (সনাতন ও আধা নিবিড়সহ) গড়ে ১ কেজি খাদ্য ব্যবহার হিসেবে ১৪,৬০,৭৬৯ মে.টন মৎস্যখাদ্য ব্যবহৃত হয়েছে। আর এ পরিমাণ মৎস্যখাদ্য তৈরিতে মোটামুটি ২,৯২,০০০ মে.টন ফিসমিল (শতকরা ২০ ভাগ হারে) ব্যবহার করা হয়েছে যার বাজার মূল্য প্রায় ১৬০০ কোটি টাকা (প্রতি কেজি ৫৫ টাকা হারে)। অপরদিকে, বাংলাদেশে বছরে উৎপাদিত মাছের কমপক্ষে শতকরা ২৫-৩০ ভাগ অর্থাৎ প্রায় ৯-১০ লক্ষ মে.টন উচ্ছিষ্টাংশ অপচয় হয়। সমুদ্র থেকে আহরিত মাছ হতে বিগত ২০১০-১১ আর্থিকসালে ৬২৩ মে.টন শুটকি এবং ৫৭৬ মে.টন লবণাক্ত ও পানিশূন্য মাছ রপ্তানি করা হয়। এ পরিমাণ মাছ থেকেও শত শত টন উপজাত তৈরি করা সম্ভব, যা সঠিক

চিত্র: ফিস মিল উৎপাদন কারখানা

ব্যবহারের অভাবে অপচয় হচ্ছে। একটি মৎস্য খাদ্য প্রক্রিয়াজাত কারখানা প্রতি ৪/৫ কেজি উচ্ছিষ্টাংশ প্রক্রিয়াজাত করে ১ কেজি ফিসমিল উৎপাদন করে। এতে ৯-১০ লক্ষ মে.টন উচ্ছিষ্টাংশ দিয়ে প্রায় ২ লক্ষ মে.টন ফিসমিল উৎপাদন সম্ভব যা প্রতি কেজি ৫৫ টাকা মূল্যে ১,১০০ কোটি টাকা বিক্রি করা সম্ভব। প্রতিবছর কমপক্ষে ১,৮০০-২,০০০ কোটি টাকার নিম্নমানের মিট এন্ড বোনমিল কৃষি জমির সার হিসেবে ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে আমদানি করা হয়, যা পরবর্তীতে মাছের খাদ্য প্রস্তুতিতে ব্যবহার করা হয়। এরূপ নিম্নমানের মিট এন্ড বোনমিলে বিভিন্ন ধরনের দূষক পদার্থ ও জীবাণু থাকে, যা মাছের রোগ সৃষ্টিসহ মাংসল অংশের গুণগত মান ক্ষতিগ্রস্ত করে থাকে।

মাছের উচ্ছিষ্টাংশের বর্তমান ব্যবহার
(Present uses of by-products)

বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মাছের বিভিন্ন অংশ সঠিকভাবে প্রক্রিয়াজাত করে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য ছাড়াও উচ্চ গুণাগুণ সম্পন্ন ভিটামিন, রক্তে কলেস্টরল কমানোর জন্য ওমেগা-৩ ক্যাপসুল, দাঁতের ক্যাভিটি রোধে ওমেগা-৩ পেইস্ট, সানস্ক্রিন ক্রিম, কসমেটিক্স, হাড়ের ক্ষয় রোধের ঔষধ, গ্লুকোসায়ামিন, সুগন্ধি, লেডিস পার্টস, বেল্ট, জ্যাকেট, জিলাটিন, অপারেশনের সুতা, বার্ণিশ, বায়োগ্যাস ও ফিসমিলসহ বিভিন্ন

চিত্র: চিংড়ির খোসা থেকে হাড়ের ক্ষয় রোধের ঔষধ

সামগ্রী তৈরি করা হচ্ছে। এছাড়া মাছের থুতনি ও পেটের মাংসল অংশের স্বাদ বেশি হওয়ায় আলাদাভাবে বেশি মূল্যে বিক্রয় করা যায়। কিছু কিছু মাছের মাথা শুকিয়ে চূর্ণ করে দামি স্যুপ তৈরি করা হয়। এভাবে মাছের উচ্ছিষ্টাংশের মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে চীন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব।

চিত্র: বাংলাদেশী মাছের মূল্যবান উপজাত

সাম্প্রতিক সমীক্ষা (Recent studies)

মৎস্য অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ শ্রিম্প এন্ড ফিস ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় ইউএন বিশ্ববিদ্যালয় ও ম্যাটিস (MATIS) এর গবেষক দল বিগত ১১-১৬ মে, ২০১৩ চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও ময়মনসিংহ জেলায় অবস্থিত সামুদ্রিক ও স্বাদুপানির মাছের অবতরণ এবং আহরণপরবর্তী ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণের জন্য জরিপকার্য পরিচালনা করেন। জরিপ দলে ইউএন ইউনিভার্সিটির মৎস্য প্রশিক্ষণ শাখার কো-অর্ডিনেটর মিস মেরী ফ্রান্সিস ডেভিডসন এবং ম্যাটিস এর পরিচালক

চিত্র: বাংলাদেশী মাছের বাই প্রোডাটস্ট

ড. ওডর এম গানারসন, ড. গুডমুনডুর স্টেফানসান ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিইজিপি প্রতিনিধি। জরিপের তথ্য মতে বাংলাদেশে প্রতি বছর যে পরিমাণ মৎস্য আহরণপরবর্তী সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে নষ্ট হয় তা সঠিকভাবে প্রক্রিয়াজাত করে বিক্রি করলে বছরে ১৫-২০ হাজার কোটি টাকা আয় সম্ভব। মাছের উচ্ছিষ্টাংশ ব্যবহারে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা না থাকায় স্থাপিত ফিসমিল কারখানা কাঁচামালের অভাবে উৎপাদন ক্ষমতার শতভাগ ব্যবহার করতে পারে না। এ ব্যাপারে সরকারি-বেসরকারি সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ অতি জরুরি। শহরের কাঁচাবাজার এবং মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা থেকে প্রতিদিন ফেলে দেয়া বিপুল পরিমাণ মৎস্য উপজাত

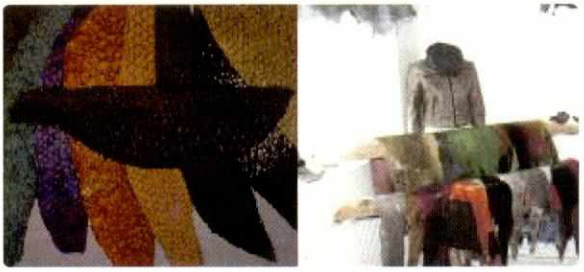

চিত্র: মাছের চামড়া থেকে প্রস্তুতকৃত ব্যবহার্য সামগ্রী

সঠিকভাবে সংগ্রহ করে ফিসমিল উৎপাদনে ব্যবহার করা হলে নিম্নমানের মিট এন্ড বোন মিল আমদানির চাপ কমবে। ১৯৮১থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত আইসল্যান্ডের মৎস্য শিল্পের উন্নয়ন সামান্য উত্থান পতনে একই সমান্তরালে ছিল। ২০০৩ সালে যখন আইসল্যান্ড সরকার সরাসরি মৎস্য শিল্পের উন্নয়নের জন্য পৃথক অর্থ বরাদ্দসহ ২০০৭ সালে ম্যাটিস এর সাথে যৌথভাবে কাজ শুরু করার পর উৎপাদন রেখাটি উর্ধ্বমুখী এবং ২০১০ সালে এসে ২০০৩ সাল থেকে শতকরা ৫৯ ভাগ প্রবৃদ্ধি লাভ করছে।

সুপারিশমালা ও উপসংহার
(Recommendations and Conclusions)

মাছের উচ্ছিষ্টাংশের মূল্য সংযোজন করে স্থানীয়ভাবে ব্যবহার ও রপ্তানির জন্য বাংলাদেশ একটি আদর্শস্থান। স্বল্প মজুরিতে শ্রমিক, সহজলভ্য কাঁচামাল এবং উদ্যোক্তাদের আগ্রহ এ শিল্প বিস্তারে মুখ্য ভূমিকা রাখবে। মাছের উচ্ছিষ্টাংশের বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য নিম্নে উল্লিখিত সুপারিশমালা প্রণিধানযোগ্য:

- মাছের উচ্ছিষ্টাংশের প্রজাতি ও প্রকৃতি অনুযায়ী পরিমাণ, উৎস, মাস অনুযায়ী উৎপাদন সম্পর্কে জানতে হবে;
- উচ্ছিষ্টাংশের যথার্থ রুট ম্যাপিং করতে হবে;
- বর্তমানে উচ্ছিষ্টাংশ কী কী কাজে এবং কোথায় ব্যবহার করা যায় তার জন্য উৎপাদিত পণ্যের বাজার সম্পর্কে জানতে হবে;
- উচ্ছিষ্টাংশের ব্যবহার সম্পর্কিত স্থানীয় ও রপ্তানিকৃত দেশের আইনগত বিষয়াদি পর্যালোচনা করতে হবে;
- উচ্ছিষ্টাংশ প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় উৎপাদিত বর্জ্য দ্বারা পরিবেশ অর্থাৎ মাটি, পানি ও বাতাস দূষণের সম্ভাবতা পরিমাপ করতে হবে এবং সেই মোতাবেক প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিতে হবে;
- আয়-ব্যয়ের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করতে হবে;
- মাছের উচ্ছিষ্টাংশের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে নীতি নির্ধারণী মহলকে উৎসাহিত করতে হবে;

চিত্র: আইসল্যান্ডের ফিস বাই-প্রোডাক্ট স্পেশালিস্টগণের বাংলাদেশ পরিদর্শন

- সরকারি-বেসরকারি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে;
- দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে হবে;
- প্রয়োজনে বিভিন্ন উৎপাদন উপকরণের উপর সরকারি পর্যায়ে ভর্তুকি ও প্রণোদনা সহযোগিতা প্রয়োজন; এবং
- সর্বোপরি সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে;

বর্ণিত সুপারিশমালার যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে মৎস্য খাদ্যের জন্য কাঁচামাল অর্থাৎ ফিসমিল আমদানির চাপ কমানোসহ মাছের উৎপাদন খরচ কমানো সম্ভব। ফলশ্রুতিতে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। পাশাপাশি যা মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্য হিসেবে রপ্তানি তালিকায় যুক্ত হবে।

অ্যাকোয়াকালচার কনস্যালট্যান্ট,বাংলাদেশ ইকোনমিক গ্রোথ প্রোগ্রাম প্রকল্প (smistiak@yahoo.com)

বাংলাদেশে উৎপাদিত মূল্য সংযোজিত চিংড়িপণ্যের পরিচিতি

An Introduction to Value added Shrimp Products of Bangladesh

মোঃ আমিন উল্লাহ

Abstract

Coastal waters of Bangladesh has immense potentials of producing brackish water Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon), Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii), Harina (Metapenaeus monoceros), Chaka (Penaeus indicus) etc. Bangladesh started export of shrimp after liberation in block frozen form. At the beginning of 90's, some packers were inspired to export value added products to Europe, USA, Japan and some other Asian countries are mostly comprised of 70% value added products. Value added products are of two kinds. One is ready to cook and another type is ready to eat i.e. cooked. Consumers of the first moving world as they prefers value added products is simultaneously paying at least 20-30% premium price that also generates additional employment opportunity in the industry.

'মূল্য সংযোজিত পণ্য' বিষয়টি এখন আর নতুন কিছুই নয়। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে মুল্য সংযোজিত পণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহার অনেক পূর্ব থেকেই হয়ে আসছে। বাংলাদেশেও এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। বাংলাদেশে যে সকল সেক্টর গত কয়েক যুগ ধরে মুল্য সংযোজিত পণ্য উৎপাদন করে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করে আসছে, তার মধ্যে হিমায়িত মৎস্যপণ্য অন্যতম। উন্নত দেশের ভোক্তা ব্যস্ততার কারণে, খাদ্যদ্রব্য কাটা, ধোয়া ও রান্নার ঝামেলায় না জড়িয়ে সরাসরি খাওয়ার উপযোগী পণ্য বেশি পছন্দ করে। তাই বর্তমানে প্রতিযোগী মার্কেটে টিকে থাকতে হলে মূল্য সংযোজিত পণ্য উৎপাদন ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। এ উপলব্ধিতে আশির দশক হতে বাংলাদেশে কিছু ব্যক্তি মালিকানাধীন হিমায়িত মৎস্য কারখানায় নিজ উদ্যোগে মূল্য সংযোজিত চিংড়ি পণ্য উৎপাদন শুরু হয়। বর্তমানে দেশের মোট মৎস্যপণ্য রপ্তানির প্রায় শতকরা ৭০ ভাগের অধিক মূল্য সংযোজন করে রপ্তানি করা হচ্ছে।

বাংলাদেশে চিংড়ি চাষে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও বিনিয়োগের অভাবে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ উৎপাদিত হচ্ছে না। তারপরও আমাদের রপ্তানি আয় দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। তার মূল কারণ মূল্য সংযোজিত পণ্য উৎপাদন। আমাদের দেশে স্বল্পমূল্যে শ্রম, বিদ্যুৎ ও মোড়ক সামগ্রী ব্যবহার করে মুল্য সংযোজিত পণ্য উৎপাদন ও তা রপ্তানির মাধ্যমে অধিক পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের যে অপার সম্ভাবনা আছে তা পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহারে সময়োপযোগী পরিকল্পনা নিয়ে বিনিয়োগকারীদের এগিয়ে আসার এখনই সময়।

বাংলাদেশে উৎপাদিত ও রপ্তানি তালিকায় স্থান করে নেয়া মূল্য সংযোজিত মৎস্যপণ্যের ছবিসহ পরিচিতি নিচের প্রোডাক্ট গ্যালারিতে উপস্থাপন করা হলো-

মূল্য সংযোজিত মৎস্যপণ্য গ্যালারি (Value added product gallery)

চিত্র: ব্ল্যাক টাইগার কুকড পিল্ড টেইল অফ আইকিউএফ

চিত্র: ব্ল্যাক টাইগার বডি পিল সেমি আইকিউএফ হেড অন

চিত্র: ব্ল্যাক টাইগার কুকড সেমি আইকিউএফ হেড অন

চিত্র: ব্ল্যাক টাইগার হেডলেস কুকড আইকিউএফ

চিত্র: ব্ল্যাক টাইগার হেডলেস শেল অন আইকিউএফ

চিত্র: ব্ল্যাক টাইগার পিল্ড ডিভেইনড স্কেউয়ার আইকিউএফ

চিত্র: ব্ল্যাক টাইগার র' পিল্ড ডিভেইন্ড টেইল অফ আইকিউএফ

চিত্র: ব্ল্যাক টাইগার সেমি আইকিউএফ হেড অন

চিত্র: ফ্রেস ওয়াটার বাটারফ্লাই আইকিউএফ

চিত্র: হরিনা কুক্ড ককটেইল আইকিউএফ

চিত্র: ওশান টাইগার সেমি আইকিউএফ হেড অন

চিত্র: ব্লক ফ্রোজেন শ্রিম্প হেড অফ

চিত্র: ব্রিডেড ক্রাম্ড শ্রিম্প রিং

চিত্র: কুকড পিডি ব্ল্যাক টাইগার আইকিউএফ

চিত্র: কুকড শ্রিম্প রিং

চিত্র: কুকড শুশি ইবি ব্ল্যাক টাইগার

চিত্র: ফ্রাইড শ্রিম্প শুশি রোল

চিত্র: ফ্রোজন-র-বাটারফ্লাই-শ্রিম্প আরবিআফ

চিত্র: পোড়কর্ন শ্রিম্প

চিত্র: স্পাইসি স্কেউয়ারড শ্রিম্প

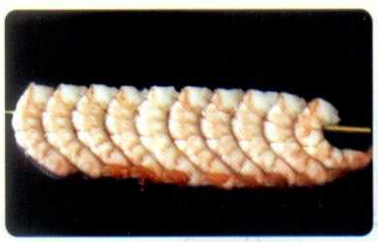

চিত্র: ব্ল্যাক টাইগার স্কেউয়ারড

চিত্র: টেম্পুরা ব্ল্যাক টাইগার আইকিউএফ

চিত্র: ক্যানড রোল শ্রিম্প আইকিউএফ

চিত্র: শ্রিম্প বল আইকিউএফ

চিত্র: ব্ল্যাক টাইগার স্কেউয়ারড

চিত্র: চাকা পিইউডি কুকড

চিত্র: ফ্রেস ওয়াটার পিএনডিটিও আইকিউএফ

চিত্র: বিটিপিডিটিও আইকিউএফ

চিত্র: ফ্রেস ওয়াটার ইজি পিল আইকিউএফ

চিত্র: ফ্রেস ওয়াটার হেডঅনশেলঅন সেমি আইকিউএফ

উপসংহার (Conclusion)

শুধু মূল্য সংযাজিত পণ্যে থেমে থাকলে আমাদের চলবে না। আমাদের পণ্যের প্রতিযোগী দেশসমূহ যথা- থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, ভারত বর্তমানে আরো 'অধিকতর মূল্য সংযোজিত পণ্য (Higher value added product)' উৎপাদন করে এবং অধিক পরিমাণ অর্থ উপার্জন করছে। এসব অধিক মূল্য সংযোজিত পণ্য উৎপাদনকল্পে আমাদের কারিগরি ও ব্যবহারিক জ্ঞান আহরণ করে সেদিকে আরো মনোনিবেশ করতে হবে। এজন্য সরকারি ব্যবস্থাপনায় বিদেশ হতে অধিকতর মূল্য সংযোজন পণ্য তৈরির বিশেষজ্ঞ এনে মূল্য সংযোজিত পণ্য উৎপাদনকারী কারখানার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। INFOFISH-সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ সংগ্রহের পাশাপাশি কারিগরি ও আর্থিক সহায়তার জন্য USAID, UNIDO, WorldFish, SIPPO ইত্যাদির প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করা যায়। একথা বলা আবশ্যক যে, অধিকতর মূল্য সংযোজিত পণ্য উৎপাদন করা সম্ভব হলে রপ্তানি আয় আরো প্রায় ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পাবে।

প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুড্স এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আর্কসী ফুড্স লি., চট্টগ্রাম (arkfish@colbd.com)

জাতীয় মৎস্য পুরস্কার ২০১৩

ক্রমিক নং	পুরস্কারের ক্ষেত্র	পদক	নাম ও ঠিকানা
১	মৎস্য ও মৎস্যজাতপণ্য রপ্তানিকরণ (হিমায়িত চিংড়ি/মৎস্য শুটকি)	স্বর্ণপদক	জনাব জব্বার মোল্লা, ব্যবস্থাপনা পরিচালক জালালাবাদ ফ্রোজেন ফুডস লি., রূপসা, খুলনা
২	মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সমবায় সমিতি/মৎস্য সংক্রান্ত সমাজভিত্তিক সংগঠনের অবদান/সমগ্র কর্মজীবনের অবদান	স্বর্ণপদক	জনাব মুহাম্মাদ এ রুমি আলী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্র্যাক ফিসারিজ এন্টারপ্রাইজ, ব্র্যাক সেন্টার, ৭৫ মহাখালী, গুলশান, ঢাকা
৩	মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সমবায় সমিতি/মৎস্য সংক্রান্ত সমাজভিত্তিক সংগঠনের অবদান/সমগ্র কর্মজীবনের অবদান	স্বর্ণপদক	জনাব পরিমল দে সরকার, পিতা: হরিপদ দে সরকার, মাতা: সুপ্রভা দে সরকার করতোয়া নদী স্থায়ী মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা সংগঠন, দেবীগঞ্জ, জেলা: পঞ্চগড়
৪	মৎস্য উন্নয়নে প্রযুক্তি	স্বর্ণপদক	জনাব জাবেদ আলী শেখ, সভাপতি, বিরামের কান্দি মৎস্য উৎপাদন সমিতি-০২ গ্রাম: বিরামের কান্দি, ডাকঘর: কুশলা, উপজেলা: কোটালীপাড়া, জেলা: গোপালগঞ্জ
৫	মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ	স্বর্ণপদক	জনাব পিউস কস্তা, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন ২৪-২৫ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
৬	মাছের গুণগতমানের রেণু উৎপাদন	রৌপ্যপদক	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, পিতা: মোঃ বছির আলী মণ্ডল শাহ সুলতান শাহজালাল মৎস্য বীজাগার গ্রাম: বিবির পুকুর, ডাকঘর: নারহট্ট উপজেলা: কাহালু, জেলা: বগুড়া
৭	মাছের গুণগতমানের রেণু উৎপাদন	রৌপ্যপদক	বেগম রীবলী ইসলাম কবিতা, স্বামী: মোঃ মোফাজ্জল হোসেন বিলু গ্রাম: চড়ইমুড়ি, ডাকঘর: গরহাটা, উপজেলা: উল্লাপাড়া, জেলা: সিরাজগঞ্জ
৮	মাছের গুণগতমানের পোনা উৎপাদন	রৌপ্যপদক	জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দিন খাঁন, পিতা: মোঃ আজিজুল হক খান, মাতা: মোছাঃ বেগম গ্রাম: চরপাড়া, ডাকঘর: খয়েরপুর, উপজেলা: মিরপুর, জেলা: কুষ্টিয়া
৯	মাছের গুণগতমানের পোনা উৎপাদন	রৌপ্যপদক	জনাব মোঃ আবুল কালাম, পিতা: মৃত শামসুল হক, মাতা: মোছাঃ মর্জিনা বেগম গ্রাম: চৌংড়াছড়ি গুচ্ছগ্রাম, ডাকঘর: মহালছড়ি, উপজেলা: মহালছড়ি, জেলা: খাগড়াছড়ি
১০	মাছের গুণগতমানের পোনা উৎপাদন	রৌপ্যপদক	জনাব টি এ রাজু , পিতা: মৃত আদিল উদ্দিন, মাতা: মোছাঃ সুন্দরী নেছা গ্রাম: ভাটই, ডাকঘর: ভাটই বাজার, উপজেলা: শৈলকূপা, জেলা: ঝিনাইদহ
১১	মাছের গুণগতমানের পোনা উৎপাদন	রৌপ্যপদক	জনাব মোহাম্মদ ইয়াহ্-ইয়া, পিতা: মোহাম্মদ শরিয়ত উল্যাহ, মাতা: সামসুন নাহার তাই থাই বাংলা সাইন্টিফিক হ্যাচারি, গ্রাম: বড়চারীগাঁও, ডাকঘর: চন্দেরহাট, উপজেলা: সেনবাগ, জেলা: নোয়াখালী
১২	মাছ উৎপাদন	রৌপ্যপদক	জনাব মোঃ মজিবুর রহমান, পিতা: মৃত সামসুল হক, মাতা: মৃত তাহরুন নেছা গ্রাম: চম্পকনগর, ডাকঘর: রাঙ্গামাটি, উপজেলা: রাঙ্গামাটি সদর, জেলা: রাঙ্গামাটি
১৩	মাছ উৎপাদন	রৌপ্যপদক	জনাব শাহ মোঃ মাহফুজুল হক, পিতা: আলহাজ্ব শাহ মঈনুদ্দিন মাতা: মৃত ফজিলা খাতুন শাহ ক্যাটফিস এন্ড হ্যাচারি, গ্রাম: ঠাকুরাদহ, ডাকঘর: উত্তর পানাপুকুর, উপজেলা: গঙ্গাচড়া, জেলা: রংপুর
১৪	মাছ উৎপাদন	রৌপ্যপদক	জনাব মোঃ এরশাদুর মাহমুদ, পিতা: মৃত নূরুচ্ছাফা তালুকদার, মাতা: মৃত নুরনাহার সুখ বিলাস ফিসারিজ এন্ড প্লান্টেশন, গ্রাম: সুখবিলাস, ডাকঘর: উত্তরপদুয়া, উপজেলা: রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম
১৫	বাগদা চিংড়ির গুণগতমানের পিএল উৎপাদন	রৌপ্যপদক	আলহাজ্ব আবদুর রহিম চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এ আর সি শ্রীম্প হ্যাচারি, গ্রাম: সোনার পাড়া, ডাকঘর: ইনানী, উপজেলা: উখিয়া, জেলা: কক্সবাজার
১৬	বাগদা চিংড়ি উৎপাদন	রৌপ্যপদক	জনাব এম এ মালেক, পিতা: মরহুম মুনসুর রহমান শেখ, মাতা: মরহুমা সবরুন্নেছা গ্রাম: কালাবগী, ডাক: কালাবগী, উপজেলা: দাকোপ, জেলা: খুলনা
১৭	মৎস্য উন্নয়নে প্রযুক্তি	রৌপ্যপদক	জনাব মোঃ কাঞ্চন আলী হাওলাদার, পিতা: মোঃ আঃ মাজেদ হাওলাদার গ্রাম: চরকমিশনা, ডাকঘর: চরকমিশনা, উপজেলা: মুলাদী, জেলা: বরিশাল
১৮	মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সমবায় সমিতি/মৎস্য সংক্রান্ত সমাজভিত্তিক সংগঠনের অবদান/সমগ্র কর্মজীবনের অবদান	রৌপ্যপদক	জনাব ছফুরা বেগম, নির্বাহী পরিচালক, চিনিশপুর দীপশিখা মহিলা সমিতি গ্রাম: চিনিশপুর, ডাক: নরসিংদী সরকারি কলেজ, উপজেলা: নরসিংদী সদর, জেলা: নরসিংদী,
১৯	মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সমবায় সমিতি/মৎস্য সংক্রান্ত সমাজভিত্তিক সংগঠনের অবদান/সমগ্র কর্মজীবনের অবদান	রৌপ্যপদক	মোহাম্মদ আবু বক্কর সিদ্দিক, চেয়ারম্যান মৎস্যজীবী উপজাতি এবং হতদরিদ্র উন্নয়ন সোসাইটি, ৩২০/৬/ই দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা
২০	গুণগতমানের মৎস্যখাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ	রৌপ্যপদক	খান মোঃ অফতাব উদ্দিন, চেয়ারম্যান, স্পেক্ট্রা হেক্সা ফিডস লি. Mr. Pisan Chaithirasakul , পরিচালক, স্পেক্ট্রা হেক্সা ফিডস লি. গ্রাম ও ডাকঘর: নালী, উপজেলা: শিবালয়, জেলা: মানিকগঞ্জ

বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদ (২০১১-১২)
বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন

মৎস্য সেক্টর	জলায়তন (হেক্টর)	উৎপাদন (মে.টন)	শতকরা (%)	উৎপাদন/আয়তন (কেজি/হেক্টর)
ক. অভ্যন্তরীণ জলাশয়				
(১) মুক্ত জলাশয়				
১. নদী ও মোহনা	৮,৫৩,৮৬৩	১,৪৫,৬১৩		১৭১
২. সুন্দরবন	১,৭৭,৭০০	২১,৬১০		১২২
৩. বিল	১,১৪,১৬১	৮৫,২০৮		৭৪৬
৪. কাপ্তাই লেক	৬৮,৮০০	৮,৫৩৭		১২৪
৫. প্লাবনভূমি	২৭,১০,৭৬৬	৬,৯৬,১২৭		২৫৭
মোট:	**৩৯,২৫,২৯০**	**৯,৫৭,০৯৫**	**২৯.৩৪**	
(২) বদ্ধ জলাশয়				
৬. পুকুর	৩,৭১,৩০৯	১৩,৪২,২৮২		৩,৬১৫
৭. মৌসুমী চাষ জলাশয়	১,২২,০২৬	১,৮২,২৯৩		১,৪৯৪
৮. বাঁওড়	৫,৪৮৮	৫,১৮৬		৯৪৫
৯. চিংড়ি খামার	২,৫৫,২৩২	১,৯৬,৩০৬		৭১৩
মোট:	**৭,৭৪,০৫৫**	**১৭,২৬,০৬৭**	**৫২.৯২**	
অভ্যন্তরীণ জলাশয় মোট	**৪৬,৯৯,৩৪৫**	**২৬,৮৩,১৬২**	**৮২.২৬**	
খ. সামুদ্রিক জলাশয়				
১০. ট্রলার		৭৩,৩৮৬		
১১. আর্টিস্যানাল		৫,০৫,২৩৪		
সামুদ্রিক জলাশয় মোট		৫,৭৮,৬২০	**১৭.৭৪**	
সর্বমোট		**৩২,৬১,৭৮২**	**১০০**	

বছরভিত্তিক চিংড়ির উৎপাদন

বৎসর	চিংড়ি উৎপাদন (মে.টন)						সর্বমোট	চাষকৃত চিংড়ির শতকরা হার
	অভ্যন্তরীণ জলাশয়			সামুদ্রিক জলাশয়				
	উন্মুক্ত	চাষকৃত	মোট	ট্রলার	আর্টিসেনাল	মোট		
১৯৮৬-৮৭	৪২৮৮২	১৪৭৭৩	৫৭৬৫৫	৪৪৮৮	১০৬৬৬	১৫১৫৪	৭২৮০৯	২০.২৯
১৯৮৭-৮৮	৩৬৩৮৬	১৭৮৮৯	৫৪২৭৫	৩৫৪৫	১১৫৩৫	১৫০৮০	৬৯৩৫৫	২৫.৭৯
১৯৮৮-৮৯	৪২৮২৪	১৮২৩৫	৬১০৫৯	৪৮৯৩	১২২১১	১৭১০৪	৭৮১৬৩	২৩.৩৩
১৯৮৯-৯০	৩৬২৮৪	১৮৬২৪	৫৪৯০৮	৩১১৭	১২৭৫১	১৫৮৬৮	৭০৭৭৬	২৬.৩১
১৯৯০-৯১	৪৩২৬২	১৯৪৮৯	৬২৭৫১	৩৬৯৬	১৩৯৩৭	১৭৬৩৩	৮০৩৮৪	২৪.২৪
১৯৯১-৯২	৬১০৪২	২০৩৩৫	৮১৩৭৭	২৯০২	১৭১৪০	২০০৪২	১০১৪১৯	২০.০৫
১৯৯২-৯৩	৭৮২২৬	২৩৫৩০	১০১৭৫৬	৪১৮৮	১৯৭৮৭	২৩৯৭৫	১২৫৭৩১	১৮.৭১
১৯৯৩-৯৪	৫০৭২১	২৮৩০২	৭৯০২৩	৩৪৭৯	১৮০৪০	২১৫১৯	১০০৫৪২	২৮.১৫
১৯৯৪-৯৫	৫৮৯৭৩	৩৪০৩০	৯৩০০৩	২৪১৬	১৭৯৪৭	২০৩৬৩	১১৩৩৬৬	৩০.০২
১৯৯৫-৯৬	৪৪০৭৯	৪৬২২৩	৯০৩০২	৩৫৮৮	২২৭৬৫	২৬৩৫৩	১১৬৬৫৫	৩৯.৬২
১৯৯৬-৯৭	৪১৮৬৮	৫২২৭২	৯৪১৪০	৩৫৩৭	২১২৮১	২৪৮১৮	১১৮৯৫৮	৪৩.৯৪
১৯৯৭-৯৮	৪৬৬৩৫	৬২১৬৭	১০৮৮০২	২৪৪৪	২২৩৪৬	২৪৭৯০	১৩৩৫৯২	৪৬.৫৩
১৯৯৮-৯৯	৪৯২৯৬	৬৩১৬৪	১১২৪৬০	৩৭৬৫	২৭৯৭৭	৩১৭৪২	১৪৪২০২	৪৩.৮০
১৯৯৯-০০	৪৩১৬৭	৬৪৬৪৭	১০৭৮১৪	২৯১৫	২৮৪৮০	৩১৩৯৫	১৩৯২০৯	৪৬.৪৪
২০০০-০১	৪৪৩৪৩	৬৪৯৭০	১০৯৩১৩	৩১৭২	২৭৮৬৫	৩১০৩৭	১৪০৩৫০	৪৬.২৯
২০০১-০২	৫৪৯৬৫	৬৫৫৭৯	১২০৫৪৪	৩১৬৮	২৮৮০৮	৩১৯৭৬	১৫২৫২০	৪৩.০০
২০০২-০৩	৬০৮৭৬	৬৬৭০৩	১২৭৫৭৯	২৪৮৬	২৯৪৪৫	৩১৯৩১	১৫৯৫১০	৪১.৮২
২০০৩-০৪	৬৩১০৩	৭৫১৬৭	১৩৮২৭০	৩০৭৫	৩৩৪১৩	৩৬৪৮৮	১৭৪৭৫৮	৪৩.০১
২০০৪-০৫	৬৮৭৬৮	৮২৬৬১	১৫১৪২৯	৩৩১১	৪০৯৫০	৪৪২৬১	১৯৫৬৯০	৪২.২৪
২০০৫-০৬	৭৭৩৮১	৮৫৫১০	১৬২৮৯১	৩৪৪৪	৪৪৬৭৫	৪৮১১৯	২১১০১০	৪০.৫২
২০০৬-০৭	৮২৪২২	৮৬৮৪০	১৬৯২৬২	২১৭৫	৪৯৬৯৪	৫১৮৬৯	২২১১৩১	৩৯.২৭
২০০৭-০৮	৭৫৬৭৮	৯৪২১১	১৬৯৮৮৯	২৬২০	৫০৫৮৬	৫৩২০৬	২২৩০৯৩	৪২.২৩
২০০৮-০৯	৮৯৯০১	১০২৮৫৪	১৯২৭৫৫	২৯৩২	৪৯২৮৫	৫২২১৭	২৪৪৯৭২	৪২.০০
২০০৯-১০	৪৬৩৮৮	৮৭৯৭২	১৩৪৩০০	২৪৯৬	৫০০৯৬	৫২৫৯২	১৮৬৮৯২	৪৭.০৭
২০১০-১১	৫৭৯২২	১২৪৬৪৮	১৮২৫৭০.৭৬	২৭৮৫	৫৪২০৪	৫৬৯৭৯	২৩৯৪৬০	৫২.০৫
২০১১-১২	৫৭৬৮৮	১৩৭১৭৫	১৯৪৮৬৩	২২১২	৫৫৪৪৮	৫৭৬৬০	২৫২৫২৩	৫৪.৩২

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৩

বছরভিত্তিক ইলিশ উৎপাদন

বৎসর	ইলিশ উৎপাদন (মে.টন)		
	অভ্যন্তরীণ জলাশয়	সামদ্রিক জলাশয়	মোট
১৯৮৭-১৯৮৮	৭৮৫৫১	১০৪৯৫০	১৮৩৫০১
১৯৮৮-১৯৮৯	৮১৬৪১	১১০৩১১	১৯১৯৫২
১৯৮৯-১৯৯০	১১২৪০৮	১১৩৯৪৩	২২৬৩৫১
১৯৯০-১৯৯১	৬৬৮০৯	১১৫৩৫৮	১৮২১৬৭
১৯৯১-১৯৯২	৬৮৩৫৬	১২০১০৬	১৮৮৪৬২
১৯৯২-১৯৯৩	৭৪৭১৫	১২৩১১৫	১৯৭৮৩০
১৯৯৩-১৯৯৪	৭১৩৭০	১২১১৬১	১৯২৫৩১
১৯৯৪-১৯৯৫	৮৪৪২০	১২৯১১৫	২১৩৫৩৫
১৯৯৫-১৯৯৬	৮০৬২৫	১২৬৬৬০	২০৭২৮৫
১৯৯৬-১৯৯৭	৮৩২৩০	১৩১২০৪	২১৪৪৩৪
১৯৯৭-১৯৯৮	৮১৬৩৪	১২৪১০৫	২০৫৭৩৯
১৯৯৮-১৯৯৯	৭৩৮০৯	১৪০৭১০	২১৪৫১৯
১৯৯৯-২০০০	৭৯১৬৫	১৪০৩৬৭	২১৯৫৩২
২০০০-২০০১	৭৫০৬০	১৫৪৬৫৪	২২৯৭১৪
২০০১-২০০২	৬৮২৫০	১৫২৩৪৩	২২০৫৯৩
২০০২-২০০৩	৬২৯৪৪	১৩৬০৮৮	১৯৯০৩২
২০০৩-২০০৪	৭১০০১	১৮৪৮৩৭	২৫৫৮৩৯
২০০৪-২০০৫	৭৭৪৯৯	১৯৮৩৬৩	২৭৫৮৬২
২০০৫-২০০৬	৭৮২৭৩	১৯৮৮৫০	২৭৭১২৩
২০০৬-২০০৭	৮২৪৪৫	১৯৬৭৪৪	২৭৯১৮৯
২০০৭-২০০৮	৮৯,৯০০	২০০১০০	২৯০০০০
২০০৮-২০০৯	৯৫,৯৭০	২০২,৯৫১	২৯৮৯২১
২০০৯-২০১০	১১৪৭৬৮	১৯৮৫৭৪	৩১৩৩৪২
২০১০-২০১১	১১৪৫২০	২২৫৩২৫	৩৩৯৮৪৫
২০১১-২০১২	১১৪৪৭৫	২৩২০৩৭	৩৪৬৫১২

রপ্তানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য

পরিমাণ: মে.টন
মূল্য: কোটি টাকা

বৎসর	হিমায়িত চিংড়ি		জীবিত মাছ		হিমায়িত মাছ		শুটকি মাছ		লবণাক্ত ও পানিশূন্য মাছ		কাকড়া/ ইল		হাঙরের পাখনা এবং মাছের ফোটকা		অন্যান্য		মোট		মোট রপ্তানি আয়ের হার
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	%
৯২-৯৩	১৯২২৪	৬০৪.০৩			২৭০৪	৩৮.৩১	১০৪২	১২.২৬	৫৯৯	৯.৮৪	২৮০০	২১.৬০	২৩৮.৩৯	১৪.২৫			২৬৬০৭	৭০০.২৯	৭.৫৭
৯৩-৯৪	২২০৫৪	৭৮৭.৭৩			৩১২৫	৫১.১৮	২৪৭৩	৪১.৮৩	৫০	১.০৬	৪০৮৮	৩৬.৩৭	৪৫	২.৭৯			৩১৮৩৫	৯২০.৯৬	৯.১২
৯৪-৯৫	২৬২৭৭	১০৪৫.৬৭			৯২৬৭	১৮০.২৬	৫২১	৮.৩৯	৬৪৯	১৫.৩৫	৪৭৬০	৪০.৬৭	২১২	১৬.৬০			৪১৬৮৬	১৩০৬.৯৪	৯.৩৮
৯৫-৯৬	২৫২২৫	১১০৬.৩৯			৮৮২৭	১৭৬.৬২	১৮২	৩.০৫	৪৩৬	১১.৪৭	৪২০৩	৩৯.২০	৫৬	৪.২১			৩৮৯২৯	১৩৪০.৯৪	৯.৩৮
৯৬-৯৭	২৫৭৪২	১১৮৮.৯১			৮৭৫৪	১৭৬.৭৪	৪২৭	৭.৯২	৫৬১	১৩.৮১	৫৯৫২	৬১.৪৮	১১৩	৮.৫৫			৪১৫৪৯	১৪৫৭.৪১	৭.৭৫
৯৭-৯৮	১৮৬৩০	১১৮১.৪৮			৮৮৩৬	১৫১.৬৬	২৩৩	৩.১১	১১০৬	২৬.৪৩	১১৯৮	১৪.৩৪	১৫৫	১০.৭৯			৩০১৫৮	১৩৮৭.৮১	৫.৮৩
৯৮-৯৯	২০১২৭	১১৬২.২১			৬৩৯৫	১৫৩.৯৬	১৩৭	২.২৩	১২৩২	৩৭.১৮	৪৮৬	৬.৩৯	১৫৪	১৭.৪০			২৮৫৩১	১৩৭৯.৩৭	৫.৪১
৯৯-২০০০	২৮৫১৪	১৬১২.১৫			৯৪৮৪	১৩৭.১৯	২১৫	৩.৬৫	৮০৯	২৫.৯৬	১০৭	১.৪৪	২৬২	৩১.১৭			৩৯৩৯১	১৮১১.৫৬	৬.২৮
২০০০-০১	২৯৭১৩	১৮৮৫.১৫			৭৯৬৫	৯৪.৮৯	১৩৭	২.০২	৮৩৮	২৭.৭৩	১৫৪	২.৩৩	১৮১	২০.৬৩			৩৮৯৮৮	২০৩২.৭৫	৫.৭৭
০১-০২	৩০২০৯	১৪৪৭.৭৬			৯৮৬৪	১৩৭.৩৯	৫১৭	৮.৩২	২৯৩	৯.৫৩	৩৩৬	৭.০৭	২৬৩	২৭.০৭			৪১৪৮২	১৬৩৭.১৪	৪.৭৬
০২-০৩	৩৬৮৬৪	১৭১৯.৮৮			৮৮৪৬	১৫৮.৬৪	৩৩৩	৭.০২	৫২৬	১৯.১২	৬৩০	১৪.৫৮	১৭২	২২.৩৫			৪৭৩৭১	১৯৪১.৫৯	৫.১০
০৩-০৪	৪২৯৪৩	২১৫২.৭৭			১০২২৯	২০২.২৪	৪৭২	৪.১৬	৩৭৭	১.৩৮	১১৬	১.৩৯	৪	১.৫৩			৫৪১৪১	২৩৬৩.৪৭	৫.৭১
০৪-০৫	৪৬৫৩৩	২২৮১.৫৯			১৫৭৬৩	২৫৬.২০	২৭২	৩.৭১	৭৭০	২৮.৯৭	৩৮	০.৮৬	১	০.৩৯			৬৩৩৭৭	২৫৭১.৭২	৫.৯০
০৫-০৬	৪৯৩১৭	২৬৯৮.৩৫	৫৭	০.৪৮	১৭৪২৯	২৯৪.১৪	১৫০	২.১৯	৫৯১	১৯.৮৪	১১০৭	১২.৯৫	৭৮	০.৮০	১০০	১.০৯	৬৮৮২৯	৩০২৯.৮৪	৪.৫৬
০৬-০৭	৫৩৩৬১	২৯৯২.৩৩	৪	০.০৭	১৮৩৭৬	৩২৫.৯০	৭৭	১.৩৪	৪৪১	১২.৮০	১১২৩	১৫.৪৮	২৪৪	৪.১১	৭৮	০.৮৬	৭৩৭০৪	৩৩৫২.৮৯	৪.৯০
০৭-০৮	৪৯৯০৭	২৮৬৩.৯২	১০	০.১৫	২৩৫১৫	৪৯৫.৪৬	২১০	২.৬৭	৬৫৮	২৬.৯৭	৪৩৯	৪.৮৮	২৬৬	১.৮২	২৯৪	০.৪১	৭৫২৯৯	৩৩৯৬.২৮	৪.০৪
০৮-০৯	৫০৩৬৮	২৭৪৪.১২	০.৩	০.০০০৬	১৯২৯৪	৪৫০.৯০	৩৪১	১১.৯৯	৮৪	৩.৯২	১২১৭	১১.৯৮	২৭৬	১.৭৭	১৩০৮	১৮.৭৩	৭২৮৮৮	৩২৪৩.৪১	৩.০০
০৯-১০	৫১৫৯৯	২৮৮৫.২১	১৭৮৩	১৩.২২	২১৪৬৪	৪৫৮.১১	৬২২	২৫.০৬	০	০	৬৯২	১০.৪১	৯৫৫	১২.৬৬	৫২৮	৩.৮৫	৭৭৬৪৩	৩৪০৮.৫২	২.৭২
১০-১১	৫৪৮৯১	৩৫৬৮.২	০.৬	০.০৪৫	৩৩১১২	১২১১.০৫	৬২৩	৫.৫৭	৫৭৬.৮	৩০.৮৬	৪৪৮৫	৫৪.১১	০০	০০	২৭৮০	৩৪.০	৯৬৪৬৯	৪৬০৩.৮৩	২.৭৩
১১-১২	৪৮০০৭	৩৬৪০.২	০.৪৬	০.০৪	৩৪৫৩৯	৯১৬.৯২	৯৯৬	৯.৪৩	৪১১	২৭.৪৬	৫৭৬৭	৯৫.৭৭	০০	০০	২৭৫৮	১৪.১৪	৯২৪৭৯	৪৭০৩.৯৫	২.৪৬

চিল্ড ফিসসহ

- রপ্তানিকৃত ইলিশ (চিল্ড) ৫,১২১.০৬ মে.টন এবং রপ্তানিকৃত আয় ২৩৮.৫৮ কোটি টাকা (২০১১-২০১২)
- রপ্তানিকৃত ইলিশ হিমায়িত ১,০৫২.৬০ মে.টন এবং রপ্তানিকৃত আয় ৪৩.৬১ কোটি টাকা (২০১১-২০১২) মোট ইলিশ রপ্তানি ৬,১৭৩.৬৬ মে. টন এবং রপ্তানিকৃত আয় ২৮২.১৯ কোটি টাকা।

বছরভিত্তিক বাংলাদেশের মৎস্য উৎপাদন
১৯৯৯-২০০০ হতে ২০১১-২০১২

একক : মে.টন

মৎস্য সেক্টর	১৯৯৯-০০	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২
ক. অভ্যন্তরীণ জলাশয়	১৩২৭৫৮৫	১৪০১৫৬০	১৪৭৫০৩৯	১৫৬৬২৮৯	১৬৪৬৮১৯	১৭৪১৩৬০	১৮৪৮৭৩৫	১৯৫২৫৭৩	২০৬৫৭২৩	২১৮৬৭২৬	২৩৮১৯১৬	২৫১৫৩৫৪	২৬৮৩১৬২
(১) মুক্ত জলাশয়	৬৭০৪৬৫	৬৮৮৯২০	৬৮৮৪৩৫	৭০৯৩৩৩	৭৩২০৬৭	৮৫৯২৬৯	৯৫৬৬৮৬	১০০৬৭৬১	১০৬০১৮১	১১২৩৯২৫	১০২৯৯৩৭	১০৫৪৫৮৫	৯৫৭০৯৫
১. নদী ও মোহনা	১৫৪৩৩৫	১৫০১২৯	১৪৩৫৯২	১৩৭৮৪৮	১৩৭৩৩৭	১৩৯৭৯৮	১৩৭৮৫৯	১৩৬৯৫৮	১৩৬৮১২	১৩৮১৬০	১৪১১৪৮	১৪৪৫৬৬	১৪৫৬১৩
২. সুন্দরবন	১১৬৪৮	১২০৩৫	১২৩৪৫	১৩৮৮৪	১৫২৪২	১৫৭২৪	১৬৪২৩	১৭৭৫১	১৮১৫১	১৮৪৬২	২০৪৩৭	২২৪৫১	২১৬১০
৩. বিল	৭২৮২৫	৭৪৫২৭	৭৬১০১	৭৫৪৬০	৭৪৩২৮	৭৪৯২৫	৭৬৩৬৫	৭৫১৩৭	৭৭৫২৪	৭৯২০০	৭৯২০৯	৮১৫৬৪	৮৫২০৮
৪. কাপ্তাইলেক	৬৮৫২	৭০৫১	৭২৪৭	৭০২৫	৭২৩৮	৭৩৭৯	৭৫৪৮	৮০৮৫	৮২৪৮	৮৫৯০	৭৩৩৬	৮৯৮০	৮৫৩৭
৫. প্লাবনভূমি	৪২৪৮০৫	৪৪৫১৭৮	৪৪৯১৫০	৪৭৫১১৬	৪৯৭৯২২	৬২১৪৪৩	৭১৮৪৯১	৭৬৮৮৩০	৮১৯৪৪৬	৮৭৯৫১৩	৭৮১৮০৭	৭৯৭০৪	৬৯৬১২৭
(২) বদ্ধ জলাশয়	৬৫৭১২০	৭১২৬৪০	৭৮৬৬০৪	৮৫৬৯৫৬	৯১৪৭৫২	৮৮২০৯১	৮৯২০৪৯	৯৪৫৮১২	১০০৫৫৪২	১০৬২৮০১	১৩৫১৯৭৯	১৪৬০৭৬৯	১৭২৬০৬৭
১. পুকুর	৫৬১০৫০	৬১৫৮২৫	৬৮৫১০৭	৭৫২০৫৪	৭৯৫৮১০	৭৫৬৯৯৩	৭৫৯৬২৮	৮১১৯৫৪	৮৬৬০৪৯	৯১২১৭৮	১১৪০৪৮৫	১২১৯৭৩৬	১৩৪২২৮২
২.মৌসুমী চাষ জলাশয় (প্লাবনভূমি)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	৪৬৯০২	৫১২৩০	১৮২২৯৩
৩. বাঁওড়	৩৬২২	৩৮০১	৩৮৯২	৪০৯৮	৪২৮২	৪৩৮৮	৪৪৯৮	৪৬৯৮	৪৭৭৮	৫০৩৮	৮৭২৭	৪৮৬৪	৫১৮৬
৪. চিংড়ি খামার	৯২৪৪৮	৯৩০১৪	৯৭৬০৫	১০০৮০৪	১১৪৬৬০	১২০৭১০	১২৭৯২৩	১২৯১৬০	১৩৪৭১৫	১৪৫৫৮৫	১৫৫৮৬৬	১৮৪৯৩৯	১৯৬৩০৬
খ. সামুদ্রিক জলাশয়	৩৩৩৭৯৯	৩৭৯৪৯৭	৪১৫৪২০	৪৩১৯০৮	৪৫৫২০৭	৪৭৪৫৯৭	৪৭৯৮১০	৪৮৭৪৩৮	৪৯৭৫৭৩	৫১৪৬৪৪	৫১৭২৮২	৫৪৬৩৩৩	৫৭৮৬২০
১. ট্রলার	১৬৩০৪	২৩৯০১	২৫১৬৫	২৭৯৫৪	৩২৬০৬	৩৪১১৪	৩৪১৮৪	৩৫৩৯১	৩৪১৫৯	৩৫৪২৯	৩৪১৮২	৪১৬৬৫	৭৩৩৮৬
২. আর্টিসেনাল	৩১৭৪৫৯	৩৫৫৫৯৬	৩৯০২৫৫	৪০৩৯৫৪	৪২২৬০১	৪৪০৪৮৩	৪৪৫৭২৬	৪৫২০৪৭	৪৬৩৪১৪	৪৭৯২১৫	৪৮৩১০০	৫০৪৬৬৮	৫০৫২৩৪
সর্বমোট:	১৬৬১৩৮৪	১৭৮১০৫৭	১৮৯০৪৫৯	১৯৯৮১৯৭	২১০২০২৬	২২১৫৯৫৭	২৩২৮৫৪৫	২৪৪০০১১	২৫৬৩২৯৬	২৭০১৩৭০	২৮৯৯১৯৮	৩০৬১৬৮৭	৩২৬১৭৮২
বাৎসরিক উৎপাদন বৃদ্ধির হার (%)	৭.০২	৭.২০	৬.১৪	৫.৭০	৫.২০	৫.৪২	৫.০৮	৪.৭৯	৫.০৫	৫.৩৯	৭.৩২	৫.৬০	৬.৫৪

বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ (২০১২ সালের তথ্যানুযায়ী)

১.	অভ্যন্তরীণ জলায়তন		
	(ক) বদ্ধ জলাশয়	:	৭,৭৪,০৫৫ হে.
	▪ পুকুর	:	৩,৭১,৩০৯ হে.
	▪ অক্সবো লেক (বাঁওড়)	:	৫,৪৮৮ হে.
	▪ চিংড়ি খামার	:	২,৭৫,২৩২ হে.
	▪ মৌসুমী জলাশয়	:	১,২২,০২৬ হে.
	(খ) উন্মুক্ত জলাশয়	:	৩৯,২৫,২৯০ হে.
	▪ নদী ও মোহনা	:	৮,৫৩,৮৬৩ হে.
	▪ সুন্দরবন	:	১,৭৭,৭০০ হে.
	▪ বিল	:	১,১৪,১৬১ হে.
	▪ কাপ্তাই লেক	:	৬৮,৮০০ হে.
	▪ প্লাবনভূমি	:	২৭,১০,৭৬৬ হে.
২.	সামুদ্রিক জলায়তন	:	১,৬৬,০০০ বর্গ কিলোমিটার
	▪ সমুদ্রসীমা	:	৯,০৬০ বর্গ কিলোমিটার
	▪ (তটরেখা হতে ১২ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত)		
	▪ একান্ত অর্থনৈতিক এলাকা	:	১,৪০,৮৬০ বর্গ কিলোমিটার
	▪ (তটরেখা হতে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত)		
	▪ মহীসোপান এলাকা	:	২৪,৮০০ বর্গ নটিক্যাল মাইল
	▪ (৪০ ফ্যাদম গভীর পর্যন্ত)		
	▪ উপকূলীয় অঞ্চলের বিস্তৃতি	:	৭১০ কিলোমিটার
৩.	জেলের সংখ্যা	:	১৩.১৬ লক্ষ
	▪ অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের জেলে	:	৮.০০ লক্ষ
	▪ সামুদ্রিক জেলে	:	৫.১৬ লক্ষ
৪.	মৎস্যচাষি	:	১৪৬.৯৭ লক্ষ
	▪ মৎস্যচাষি	:	১৩৮.৬৪ লক্ষ
	▪ চিংড়িচাষি	:	৮.৩৩ লক্ষ
৫.	মৎস্য উৎপাদন	:	৩২,৬১,৭৮২ মে.টন
	▪ অভ্যন্তরীণ মৎস্য	:	২৬,৮৩,১৬২ মে.টন
	▪ উন্মুক্ত জলাশয় (আহরিত)	:	৯,৫৭,০৯৫ মে.টন
	▪ বদ্ধ জলাশয় (চাষকৃত)	:	১৭,২৬,০৬৭ মে.টন
	▪ সামুদ্রিক মৎস্য	:	৫,৭৮,৬২০ মে.টন
	▪ ট্রলার দ্বারা আহরণ	:	৭৩,৩৮৬ মে.টন
	▪ ইঞ্জিন চালিত নৌকা দ্বারা আহরণ	:	৫,০৫,২৩৪ মে.টন
৬.	মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্য রপ্তানি		
	▪ পরিমাণ	:	৯২,৪৭৯ মে.টন
	▪ মূল্য	:	৪,৭০৩.৯৫ কোটি টাকা
	▪ মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্লান্ট	:	মোট ১০০টি (ই ইউ অনুমোদিত-৭৫টি)
	▪ জাতীয় মোট রপ্তনিতে বৈদেশিক মুদ্রার অবদান	:	২.৪৬%
৭.	জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্যখাতের অবদান		
	▪ GNP-তে মাছের মূল্য (বর্তমান বাজার মূল্য) ২০১০-১১	:	২,৬৯,৯২৮ মিলিয়ন টাকা
	▪ GDP-তে অবদান (২০১১-১২)	:	৪.৩৯%
	▪ কৃষিখাতে অবদান (২০১১-১২)	:	২২.৭৬%

৮.	মাছ গ্রহণ (Fish Intake) ও চাহিদা			
	▪ জনপ্রতি বাৎসরিক মাছ গ্রহণ	:	১৮.৯৪ কেজি	
	▪ মাছের বাৎসরিক চাহিদা	:	৩৩.৯০ লক্ষ মে.টন	
	▪ জনপ্রতি মাছের বাৎসরিক চাহিদা	:	২০.৪৪ কেজি	
	▪ প্রাণিজ আমিষ সরবরাহে অবদান	:	৬০ % (প্রায়)	
৯.	মৎস্য হ্যাচারি ও নার্সারি			
	▪ মৎস্য হ্যাচারি	:	৯৮৩টি	
	▪ মৎস্য নার্সারি	:	৯,৪৫২টি	
	▪ হ্যাচারির রেণু উৎপাদন	:	৬,৪৬,৯৩৬.২৬ কেজি	
	▪ প্রাকৃতিক উৎস হতে রেণু সংগ্রহ	:	৪,০৯৩ কেজি	
	▪ নার্সারিতে পোনা মাছ উৎপাদন	:	৯৬,০০১ লক্ষ	
১০.	চিংড়ি হ্যাচারি			
	▪ বাগদা হ্যাচারি	:	৬১ টি (সরকারি ২টি)	
	▪ বাগদার রেণু উৎপাদন (পিএল)	:	৮২০ কোটি	
	▪ গলদা হ্যাচারি	:	৭০টি (সরকারি ১৭টি)	
	▪ গলদার রেণু উৎপাদন (পিএল)	:	১২৫.০৩ কোটি	
	▪ প্রাকৃতিক উৎস হতে চিংড়ির রেণু সংগ্রহ	:	৯,০০০ হাজার লক্ষ	
১১.	অবকাঠামো (সংখ্যা)			
	▪ মৎস্য/চিংড়ি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	:	০৬টি	
	▪ প্রশিক্ষণ একাডেমী	:	০১টি	
	▪ মৎস্য হ্যাচারি/মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার	:	৯৭৯টি	
	▪ বাগদা চিংড়ি হ্যাচারি	:	৬১ (সরকারি ২টি)	
	▪ গলদা চিংড়ি হ্যাচারি	:	৭০টি (সরকারি ১৭টি)	
	▪ চিংড়ির প্রদর্শনী খামার	:	০২টি	
	▪ চিংড়ি আহরণ ও সেবা কেন্দ্র	:	২০টি	
	▪ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র (বিএফডিসি)	:	০৯টি	
	▪ মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র (উপকেন্দ্র)	:	১০টি	
১২.	সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ ইউনিট (সংখ্যা)			
	▪ ট্রলার	:	১৬২টি	
	▪ ইঞ্জিন চালিত নৌকা	:	২১,৭২৬টি	
	▪ ইঞ্জিন বিহীন নৌকা	:	২৩,৯৬৩টি	
	▪ জাল ও বড়শী	:	২,৪২,৪৫০টি	
১৩.	মৎস্য প্রজাতি (সংখ্যা)			
	▪ মিঠা পানির মৎস্য প্রজাতি	:	২৬০টি	
	▪ বিদেশি মৎস্য প্রজাতি	:	১২টি	
	▪ মিঠা পানির চিংড়ি প্রজাতি	:	২৪টি	
	▪ সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতি	:	৪৭৫টি	
	▪ সামুদ্রিক চিংড়ি প্রজাতি	:	৩৬টি	
১৪.	মৎস্য সেক্টরের জনবল (২০১১-২০১২)	:	অনুমোদিত	বিদ্যমান
	▪ মৎস্য অধিদপ্তর	:	১ম শ্রেণি ৯৫২ জন	৬৬৪ জন
		:	২য় শ্রেণি ৬৩৪ জন	৩৪৬ জন
		:	৩য় শ্রেণি ১,৯৩৪ জন	১,৭৯২ জন
		:	৪র্থ শ্রেণি ১,৩২৮ জন	১,২৪৯ জন
		:	সর্বমোট ৪,৮৪৮ জন	৪,০৫১ জন
	বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট	:	২৪৬ (১ম শ্রেণি ৭৭ জন)	
	বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন	:	৭৯১ (১ম শ্রেণি ৯৪ জন)	

সংকলিত: মৎস্য সম্পদ জরিপ পদ্ধতি, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mofl.gov.bd

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ বিশ্বাস, এমপি মাননীয় মন্ত্রী	৯৫৪০৪৩০ (অ) ৯৫৪৫৫৫৫ (অ) ৮১৭১২২৬ (সংসদ) ৯৩৫৩৯৪৫ (বা) ৯৫৪০১৮২ (ফ্যা)
জনাব পিয়ার মোহাম্মদ মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব	৯৫৪০৯৩০ (অ)
জনাব হিলটন কুমার সাহা মাননীয় মন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব	৯৫৭৪৮১২ (অ)
জনাব মোঃ আলী হোসেন সিনিয়র জনসংযোগ কর্মকর্তা	৯৫৭৪৮১৯ (অ) ৯৬৬০০০৭ (বা)
জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম মাননীয় মন্ত্রীর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৭১৬২৪৩০ (অ) ৯৫৪৫৫৫৫ (অ)
জনাব মোঃ আব্দুল হাই, এমপি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী	৯৫৪০০৭৫ (অ)
জনাব প্রনব কুমার ঘোষ মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর পিএস	৯৫৪০০৭৯ (অ) ৯৩৪৭৬৭১ (বা)
জনাব এম আব্দুল হাকিম আহম্মেদ মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর এপিএস	৯৫৪০০৮১ (অ)
জনাব উজ্জ্বল বিকাশ দত্ত সচিব	৯৫৪৫৭০০ (অ) ৮৩৫৫৫৫২ (বা) ৯৫১২২০ (ফ্যা)
জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন সচিবের একান্ত সচিব	৯৫১৫৭৯৯ (অ) ৮৩৩৩১৭৫ (বা)
জনাব মোঃ আবুল খায়ের সচিবের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৭১৬৪৭০০ (অ)
জনাব মোশাররেফ হোসেন অতিরিক্ত সচিব	৯৫৭৪৪৯৫ (অ) ৯৩৩১৬২৫ (বা)
জনাব মোঃ আনিছুর রহমান যুগ্ম-সচিব (মৎস্য)	৯৫১৪২০১ (অ) ৯৬৬৯০৬৫ (বা)
জনাব মোঃ আশরাফ আলী যুগ্ম-সচিব (প্রাণিসম্পদ)	৯৫১৪৬৪৫ (অ) ৮০৫৬১৪৬(বা)
জনাব মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)	৯৫৪৫৫৬৩ (অ) ৮০৩৫৪৬৮(বা)
জনাব সরদার ইলিয়াস হোসেন যুগ্ম প্রধান	৯৫৪৫৯৬৯ (অ) ৮০৫৬২০৫ (বা)
জনাব এস. এম. আবু তাহের উপ-সচিব (প্রশাসন)	৯৫১৫৫২৭ (অ) ৮০৫৫২৪৮ (বা)
ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামাল উপ-সচিব (বাজেট)	৯৫৫১০০৭ (অ) ৮৩৬২৩৩৫ (বা)
জনাব মোঃ আব্দুল মালেক উপ-সচিব (মৎস্য-২ অধিশাখা)	৯৫৭৬৬৯৪ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
জনাব মোঃ আবদুস ছাত্তার উপ-সচিব (প্রশাসন-২ অধিশাখা)	৯৫৭৬৬৯৬ (অ) ৭১৯৩৪০০ (বা)
জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম উপ-সচিব (প্রশাসন-৩ অধিশাখা)	৯৫৪০৪০৭ (অ)
জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান সহকারী সচিব (প্রশাসন-৪অধিশাখা)	৯৫৫৩৮৪০ (অ)
ড. মোয়াজ্জেম হোসেন উপ-সচিব (মৎস্য-১অধিশাখা)	৯৫৭৭২৬২ (অ) ৮১১৩৭২৪ (বা)
জনাব মোঃ মুহিবুজ্জামান সিনিয়র সহকারী সচিব (মৎস্য-২ ও আইন)	৯৫৭৬৩৫৭ (অ)
জনাব এ এম সাইফুল হাসান উপসচিব (মৎস্য-৩ অধিশাখা)	৯৫৭৬৩৫৬ (অ)
জনাব মোঃ আব্দুল মালেক উপ-সচিব (মৎস্য-৪ অধিশাখা)	৯৫৭৬৬৯৪ (অ)
জনাব এ. কে. এম. ফজলুল হক উপ-সচিব (মৎস্য-৫ অধিশাখা)	৯৫৪৯১৪১ (অ) ৮০৫১৬৬৬ (বা)
বেগম দেলোয়ারা বেগম উপ-সচিব (প্রাণিসম্পদ-১ অধিশাখা)	৯৫৬৬৯৪৭ (অ)
কে এফ এম জেসমিন আখতার উপ-সচিব (প্রাণিসম্পদ-২ অধিশাখা)	৯৫৬১১১৭ (অ)
জনাব জগদীশ চন্দ্র বিশ্বাস উপ-সচিব (প্রাণিসম্পদ-৩ অধিশাখা)	৯৫৭৬৬৯৮ (অ) ৮৩৫৩৫৫৪(বা)
উপ-সচিব (প্রাণিসম্পদ-৪ অধিশাখা)	৯৫১৫৬৪৪ (বা)
জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান উপপ্রধান	৯৫৭৪৮১৪ (অ) ৯৩৫৪৩৮৩ (বা)
বেগম তানজিনা শাহরীন সহকারী প্রধান (মৎস্য পরিঃ -২)	৯৫৭৪৮১৭ (অ)
জনাব পুলকেশ মণ্ডল সিনিয়র সহকারী প্রধান (মৎস্য পরিঃ- ১ ও ৩)	৯৫৭৪৮১৬ (অ)
জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মুস্তাসিম বিল্লাহ সহকারী প্রধান (প্রাসঃ পরিঃ-১)	৯৫৬১৬৭৭ (অ)
জনাব এইচ, এম, মনিরুজ্জামান সিনিয়র সহকারী প্রধান (প্রাসঃ পরিঃ-২)	৯৫৬৫৭৭৫ (অ) ৮০৯০৩৯৬ (বা)
জনাব মোহাম্মদ আল মারুফ সহকারী প্রধান (মনিটরিং-১)	৭১৭০১০৮ (অ)
বেগম মাহ্‌মুদা মাসুম সহকারী প্রধান (মনিটরিং-২)	৯৫৫০৩৭১ (অ)
জনাব নজরুল ইসলাম আজাদ প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা মপ্রাম, সেগুনবাগিচা, ঢাকা	৮৩৫৬২৭৪ (অ)
জনাব মজিবুল হক মজুমদার সহকারী সচিব ও প্রটোকল অফিসার	০১৭২৬২১৩০০২

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	৯৫৭০৬৬০ (অ) ৯৬৫২৯০৯ (বা)
জনাব শহীদুল্লাহ, পিপিএসইউ	৯৫৬২১৫১ (অ)
জনাব আঃ জলিল মজুমদার স্টোর অফিসার	৭৩২০০০৯ (বা)

মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা www.fisheries.gov.bd	
সৈয়দ আরিফ আজাদ মহাপরিচালক dg@fisheries.gov.bd	৯৫৬২৮৬১ (অ) ৯৫৬৮৩৯৩ (ফ্যা) s_arif_azad@yahoo.com
জনাব কায়সার মুহাম্মদ মঈনুল হাসান সহকারী পরিচালক (স্টাফ অফিসার)	৯৫৬৯৯৩৪ (অ) hasankaisir@yahoo.com
সৈয়দ আরিফ আজাদ পরিচালক (অভ্যন্তরীণ)	৯৫৭১৮১২ (অ) s_arif_azad@yahoo.com
জনাব নিত্যরঞ্জন বিশ্বাস **প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা** (মাননিয়ন্ত্রণ)	৯৫৬৯৯৪৩ (অ) psofiqcdof@gmail.com
শেখ মুস্তাফিজুর রহমান প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (জরি. ও পরি.) (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	৯৫৬১৩৫৫ (অ) ৮৯৩২৪৮৪ (বা) sumonazma@yahoo.com
জনাব পরিমল চন্দ্র দাস উপপরিচালক (প্রশাসন)	৯৫৬৯৩৫৫ (অ) ৯৫৬৭২১৭ (ফ্যা) parimal.das58@yahoo.com
শেখ মুস্তাফিজুর রহমান উপপরিচালক (অর্থ ও পরিকল্পনা)	৯৫৫৩০৮৮ (অ) ৮৯৩২৪৮৪ (বা) sumonazma@yahoo.com
জনাব সুকমল চন্দ্র সূত্রধর উপপরিচালক (চিংড়ি)	৯৫৬১৭১৫ (অ) sutradhar.email@yahoo.com
জনাব মোঃ গোলজার হোসেন উপপরিচালক (মৎস্যচাষ)	৯৫৬১৫৯২ (অ) ddaqua@fisheries.gov.bd
জনাব আ.ক.ম. আজিজুল হক মোল্লা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)	৯৫৫৪৭১৬ (অ) ahoque1957@gamil.com
ড. মোঃ ফজলুর রহমান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)	৯৫৬৯৩২০ (অ) fazluldof2005@yahoo.com
বেগম আখতার জাহান চৌধুরী উপপ্রধান (বাস্তবায়ন)	৯৫৬৫০২১ (অ) ৯৬৬২৭৯০ (বা)
জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম উপপ্রধান (সামুদ্রিক শাখা)	৯৫৬৫০২৩ (অ) serajdof1955@gmail.com
জনাব মোঃ জাকির হোসেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (অ.দা.)	৯৫৬০৪৫৭ (অ) zakir_aul@yahoo.com
জনাব মোঃ আতিকুর রহমান ভূঁইয়া সহকারী পরিচালক (লিগাল শাখা)	৯৫৫০২৮০ (অ) atiquedof@yahoo.com
জনাব মোঃ ইউসুফ খান প্রধান সমন্বয়কারী ও সহকারী পরিচালক(আইসিটি শাখা)	৭১৬২৮০৪ (অ) yousuf@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ জাহিদ হোসেন সহকারী পরিচালক (অর্থ)	৯৫৫৪৯৯২ (অ) zahid_dof@yahoo.com
জনাব মোঃ মজিবুর রহমান সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	৯৫৬১৪৩৭ (অ) majibdof@yahoo.com

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
বেগম শামীম আরা বেগম সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-২)	৯৫৬৬১০৩ (অ) admin-2@fisheries.gov.bd
ড. মোঃ মোতাহার হোসেন সহকারী পরিচালক (জলমহাল)	৯৫৭১৬৯৬ motaher@fisheries.gov.bd
জনাব এ কে এম লুৎফুর রহমান সিদ্দীক সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-১)	৯৫৬৭২১৮ (অ) lutfor.dhaka@yahoo.com
ড. আলী মোহাম্মদ ওমর ফারুক সহকারী পরিচালক (সরবরাহ ও সেবা)	৯৫৬৭২১৯ (অ) faruqamo@yahoo.com
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান ছিদ্দিকী সহকারী পরিচালক (মৎস্য চাষ)	৯৫৬০৫১৭ (অ) faruqamo@yahoo.com
জনাব কৃষ্ণেন্দু সাহা প্রধান মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	৯৫৬৭২২০ (অ) sakrisna05@yahoo.com
বেগম শিল্পী দে সহকারী পরিচালক (সমন্বয়)	৯৫৬৯০৪১ (অ) shilpiplus@yahoo.com
বেগম তানমী শাহরীন সহকারী পরিচালক (রিজার্ভ) ডোসিয়ার	৯৫৬৯০২৬ (অ)
জনাব এস এম মনিরুজ্জামান সহকারী পরিচালক (মাননিয়ন্ত্রণ)	৯৫৫৪৭১৬ (অ)
সরকার মুহাম্মদ রফিকুল আলম সহকারী পরিচালক **(অডিট)**	৯৫৭১২৪৪ (অ) sarkeripon@gamil.com
বেগম উম্মে কুলসুম ফেরদৌসী সহকারী পরিচালক	৮৩৫৫৫২৬ (অ) ferdousi02@yahoo.com
বেগম ফিরোজা বেগম সহকারী প্রধান (বাস্তবায়ন)	৯৫৬৫০২১ (অ)
জনাব মোঃ সৈয়দ হোসেন ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (জরিপ)	৯৫৬৯২৯৫ (অ) ৮৩৫৫৩৪৫ (বা)
জনাব মোঃ ফিরোজ আহমেদ শিকদার নির্বাহী প্রকৌশলী	৯৫৬০৫৪৩ (অ)
তথ্য সেবা কেন্দ্র ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	৯৫৫৫৩৪৯ (অ)
সাধারণ শাখা	৯৫৫৪৮৭৫ (অ)
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৯৫৬১৫৮৮ (অ)

মৎস্য অধিদপ্তরের প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দ	
প্রকল্প পরিচালক (অতি. পরিচালক) বাঁওড় মৎস্যচাষ প্রকল্প (রাজস্ব), যশোর	০৪২১-৬৩১০৮ (অ)
জনাব এ বি এম আনোয়ারুল ইসলাম এনপিডি, বিএমএফসিবি প্রকল্প	৯৫৫৪৫৭৭ (অ) ৭১১১৫৪৪ (ফ্যা)
জনাব মোঃ আবুল খায়ের ডিএনপিডি, বিএমএফসিবি প্রকল্প	৯৫৬০৪৭২ (অ) khair2222@yahoo.com
জনাব মোহাঃ আতিয়ার রহমান এডি, বিএমএফসিবি প্রকল্প	৯৫৫৬৮০৯ (অ) atiar_dof@yahoo.com
জনাব মোঃ গোলজার হোসেন পরিচালক, এনএটিপি (মৎস্য অধিদপ্তর অংশ)	৯৫৬১৬৮৫ (অ) ৯৫৬৯৯৮৯ (ফ্যা) goljardof@yahoo.com
জনাব খঃ মাহবুবুল হক এডি, এনএটিপি (মৎস্য অধিদপ্তর অংশ)	৯৫১৩৬১৬ (অ) kmahbubh252@yahoo.com

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
জনাব মোঃ জর্জিসুর রহমান এডি, এনএটিপি (মৎস্য অধিদপ্তর অংশ)	৯৫১৩৬১৬ (অ) jarzisurrahman@ymail.com
জনাব সরকার ফিরোজ আহমেদ মুকুল এডি, এনএটিপি (মৎস্য অধিদপ্তর অংশ)	৯৫৫৫৩৫১ (অ) sarkerferoz@yahoo.com
বেগম মোছাঃ নাছিমা সুলতানা বাজেট ও হিসাবরক্ষণ অফিসার, এনএটিপি	৯৫১৩৬১৬ (অ) popydof63@yahoo.com
জনাব জোয়াদ্দার মোঃ আনোয়ারুল হক পিডি, ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রকল্প	৯৫১৩৫০৭ (অ) anwarulhaque35@yahoo.com
জনাব মোঃ আব্দুস সালাম **এডি,** ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রকল্প	৯৫১১১৫০ (অ) salam_dof@59@yahoo.com
জনাব মোঃ আব্দুল মালেক পিডি ও উপসচিব, এফসিডিআই প্রকল্প	৯৫৭৬৬৯৪ (অ)
জনাব কাজি ইকবাল আজম পিডি, চিহ্নিত জলাশয় প্রকল্প	৯৫৫৩১৩৩ (অ) kibalazam2012@gmail.com
জনাব মোঃ সামছুজ্জামান খান এডি, চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয় উন্নয়ন প্রকল্প	৯৫৫৬৬৮৫ (অ)
জনাব ছালেহ আহমদ এনপিডি, BEST প্রকল্প	৯৫৫৯১২১ (অ) saleh_ahmednpd@yahoo.com
জনাব মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান এডি, BEST প্রকল্প	৯৫৫৯১৪৫ habib.ict94@yahoo.com
জনাব এ বি এম শাব্বীর এডি, BEST প্রকল্প	৯৫৫৯১৯৯ (অ) abm_sabbir@yahoo.com
জনাব মোঃ সিরাজুর রহমান পিডি, অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ এলাকার প্রকল্প	৯৫১১৯৯৬ (অ) serajurrahman62@yahoo.com
বেগম প্রভাতি দেব পিডি, হালদা প্রকল্প	০৩১-২৫৮০৯৮২ (অ) provatideb@gmail.com
মোঃ মোখলেছুর রহমান প্রকল্প সমন্বয়কারী, IAPP	৯১০৪৬৬৭ (অ) makhles.labu@gmail.com
জনাব এ বি এম জাহিদ হাবিব পিডি, জাটকা সংরক্ষণ প্রকল্প	৯৫১৩৮৫৭ (অ) abmjahidhabib@yahoo.com
ড. নির্মল চন্দ্র রায় এডি, জাটকা সংরক্ষণ প্রকল্প	৯৫১৩৮৫৮ (অ)
বেগম মাসুদ আরা মমি এডি, জাটকা সংরক্ষণ প্রকল্প	৯৫১৩৮৫৮ (অ)
জনাব মোঃ আবুল হাশেম পিডি, WBRP	৯৫৬৯৯৪৫ (অ) hashemsumon@yahoo.com
জনাব মোঃ তৌহিদুর রহমান এপিডি, WBRP	৯৫১৪০৪২ (অ) ৯৫১৪০৪১ (ফ্যা)
জনাব তপন কুমার পাল পিডি, হাওর অঞ্চলে মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	৯৫৫৬২৮৯ (অ) tapanaddof@yahoo.com
ড. মোঃ আব্দুস সবুর এডি, হাওর অঞ্চলে মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	৯৫৫৬২৮৪ (অ) asabur030856@yahoo.com
জনাব মোঃ জাকির হোসেন পিডি, মৎস্য স্থাপনা পুনর্বাসন ও উন্নয়ন প্রকল্প	৯৫৬০৪৫৭ (অ) zakir_zul@yahoo.com
জনাব মোঃ আব্দুর রেজ্জাক সহকারী পরিচালক, মৎস্য স্থাপনা পুনর্বাসন প্রকল্প	৯৫৬০৪৫৭ (অ)
ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম এডি, মৎস্য স্থাপনা পুনর্বাসন ও উন্নয়ন প্রকল্প	৭১১৪৭০৯ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
জনাব মোঃ আরিফুর রহমান তরফদার পিডি, জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান প্রকল্প	৯৫৫২১৭৯ (অ) arif@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ মিজানুর রহমান পিডি, ভবদহ প্রকল্প, যশোর	০৪২১-৬১৪৩৬ (অ) mrbe47@gmail.com
ড. আবদুল কাদির পিডি, বৃহত্তর ফরিদপুর মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প	৬৬৮২২৩১ (অ) akadir_bau@yahoo.com
ড.মোঃ রিয়াজ উদ্দিন সরকার এনপিডি, মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট স্থাপন প্রকল্প	৯৫১২৫৮৮ (অ) reaz_phd@yahoo.com
জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম পিডি, স্বাদুপানির চিংড়ি চাষ প্রকল্প	০১৭১১-০০৩০৫৩ mdrafiq1101@gmail.com
জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান পিডি, ব্রুড ব্যাংক স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়)	৯৫৫৮০৭০ (অ) pdbroodbank@fisheries.gov.bd
ড. বিনয় কুমার চক্রবর্তী পিডি, মৎস্য ডিপ্লোমা কোর্স বাস্তবায়ন প্রকল্প	৭১১৯০৪২ (অ) bbroty@gmail.com
জনাব মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন এডি, মৎস্য ডিপ্লোমা কোর্স বাস্তবায়ন প্রকল্প	৯৫৬১৮২০ (অ) mdhjamil@gmail.com
ড. জি এম শামসুল কবীর পিডি, ফরমালিন প্রকল্প	৯৫৬৮১১৯ (অ) gmskabir@yahoo.com
জনাব মোহাঃ ওবাইদুল্লাহ্ পিডি, বৃহত্তর পাবনা প্রকল্প ও গাজনা বিল প্রকল্প	০৭৩১-৬৬০৬৮ (অ) ০৭৩১-৬৪৫১৫ (ফ্যা) obaidullah1961@yahoo.com
জনাব মোঃ আবদুল হান্নান মিয়া পিডি, পাঃ চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্যচাষ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	০৩৫১-৬১৩৩৯ (অ) ০৩৫১-৬৩৬৮৬ (অ)
জনাব মেঃ মনোয়ার হোসেন পিডি, আরএফএলডিসি (বরিশাল কম্পোনেন্ট)	০৪৩১-২১৭৬২৯৩(অ) monwar.hossain@gmail.com
জনাব হরেন্দ্র নাথ সরকার পিডি, হুরা সাগরে মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	০৭৫১/৬২১৩৭ harendof@yahoo.com
ড. আ ন ম আজিজুল ইসলাম খান ফোকাল পয়েন্ট, সাইক্লোন সিডর প্রকল্প	৯৫৬০৬৫৩ (অ) azizuldof@yahoo.com
জনাব আব্দুর রশিদ ঢালী ডিপিডি, সিবিএসিসি-সিএফ প্রকল্প	৯৫৬৫০২১ (অ) rashid3157@gmail .com

সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, চট্টগ্রাম	
জনাব নাসিরউদ্দিন মোঃ হুমায়ূন পরিচালক	০৩১-৭২১৭৩১ (অ) nasir_dof@yahoo.com
উপপরিচালক	০৩১-২৫২৬৭৮৪ (অ)
জনাব নাসিরউদ্দিন মোঃ হুমায়ূন পিএসও, সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা	০৩১-২৫২৮২৮২ (অ) ০৩১-৭২৪২০৬ (ফ্যা)
জনাব মোঃ ইকবাল হারুন সহকারী পরিচালক	০৩১-২৫১৭৩৯০ (অ) adhir_arnab@yahoo.com
জনাব অধীর চন্দ্র দাস সহকারী পরিচালক	০৩১-২৫১৭৩৯০ (অ) adhir_arnab@yahoo.com

মৎস্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ	
জনাব মোঃ আব্দুল জলিল পরিচালক (অ.দা.), এফটিএ, সাভার	৭৭১২৫১৮ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
জনাব মোহাম্মদ হাসান অধ্যক্ষ, এফটিআই, চাঁদপুর	০৮৪১-৬৩৪০২ (অ)
কাজী মাহবুবুল হক অধ্যক্ষ, এফটিইসি, ফরিদপুর	০৬৩১-৬২৪৫৭ (অ)
জনাব এস. এম. মহিব উল্যাহ এসএসও, এফবিটিসি, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর	০৩৮২২-৫৬০৩৭ (অ) ০৩৮২২-৫৬০৩৯ (ফ্যা)
জনাব তপন কুমার দাস প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা, এফবিটিসি, পার্বতীপুর	০৫৩৩৪-৭৪৩২৪ (অ)
জনাব মোঃ ইসহাক আলী খামার ব্যবস্থাপক, এফটিসি, পার্বতীপুর	০৫৩৩৪-৭৪৪০২ (অ)
কাজী হেলেনা আরজু প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা, এফটিসি, কোটচাঁদপুর	০৫৩৩৪-৭৪৩২৪ (অ)

মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তরসমূহ	
জনাব ছালেহ আহমদ উপপরিচালক, ঢাকা	৭১৬৮৩৮০ (অ)
জনাব মোঃ মানিক মিয়া মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা (ল্যাব), ঢাকা	৯৫৬২৩৩৪ (অ) miamanik443@yahoo.com
জনাব মোঃ বেলাল হোসেন মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা (পরিদর্শন), ঢাকা	৯৫৬৩৬৭৪ (অ)
বেগম প্রভাতী দেব উপপরিচালক, চট্টগ্রাম	০৩১-৬৮২৬০৩ (অ)
জনাব মোঃ আব্দুর রাশেদ উপপরিচালক, খুলনা	০৪১-৭৬০৪৯৫ (অ)
জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম সরদার মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা, খুলনা	০৪১-৫৮৫০১৭৯ (ফ্যাক্স)

কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারমাড়ি, ঢাকা	
জনাব মোঃ রেজওয়ানুল ইসলাম পরিচালক	৯১১২২৬০ (অ)
সৈয়দ খোরশেদ জাফরী প্রধান তথ্য অফিসার	৮১৩০৪৭২ (অ) ৭২৭৪৯৭৬ (বা)
ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম ফার্ম ব্রডকাস্টিং অফিসার	৯১১৪২৬৪ (অ)

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা	
জনাব মকুল চন্দ্র রায় মহাপরিচালক	৯১৪০৮৫০ (অ) ৮৯৫৯০৫২ (বা)
জনাব মোঃ মতিয়ার রহমান পরিচালক (সরেজমিন উইং)	৮১২৩১৪৭ (অ)
জনাব মোঃ আবু হানিফ মিয়া পরিচালক (উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং)	৯১৩১২৯৫ (অ) ৭২১১৭৫০ (বা)
জনাব অনিল চন্দ্র সরকার পরিচালক (খাদ্য শস্য উইং)	৯১১৭০৩০ (অ) ৮১২৭৭৪৮ (বা)
জনাব মোঃ আব্দুল কুদ্দুস পরিচালক (প্রশিক্ষণ উইং)	৮১২৩৬৪৩ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা	
ডা. মোঃ মোসাদ্দেক হোসেন মহাপরিচালক	৯১০১৯৩২ (অ)
ডা. মোঃ মোসাদ্দেক হোসেন পরিচালক (প্রাণিস্বাস্থ্য ও প্রশাসন)	৯১১৭৭৩৬ (অ)
জনাব পার্থ রথী সরকার পরিচালক (সম্প্রসারণ)	৮১২৩৮৮১ (অ) ৯১৩১৪০৪ (অ)
জনাব মোঃ খাজা নাজিমুদ্দীন পরিচালক (উৎপাদন)	৯১১৭৪৫৮ (অ)
ড. মোজাম্মেল হক সিদ্দিকী পরিচালক (গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন)	৯৮৯৮৮৯৬ (অ)

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা	
ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম মহাপরিচালক	৭৭৯১৬৭৬ (অ)

পরিকল্পনা কমিশন, শের-এ-বাংলা নগর, ঢাকা	
ড. এম এ সাত্তার মণ্ডল সদস্য (কৃষি)	৯১৮০৭৯৯ (অ) ৯০১০৩১৫(বা)
জনাব নুর মোঃ মেসবাহুল কুদ্দুস একান্ত সচিব	৯১৮০৬৪৮ (অ)
জনাব মোঃ জাহিদ হোসেন বিভাগ প্রধান	৯১১১৭২৫ (অ)
ড. মোঃ শাহজাহান আলী খন্দকার যুগ্ম-প্রধান (বমপ্রাও সমন্বয়)	৯১৮০৭৫৮ (অ)
বেগম ইস্‌রাত জাহান তস্‌লিম উপ-প্রধান (মওপ্রা)	৯১১৭৫৪৬ (অ) ৯৬৬১৩৬৩ (বা)
বেগম শাহিনা সুলতানা সহকারী প্রধান (মওপ্রা)	৯১১৭০৩৯ (অ)

আইএমইডি, শের-এ-বাংলা নগর, ঢাকা	
জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন সচিব	৯১৮০৭৬১ (অ) ৯৩৩৪৪০৭ (বা)
প্রধান	৮১১২৭১৩ (অ)
জনাব অমুল্য কুমার দেবনাথ মহাপরিচালক, CPTU	৯১৪৪২৫২ (অ) ৮১২৬১৮৭ (বা)
জনাব আবু জাফর মোঃ ফরিদ উদ্দিন চৌধুরী, পরিচালক (কৃষি)	৯১৩২৭৫৬ (অ)

ইআরডি, শের-এ-বাংলা নগর, ঢাকা	
জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ সচিব	৯১১৩৭৪৩ (অ)
জনাব আরাস্ত খান অতিরিক্ত সচিব	৯১৮০৬৭৫ (অ) ৯৮৯০৯৫৫ (বা)

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা	
ড. ওয়ায়েস কবির নির্বাহী চেয়ারম্যান	৯১৩৫৫৮৭ (অ) ৯০১৪৯৭৫ (বা)
ড. কবীর ইকরামুল হক সদস্য পরিচালক (মৎস্য)	০১৭১১-৪৬৬৪২৪

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ, খামারবাড়ি, ঢাকা	
কৃষিবিদ আ. ফ. ম. বাহাউদ্দিন নাছিম সভাপতি	৯১১৪১০৭ (অ)
কৃষিবিদ মোহাম্মদ মোবারক আলী মহাসচিব	৯১১১৪৩২ (অ)

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, মতিঝিল, ঢাকা	
জনাব পিউস কস্তা চেয়ারম্যান	৭১৬২০০১ (অ) ৮৩৬০১৬৬ (বা)
জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন খান পরিচালক (অর্থ)	৭১৬২৮০০ (অ) ৯৩৩১৩৫৭ (বা)
জনাব মোঃ মজিবুর রহমান পরিচালক (ক্রয় ও বিপণন)	৯৫৬৪০০৭ (অ)
জনাব তৌহিদা বুলবুল সচিব	৯৫৫২৬৮৯ (অ)

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর	
ড. মোঃ সাইদুল ইসলাম মহাপরিচালক	৯২৫২৭৩৬ (অ) ৯২৬৩৬৪২ (বা)

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর	
ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম মন্ডল মহাপরিচালক	৯২৫২৭১৫ (অ) ৯১২৪১৭৪ (বা)

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন	
জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ চেয়ারম্যান	৯৫৬৪৩২৮ (অ)

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা	
জনাব মোঃ শেফাউল করিম উপপরিচালক (উপ-সচিব)	৭১৬৯৪৫৪ (অ)
জনাব সাজ্জাদ হোসেন তথ্য অফিসার (মৎস্য)	৭১৬৯৪৫৩ (অ)

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট	
ড. সুভাষ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাপরিচালক	০৯১-৬৫৮৭৪ (অ) ফ্যাক্স: ০৯১-৬৬৫৫৯
ড. মাসুদ হোসেন খান পরিচালক (প্রশাসন), ময়মনসিংহ	০৯১-৬১২৩১ (অ)
ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ সিএসও, নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর	০৮৪১-৬৩৪০৭ (অ) yahiamahmud@yahoo.com
ড. শ্যামলেন্দু বিকাশ সাহা সিএসও, লোনাপানি কেন্দ্র, পাইকগাছা	০৪০২৭-৫৬০০৭ (অ) saha_sb@yahoo.com
মোঃ জাহের সিএসও, সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজার	০৩৪১-৬৩৮৫৫ (অ) shahabuddin10@live.com
জনাব খান কামাল উদ্দিন আহমেদ সিএসও, চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র, বাগেরহাট	০১৭১২-১০৩২৮১
জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম এসএসও, নদী উপকেন্দ্র, রাঙ্গামাটি	০৩৫১-৬২১৫৯ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
জনাব মোঃ আমিরল ইসলাম এসএসও, স্বাদুপানি উপকেন্দ্র, যশোর	০৪২১-৬৮৯৮২ (অ)

মৎস্য বিষয়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহ	০৯১-৬৭৪০১০৬ ফ্যাক্স: ৬১৫১০
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা	০৪১-৭২১৩৯৩ ফ্যাক্স: ৭৩১২৪৪
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	৯৬৬১৯০০-১৯ ফ্যাক্স: ৮৬১৫৫৮৩
শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	৯১৪৪২৭০-৮
বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর	৯২০৫৩১০-১৪
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	০৭২১-৭৫০৭৮৩
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	০৩১-৭১৪৯৪৯
মেরিন ফিসারিজ একাডেমী, চট্টগ্রাম	০৩১-৬৩৪৩৭৫
হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর	০৫৩১-৬৫৪২৯
মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল	০৯২১-৫৫৩৯৯
জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়	৭৭০৮৪৭৮-৮৫
সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	০৮২১-৭৬০৯৩০
পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	০৪৪২৭-৫৬০১৪
শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব ফিসারিজ কলেজ, মেলান্দহ, জামালপুর	০১৭১১৬১৩৩০১ (অধ্যক্ষ)

অন্যান্য প্রতিষ্ঠান	
অ্যাটর্নী জেনারেল, বাংলাদেশ	৯৫৬২৮৬৮ (অ)
বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা	৭৭৪৫০১০-১৬
বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন	৯১১৭৪৭৬ (সি. স্কেল) ৯১৪৩২০৪ (বিভাগীয়)
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লা	০৮১-৬৩৬০০
মেরিন ফিসারিজ এসোসিয়েশন, ঢাকা	৯১২০২৩৪
ভাইস-চেয়ারম্যান, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো	৮১৫১৪৯৭
প্রেসিডেন্ট বিএফএফইএ, ঢাকা	৮৩১৬৮৮২ ৮৩১৭৫৩১
ভাইস-প্রেসিডেন্ট বিএফএফইএ, খুলনা অঞ্চল	০৪১-৮১৩২৯২ (অ) ০৪১-৮১২৯২৫ (ফ্যা)
ভাইস-প্রেসিডেন্ট বিএফএফইএ, চট্টগ্রাম অঞ্চল	০৩১-৭২৪৯৪৫ (অ) ০৩১-২৫১১৮৮৭ (ফ্যা)
বাংলাদেশ শ্রিম্প এন্ড ফিস ফাউন্ডেশন ঢাকা	৮৪১৭৭৩১ (অ) ৮৪১২৭০৯ (ফ্যা)
প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ অ্যাকোয়াকালচার এলায়েন্স	৮৩৯১৫৯৪ (অ)
সমন্বয়ক ফিসারিজ প্রোডাক্ট বিজনেস প্রোমোশন কাউন্সিল	৯৫১৪৪৩৪ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
ঢাকাস্থ আন্তর্জাতিক সংস্থা	
বিশ্ব ব্যাংক	৮১৫৯০০১
এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক	৮১৫৬০০০-৮
বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি	৯৫৬৯৩২০
এফএও	৮১১৮০১৫-৮
ইউএনডিপি	৮১৫০০৮৮
ওয়ার্ল্ডফিস	৮৮১১১৫১
ইউরোপীয় ইউনিয়ন	৯৮৬২১৯৯
আইইউসিএন	৯৮৯০৪২৩
জাইকা	৮১২৪৫৫১-৩
আইএমএফ	৯৫৫০২৭৫
ইউনিসেফ	৮৫২২৬৬
বিশ্ব খাদ্য সংস্থা	৮১১৮৪০৮
ঢাকা বিভাগ	
বেগম ফরিদা বেগম উপপরিচালক	৯৫৫০৮২২(অ) ৯৫৬৫০২২(ফ্যা) dddhaka@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম সহকারী পরিচালক	৯৫৬৫০২২(অ) nazruldof1959@gmail.com
ঢাকা জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	৯৫৫৮৮৮৩(অ) dfodhaka@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাভার	৭৭৪৭৫৩৪(অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ধামরাই	০৬২২২-৭১১৪৭(অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কেরাণীগঞ্জ	৭৭৬৬৪৭৭(অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দোহার	০৩৮৯৪-৬৮০০২৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নবাবগঞ্জ	০৬২২৫-৫৬২৪৯(অ)
মানিকগঞ্জ জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা dfomanikgonja@fisheries.gov.bd	৭৭১০৩৯১(অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	৭৭১০৭৯৩(অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শিবালয়	৭৭১৬২৪১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সিঙ্গাইর	৭৭১৭১৯১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঘিওর	৭৭২৭৩৪১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাটুরিয়া	৭৭২৫০৬৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দৌলতপুর	৭৭১৫১৬৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হরিরামপুর	৭৭২৮০৪৬ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, সদর	৭৭১১৫২৩ (অ)
মুন্সীগঞ্জ জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা dfomunshigonja@fisheries.gov.bd	৭৬১১৫৯১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	৭৬১২৩৭৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শ্রীনগর	৭৬২৭৩২৩ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সিরাজদিখান	০৬৯২৪-৮৮০২৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, টঙ্গীবাড়ী	৭৬১৮২৪৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লৌহজং	৭৬২৫২৭৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গজারিয়া	৭৬১৬২৩২ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
খামার ব্যবস্থাপক, মুন্সীগঞ্জ সদর	৭৬১১৫৮৩ (অ)
গাজীপুর জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা dfo.gazipur@fisheries.gov.bd	০২-৯২৫২৫২০ (অ) ০২-৯২০৫২৭৯ (বা)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,সদর	০২-৯২০৫২৪৯ (অ)
সি, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শ্রীপুর	০৬৮২৫-৫১০৪২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাপাসিয়া	০৬৮২৪-৫১৩৯৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালিয়াকৈর	০৬৮২২-৫১১৪৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালীগঞ্জ	০৬৮২৩-৫১১০৭ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, টঙ্গী	০২-৯২৯১৩১৭ (অ)
নরসিংদী জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা dfo.narsingdi@fisheries.gov.bd	০২-৯৪৬২৪১০ (অ) ০২-৯৪৫১৩০০ (বা)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০২-৯৪৬২৪৫২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রায়পুরা	০৬২৫৫-৫৬১৪৮ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শিবপুর	০৬২৮-৭৫০৯৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পলাশ	০৬২৮-৭৪৪১৬ (অ)
	০৬২৫২-৬৩১০৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মনোহরদী	০৬২৫৩-৫৬১৪৫ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, নরসিংদী সদর	০২-৯৪৬৩০০৬ (অ)
নারায়ণগঞ্জ জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা dfonarangonj@fisheries.gov.bd	০২-৭৬৩০৬২৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০২-৭৬৪৮৩৫৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সোনারগাঁও	০২-৭৬৫৬৩০১ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আড়াইহাজার	০২-৭৬৫৪০৪২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বন্দর	০২-৭৬৬১১১৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রূপগঞ্জ	০২-৭৬৫০০২৭ (অ)
ফরিদপুর জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা dfofaridpur@fisheries.gov.bd	০৬৩১-৬৩২২৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৬৩১-৬৬৬১২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বোয়ালমারী	০৬৩২৪-৫৬২৮৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আলফাডাঙ্গা	০৬৩২২-৫৬১২২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নগরকান্দা	০৬৩২৭-৫৬৩২০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মধুখালী	০৬৩২৬-৫৬১৫২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চরভদ্রাসন	০৬৩২৫-৫৬০৬৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভাঙ্গা	০৬৩২৩-৫৬৫৪৮ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, ফরিদপুর সদর	০৬৩১-৬৩৯৯০ (অ)
রাজবাড়ী জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা dforajbari@fisheries.gov.bd	০৬৪১-৬৫৫৮৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৬৪১-৬৫০৫৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পাংশা	০৬৪২৪-৭৫০৬৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বালিয়াকান্দি	০৬৪২-৫৬০২৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোয়ালন্দ	০৬৪২৩-৫৬৩৮০ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
খামার ব্যবস্থাপক, রাজবাড়ী সদর	০৬৪১-৬৫৩৬৪ (অ)
মাদারীপুর জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা dfomadaripur@fisheries.gov.bd	০৬৬১-৬১৪৪২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৬৬১-৫৫৪১৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালকিনি	০৬৬২২-৫৬১৮৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাজৈর	০৬৬২৩-৫৬১৪৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শিবচর	০৬৬২৪-৫৬১২৯ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, মাদারীপুর সদর	০৬৬১-৬২১২১ (অ)
গোপালগঞ্জ জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা dfogopalgonj@fisheries.gov.bd	০২-৬৬৮৫৪৫৪ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০২-৬৬৮৫৬১৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, টুঙ্গীপাড়া	০২-৬৬৫৬৩৫৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মুকসেদপুর	০৬৬৫৪-৫৬২৪৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাশিয়ানী	০৬৬৫২-৫৬২০৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কোটালীপাড়া	০২-৬৬৫১৩১৫ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, গোপালগঞ্জ সদর	০২-৬৬৮৫৯৪২ (অ)

শরীয়তপুর জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৬০১-৬১৪৮২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৬০১-৬১৪৮২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জাজিরা	০৬০২৭-৫৬০৭৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভেদরগঞ্জ	০৬০২২-৫৬২২৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোসাইরহাট	০৬০২৪-৭৫৭৭৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ডামুড্যা	০৬০২৩-৫৬৩৩৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নড়িয়া	০৬০১-৫৯১৪৫ (অ)

ময়মনসিংহ জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা dfomymensingh@fisheries.gov.bd	০৯১-৬৬৭৪৮ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৯১-৬৬১৫০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গৌরীপুর	০৯০২৪-৫৬০৯৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফুলপুর	০৯০২৪-৫৬০১৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নান্দাইল	০৯০২৯-৬৪৩৬০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ত্রিশাল	০৯০৩২-৫৬০৫৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঈশ্বরগঞ্জ	০৯০২৯-৫৬০৫৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মুক্তাগাছা	০৯০২৮-৭৫৩৫১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফুলবাড়ীয়া	০৯০২৩-৭৩০৪৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভালুকা	০৯০২২-৫৬০৫০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গফরগাঁও	০৮০২৫-৫৬২২৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হালুয়াঘাট	০৯০২৬-৫৬১৩৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ধোবাউড়া	০৯০৩৪-৫৬০৮৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গৌরীপুর	০৯০২৪-৫৬০১৬ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, শম্ভুগঞ্জ	০৯১-৬৬৩৩৯ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
খামার ব্যবস্থাপক, মাসকান্দা	০৯১-৬৬১৫৮ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, গৌরীপুর	০৯০২৭-৫৬০১৬ (অ)
কিশোরগঞ্জ জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা dfokishorgonj@fisheries.gov.bd	০৯৪১-৬১৯২৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৯৪১-৬১৭১২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, করিমগঞ্জ	০৯৪২৭-৫৬০১৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভৈরব	০৯৪২৪-৭১৭১৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাজিতপুর	০৯৪২৩-৬৪২৯১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কটিয়াদী	০৯৪২৮-৫৬১৫২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কুলিয়ারচর	০৯৪২৯-৫৬১৬৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মিঠামইন	০৯৪৩৫-৫৬০২৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পাকুন্দিয়া	০৯৪৩৩-৫৬০৩১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তাড়াইল	০৯৪৩৪-৭৫১৮১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ইটনা	০৯৪২৬-৫৬০৫৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, অষ্টগ্রাম	০৯৪২২-৫৬০৫৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হোসেনপুর	০৯৪২৫-৫৬০২৮ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, কিশোরগঞ্জ সদর	০৯৪১-৬১৮৬৯ (অ)
কার্প হ্যাচারি কমপ্লেক্স, কটিয়াদি	০৯৪২৮-৫৬০৪৭ (অ)
নেত্রকোনা জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা dfonetrokona@fisheries.gov.bd	০৯৫১-৬১৪০৪ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৯৫১-৬১৩৫৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মোহনগঞ্জ	০৯৫২৪-৫৬০৪৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বারহাট্টা	০৯৫২৩-৫৬০৮৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কেন্দুয়া	০৯৫২৮-৫৬০০২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আটপাড়া	০৯৫২২-৭৪০৫৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পূর্বধলা	০৯৫৩২-৫৬১২৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মদন	০৯৫২৯-৫৬১৬৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কলমাকান্দা	০৯৫২৭-৫৬১৩৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, খালিয়াজুরী	০৯৫২৬-৫৬০৩৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দূর্গাপুর	০৯৫২৫-৫৬৩৪৪ (অ)
জামালপুর জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা dfojamalpur@fisheries.gov.bd	০৯৮১-৬৩৬২০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৯৮১-৬৩২০৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ইসলামপুর	০৯৮২৪-৭৪১৭১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দেওয়ানগঞ্জ	০৯৮২৩-৭৫১২৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মাদারগঞ্জ	০৯৮২৫-৫৬১০২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সরিষাবাড়ী	০৯৮২৭-৫৬২৬১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বকসীগঞ্জ	০৯৮২২-৫৬১৮৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মেলান্দহ	০৯৮২৬-৫৬১৮০ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, জামালপুর সদর	০৯৮১-৬৩৩৫১ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, মেলান্দহ	০৯৮২৬-৬৬১৮৪ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
শেরপুর জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা dfosherpur@fisheries.gov.bd	০৯৩১-৬১৪৪৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,সদর	০৯৩১-৬২৪৭৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নকলা	০৯৩২৩-৭৫০৬০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নালিতাবাড়ী	০৯৩২৪-৭৩৩০৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঝিনাইগাতী	০৯৩২২-৭৪০৪২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শ্রীবর্দী	০৯৩২৫-৫৬০৭৯ (অ)
টাঙ্গাইল জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা dfotangail@fisheries.gov.bd	০৯২১-৬৩৬৭৮ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৯২১-৫৪০৭১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মির্জাপুর	০৯২২৯-৫৬২২৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নাগরপুর	০৯২৩৩-৭৩০৫০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোপালপুর	০৯২২৬-৭৫১৪২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভূয়াপুর	০৯২২৩-৫৬১৮৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালিহাতী	০৯২২৭-৭৪০৭০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাসাইল	০৯২২২-৫৬১২১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সফিপুর	০৯২৩২-৫৬১৮৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দেলদুয়ার	০৯২২৪-৫৬০৪৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঘাটাইল	০৯২২৫-৫৬০১০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মধুপুর	০৯২২৮-৫৬০৮৫
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ধনবাড়ী	০৯২২৮-৫৬২৯৯

খুলনা বিভাগ	
জনাব মোঃ রকিব উদ্দিন বিশ্বাস উপপরিচালক	০৪১-৭৬২৬৩৫ (অ) ০৪১-৮৬০০১৫ (ফ্যা) ddkhulnaa@fisheries.gov.bd
জনাব আ ক ম শফিকউজ্জামান সহকারী পরিচালক	০৪১-৮৬০৫৮৩ (অ) shafiqmukul@ymail.com
সৈয়দ আব্দুল কাইয়ুম সহকারী পরিচালক , ইউনিয়ন পর্যায় প্রকল্প	০৪১-৭৬২০১০ (অ)
জনাব মোঃ নাজমুল হুদা প্রকল্প কর্মকর্তা	০৪১-৮৬১২৮৭ (অ)
খুলনা জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪১-৭৬৩০১৬ (অ) dfokhulna@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফুলতলা	০৪১-৭০১৪৫২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তেরখাদা	০৪০২৯-৫৬০২১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বটিয়াঘাটা	০৪০২২-৫৬০২৮ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ডুমুরিয়া	০৪০২৫-৫৬০২৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দাকোপ	০৪০২৩-৫৬০৭৮ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পাইকগাছা	০৪০২৭-৫৬২৬২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কয়রা	০৪০২৬-৫৬০৩৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দিঘলিয়া	০৪১-৮৯০০১২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রূপসা	০৪১-৮০০১২২ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, খুলনা সদর	০৪১-৮১৩২৫৮ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, ডুমুরিয়া, খুলনা	০৪০২৫-৫৬১১৭ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
সাতক্ষীরা জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৭১-৬৩৩১৮ (অ) dfosatkhira@fisheries.gov.bd
আঞ্চলিক মৎস্য কর্মকর্তা, কালীগঞ্জ	০১৭১২-৮৪৫৫৯৪
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৭১-৬৩৮৪০ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কলারোয়া	০৪৭২৪-৭৫৩২৪ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তালা	০৪৭২৩-৫৬১২২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আশাশুনি	০৪৭২২-৫৬০২০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালীগঞ্জ	০৪৭২৫-৫৬০৫৪ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শ্যামনগর	০৪৭২৬-৭৪০২৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দেবহাটা	০৪৭৩২-৭২০৫৫ (অ)
বাগেরহাট জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৬৮-৬২৪৪৫ (অ) dfobagerhat@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৬৮-৬২৪৪৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রামপাল	০৪৬৫৭-৫৬০২৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মোড়েলগঞ্জ	০৪৬৫৬-৫৬২০৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মংলা	০৪৬৫৮-৭৩২১৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কচুয়া	০৪৬৫৪-৫৬০০৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চিতলমারী	০৪৬৫২-৫৬০২৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মোল্লাহাট	০৪৬৫৫-৫৬০২১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফকিরহাট	০৪৬৫৩-৫৬২৪৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শরণখোলা	০৪৬৫৯-৫৬০৪৭ (অ)
যশোর জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪২১-৬৫৭৫২ (অ) dfojessore@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪২১-৬৮৯৮১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, অভয়নগর	০৪২২২-৭১১২৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঝিকরগাছা	০৪২২৫-৭১৫২২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মনিরামপুর	০৪২২৭-৭৮৪২৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কেশবপুর	০৪২২৬-৫৬৩৭২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাঘারপাড়া	০৪২২৩-৫৬০২৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শার্শা	০৪২২৮-৭৫৪০১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চৌগাছা	০৪২২৪-৫৬৩৬৬ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, যশোর সদর	০৪২১-৬৪০৪৬ (অ)
ঝিনাইদহ জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৫১-৬২৮৫৭ (অ) dfojhinaidah@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৫১-৬১৩৮১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হরিণাকুন্ডু	০৪৫২২-৭৪০২২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালীগঞ্জ	০৪৫২৩-৫৬১০৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কোটচাঁদপুর	০৪৫২৪-৬৫০৪১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মহেশপুর	০৪৫২৫-৫৬২৩৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শৈলকুপা	০৪৫২৬-৫৬০৬০ (অ)
হ্যাচারী ম্যানেজার, কেন্দ্রীয় কার্প হ্যাচারি কমপ্লেক্স, কোটচাঁদপুর	০৫৩৩৪-৭৪৩২৪ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
নড়াইল জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৮১-৬২০৩৩ (অ) dfonarail@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৮১-৬২০৪২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লোহাগড়া	০৪৮২৩-৫৬৩৫৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালিয়া	০৪৮২২-৫৬০৫৪ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, সদর	০৪৮১-৬২০৬৬ (অ)
মাগুরা জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৮৮-৬২৩৪১ (অ) dfomagura@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৮৮-৬২৩১১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শালিখা	০৪৮৫৩-৫৬১০৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মুহম্মদপুর	০৪৮৫২-৭৫১৫৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শ্রীপুর	০৪৮৫৪-৫৬১৫২ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, মাগুরা সদর	০৪৮৮-৬২৮৫১ (অ)
কুষ্টিয়া জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭১-৬২১৮৯ (অ) dfokushtia@fisheries.gov.bd
সহকারী পরিচালক, কুষ্টিয়া	০৭১-৬২১০৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৭১-৭১১৫৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কুমারখালী	০৭০২৫-৭৬৪৬৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, খোকসা	০৭০২৪-৫৬৩৭৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মিরপুর	০৭০২৬-৫৬৪৫৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভেড়ামারা	০৭০২২-৭১৫৪০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দৌলতপুর	০৭০২৩-৭৫২৬২ (অ)
মেহেরপুর জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৯১-৬২৫৪৩ (অ) dfomeherpur@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৭৯১-৬২৬৪৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গাংনী	০৭৯২২-৭৫৮৫৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মুজিবনগর	০৭৯২৩-৭৪১৬৯ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, সদর	০৭৯১-৬২৯১৮ (অ)
চুয়াডাঙ্গা জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৬১-৬২৩৮৮ (অ) dfochuadangaa@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৭৬১-৬৩১২৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জীবননগর	০৭৬২৪-৭৫০৫৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আলমডাঙ্গা	০৭৬২২-৫৬২৩৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দামুড়হুদা	০৭৬২৩-৫৬০৬৭ (অ)

রাজশাহী বিভাগ	
এম আই গোলদার উপপরিচালক	০৭২১-৭৬০১৮৪ (অ) ০৭২১-৭৭৩১৫০ (বা) ddrajshahi@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ সাইদুর রহমান সহকারী পরিচালক	০৭২১-৮৬০০০২ (অ) ০৭২১-৮৬০০০২ (ফ্যা)
সুভাষ চন্দ্র সাহা, সহকারী পরিচালক ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রকল্প, রাজশাহী বিভাগ	০৭২১-৮৬০৫৯০ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
মঞ্জুয়ারা বেগম বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৎস্য সম্পদ জরিপ	০৭২১-৮৬১৫০১ (অ)
রাজশাহী জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭২১-৭৬০২৪৫ (অ) dforajshahi@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পবা	০৭২১-৭৬০৮২৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পুঠিয়া	০৭২২৮-৫৬৩২৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দূর্গাপুর	০৭২২৪-৫৬০২১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চারঘাট	০৭২২৩-৫৬১১৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাঘা	০৭২৩৩-৫৬১০৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাগমারা	০৭২২২-৫৬০৫১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মোহনপুর	০৭২২৬-৫৬০২৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তানোর	০৭২২৯-৫৬০২৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী	০৭২২৫-৫৬১৮১ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, রাজশাহী সদর	০৭২১-৮৬১৪৪০ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, পুঠিয়া, রাজশাহী	০৭২২৮-৫৬৩১৩ (অ)
নাটোর জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৭১-৬২৫৯০ (অ) dfonatore@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৭৭১-৬২৬৪১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বড়াইগ্রাম	০৭৭২৩-৫৬০৪৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গুরুদাসপুর	০৭৭২৪-৭৪৪০৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সিংড়া	০৭৭২৬-৬৩১২০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাগাতিপাড়া	০৭৭২২-৭২০৩৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লালপুর	০৭৭২৫-৭৫০৬০ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, নাটোর সদর	০৭৭১-৬২৯১৮ (অ)
নওগাঁ জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৪১-৬২৫৮৫ (অ) dfonaogaon@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৭৪১-৬২৮২৮ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মান্দা	০৭৪২৫-৬২০৩৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাপাহার	০৭৪৩২-৭৪০৭৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মহাদেবপূর	০৭৪২৬-৫৭১২৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নিয়ামতপুর	০৭৪২৭-৫৬০৬৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাণীনগর	০৭৪৩৩-৫৬০৪৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আত্রাই	০৭৪২২-৭১০০৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বদলগাছী	০৭৪২৩-৫৬০২৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ধামুইরহাট	০৭৪২৪-৫৬০৮৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পত্নীতলা	০৭৪২৮-৬৩০৯৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পোরশা	০৭৪২৯-৫৬০১৩ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, নওগাঁ সদর	০৭৪১-৬১৭৬১ (অ)
চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৮১-৫৫৪৮২ (অ) dfonawabganj@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৭৮১-৫৫৮৩৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নাচোল	০৭৮২৪-৫৬০৩২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোমস্তাপুর	০৭৮২৩-৭৪১১২ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শিবগঞ্জ	০৭৮২৫-৭৫২৩৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভোলাহাট	০৭৮২২-৫৬০৪৯ (অ)
পাবনা জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা dfo.pabna@fisheries.gov.bd	০৭৩১-৬৬০৬৮ (অ) ০৭৩১-৬৪৫১৫ (ফ্যা)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৭৩১-৬৪৯৩১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঈশ্বরদী	০৭৩২৬-৬৩৯১০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফরিদপুর	০৭৩২৫-৬৪০২১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আটঘরিয়া	০৭৩২২-৫৬০২৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চাটমোহর	০৭৩২৪-৬৫৩২৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভাঙ্গুড়া	০৭৩২৮-৫৬১০২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বেড়া	০৭৩২৩-৭৫১২১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাথিয়া	০৭৩২৭-৫৬১৫৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সুজানগর	০৭৩২৯-৫৬১৬৮ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, ঈশ্বরদী	০৭৩২৬-৬৩৪২৭ (অ)
সিরাজগঞ্জ জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৫১-৬২১৩৭ (অ) dfosirajgonj@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৭৫১-৬২৯৩৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উল্লাপাড়া	০৭৫২৯-৫৬১৭৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাজীপুর	০৭৫২৫-৫৬২০৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শাহজাদপুর	০৭৫২৭-৬৪৫৩৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কামারখন্দ	০৭৫২৪-৫৬০২৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তাড়াশ	০৭৫২৮-৪৬১০৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রায়গঞ্জ	০৭৫২৬-৫৬১২৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বেলকুচি	০৭৫২২-৫৬৫০৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চৌহালি	০৭৫১-৬৩৮২৩ (অ)
প্রকল্প মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, উল্লাপাড়া	০৭৫২৯-৫৬২১৫ (অ)
জয়পুরহাট জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৭১-৬২২২৪ (অ) dfojaipurhut@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫৭১-৬২২৭৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পাঁচবিবি	০৫৭১-৭৫২৪৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালাই	০৫৭২৬-৫৬০৮৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আক্কেলপুর	০৫৭২২-৬৪০১৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ক্ষেতলাল	০৫৭২৩-৫৬০৪৫ (অ)
বগুড়া জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫১-৬০৫৭০ (অ) dfobogra@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫১-৬৪৩৮৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শেরপুর	০৫০২৯-৭৭৪১৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আদমদীঘি	০৭৪১-৬৯২২১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাহালু	০৫০২৬-৫৬০৩০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নন্দীগ্রাম	০৫০২৭-৭৬০১৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শিবগঞ্জ	০৫০৩৩-৬৯০৭৮ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সারিয়াকান্দী	০৫১-৫৬২৭৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দুপচাঁচিয়া	০৫০২৪-৮৮০৯২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ধুনট	০৫০২৩-৫৬২৪১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গাবতলী	০৫০২৫-৭৫০৮৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সোনাতলা	০৫০৩২-৭৯১১৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শাহজাহানপুর	০৫১৮২২৫৮ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, মালতিনগর	০৫১-৬৫৩৩৮ (অ)

রংপুর বিভাগ	
জনাব মাঃ মনিরুজ্জামান উপপরিচালক	০৫২১-৬৪৭৭০ (অ) ০৫২১-৫৫০৪৬ (বা) ddrangpur@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন সহকারী পরিচালক	০৫২১-৫৫০৪৫ (অ)
রংপুর জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫২১-৬২৯২৯ (অ) dforangpur@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫২১-৬২২৩০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পীরগঞ্জ	০৫২২৭-৫৬০৯৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মিঠাপুকুর	০৫২২৫-৮৭০৮১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বদরগঞ্জ	০৫২২২-৫৬২৭৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাউনিয়া	০৫২২৪-৫৬০৩৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গঙ্গাচড়া	০৫২২৩-৫৬০০৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পীরগাছা	০৫২২৬-৫৬০৬৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তারাগঞ্জ	০৫২২৮-৫৬০৩৪ (অ)
কুড়িগ্রাম জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা dfo.kurigram@fisheries.gov.bd	০৫৮১-৬১৫০১ (অ) ০৫৮১-৬১০২৪ (ফ্যা)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫৮১-৬১৮৫৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী	০৫৮২-৫৫৬০১৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাজিবপুর	০৫৮২৩-৫৬২১৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নাগেশ্বরী	০৫৮২৬-৫৬৩২১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উলিপুর	০৫৮২৯-৫৬২৭৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চিলমারী	০৫৮২৪-৫৬০৪০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রৌমারী	০৫৮২৫-৫৬০৫১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাজারহাট	০৫৮২৭-৫৬০০৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভুরুঙ্গামারী	০৫৮২২-৫৬০৭৪ (অ)
নীলফামারী জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৫১-৬১৫৭০ (অ) dfonilphamari@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫৫১-৬১৭৭০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ডিমলা	০৫৫২২-৫৬২৩৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সৈয়দপুর	০৫৫২৬-৭২৯৪৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কিশোরগঞ্জ	০৫৫২৫-৫৬০১৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ডোমার	০৫৫২৩-৭৫১৮২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জলঢাকা	০৫৫২৪-৬৪০৮৩ (অ)
ঠাকুরগাঁও জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৬১-৫৩৪৬৩ (অ) dfothakurgaon@fisheries.gov.bd

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫৬১-৫২৫২৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাণীসংকৈল	০৫৬২৫-৫৬১১৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বালিয়াডাঙ্গী	০৫৬২২-৫৬০৫৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হরিপুর	০৫৬২৩-৫৬০১৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পীরগঞ্জ	০৫৬২৪-৫৬৩৮৯ (অ)
দিনাজপুর জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৩১-৬৪৪৮৬ (অ) dfodinajpur@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫৩১-৬৩৩১৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বীরগঞ্জ	০৫৩২৩-৭২৫১১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাহারোল	০৫৩৩৫-৫৬০৪০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বিরল	০৫৩২৪-৫৬০১৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চিরিরবন্দর	০৫৩২৬-৫৬১৯৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী	০৫৩২৭-৫৬৩২৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বিরামপুর	০৫৩২২-৫৬০২৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হাকিমপুর	০৫৩২৯-৭৫১০২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, খানসামা	০৫৩৩২-৫৬০১০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঘোড়াঘাট	০৫৩২৮-৫৬০২৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পার্বতীপুর	০৫৩৩৪-৭৪২২০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নবাবগঞ্জ	০৫৩৩৩-৫৬০২৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সেতাবগঞ্জ	০৫৩২৫-৭৩২২১ (অ)
লালমনিরহাট জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা dfo.lalmonirhat@fisheries.gov.bd	০৫৯১-৬১৩৪৬ (অ) ০৫৯১-৬১১৩৭ (বা)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫৯১-৬১০২৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আদিতমারী	০২৯২২৫৬১৬৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালীগঞ্জ	০৫৯২৪-৫৬১৮৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হাতীবান্ধা	০৫৯২৩-৫৬২৭৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পাটগ্রাম	০৫৯২৫-৫৬০৮৮ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, লালমনিরহাট সদর	০৫৯১-৬১০৭১ (অ)
গাইবান্ধা জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৪১-৬১৬৪৩ (অ) dfogaibandha@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫৪১-৬১৯২০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পলাশবাড়ী	০৫৪২৪-৫৬০৫৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাঘাটা	০৫৪২৬-৫৬১২৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোবিন্দগঞ্জ	০৫৪২৩-৭৫০৬৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাদুল্লাপুর	০৫৪১-৬১৩৪৯৩১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফুলছড়ি	০৫৪২২-৬২০৩৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সুন্দরগঞ্জ	০৫৪২৭-৬৪০৭২ (অ)
পঞ্চগড় জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৬৮-৬১৩৬৯ (অ) dfopanchagarh@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫৬৮-৬১৯৬৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আটোয়ারী	০৫৬৫২-৫৬০২৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বোদা	০৫৬৫৩-৫৬১৯৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দেবীগঞ্জ	০৫৬৫৪-৫৬০৬০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তেঁতুলিয়া	০৫৬৫৫-৭৫০৬৩ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
চট্টগ্রাম বিভাগ	
জনাব এ কে এম সিদ্দিক উপপরিচালক	০৮১-৭৬১২৭ (অ) ০৮১-৭১৯০০ (বা) ddchitagonj@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ আব্দুস ছাত্তার সহকারী পরিচালক	০৮১-৭৬৫১১ (অ)
চট্টগ্রাম জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৩১-২৫৮০৯৮২ (অ) dfochitagonj@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পটিয়া	০৩০৩৫-৫৬৩২৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মিরসরাই	০৩০২৪-৫৬২৪৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আনোয়ারা	০৩০২৯-৫৬০৪৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সীতাকুন্ড	০৩০২৮-৫৬০৫৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাঁশখালী	০৩০২৭-৫৬১৩৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাউজান	০৩০২৬-৫৬২৫৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চন্দনাইশ	০৩০৩৬-৫৬৪৭৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা লোহাগড়া	০৩০৩৪-৫৬৫১৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফটিকছড়ি	০৩০২২-৫৬২৪৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাতকানিয়া	০৩০৩৬-৫৬৪৭৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হাটহাজারী	০৩১-২৬০১৮৯৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাঙ্গুনিয়া	০৩০২৫-৫৬২০১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বোয়ালখালী	০৩০৩২-৫৬১৭৫ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, পটিয়া	০৩০৩৫-৫৬৩৪৮ (অ)
কক্সবাজার জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৩৪১-৬৩২৬৮ (অ) dfocoxsbazar@fisheries.gov.bd
প্রকল্প ব্যবস্থাপক (এডিপি)	০৩৪১-৬৪৫৪৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৩৪১-৬৪২৮৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মহেশখালী	০৩৪২৪-৭৪২৮২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, টেকনাফ	০৩৪২৬-৭৫০০৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চকরিয়া	০৩৪২২-৫৬৫৩৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রামু	০৩৪২৫-৫৬২৯৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উখিয়া	০৩৪২৭-৫৬১২০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পেকুয়া	০৩৪২৮-৫৬১৭৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কুতুবদিয়া	০৩৪২৩-৫৬১৫৫ (অ)
আঞ্চলিক মৎস্য কর্মকর্তা	০৩৪১-৫১১২৬ (অ)
ফেনী জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা dfo.feni@fisheries.gov.bd	০৩৩১-৭৪০৪৬ (অ) ০৩৩১-৬১২৮৭ (বা)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৩৩১-৭৪০৭৩ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ছাগলনাইয়া	০৩৩২২-৭৮৪৭৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পরশুরাম	০৩৩২৪-৫৬০০৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফুলগাজী	০৩৩২৬-৭৭১৭৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দাগনভূঞা	০৩৩২৩-৭৯১৫৩ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, ফেনী সদর	০৩৩১-৭৪২৩২ (অ)
চাঁদপুর জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮৪১-৬৩১৬৫ (অ) dfochadpur@fisheries.gov.bd

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৮৪১-৬৫৯৮০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কচুয়া	০৮৪২৫-৫৬১৮০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শাহরাস্তি	০৮৪২৭-৫৬২০৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মতলব (দ:)	০৮৪২৬-৫৬৩৯০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মতলব (উ:)	০৮৪২৮-৫১০২৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হাইমচর	০৪৪২৩-৫২২০১(অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হাজীগঞ্জ	০৮৪২৪-৭৫০৫৮(অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফরিদগঞ্জ	০৮৪২২-৬৪৩৭৬(অ)
খামার ব্যবস্থাপক, কচুয়া	০৮৪২৫-৫৬১৮০ (অ)
ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা dfo.brahmanbaria@fisheries.gov.bd	০৮৫১-৫৮৫০১ (অ) ০৮৫১-৫৯৭৮৫ (বা)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৮৫১-৫৯০১৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নবীনগর	০৮৫২৫-৭৫২৭৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাঞ্ছারামপুর	০৮৫২৩-৫৬১০১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নাসিরনগর	০৮৫২৬-৫৬০৫৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সরাইল	০৮৫২৭-৫৬১৫৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কসবা	০৮৫২৪-৭৩২০২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আশুগঞ্জ	০৮৫২৮-৭৪১০১ (অ)
কুমিল্লা জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা dfocomilla@fisheries.gov.bd	০৮১-৭৬১৫১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৮১-৭৬৬০৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বুড়িচং	০৮০২৯-৫৬১৬৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লাকসাম	০৮৩২-৫১৩৩৪ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চৌদ্দগ্রাম	০৮০২০-৫৬২১১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চান্দিনা	০৮০২২৫৬৪১৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দেবিদ্বার	০৮২৪-৫৩২৪৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মুরাদনগর	০৮০২৬-৫৬০৩৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দাউদকান্দি	০৮০২৩-৫৫৩৩১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নাঙ্গলকোট	০৮০৩৩-৬৬২২৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বরুড়া	০৮০২৭-৫২০৫৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর দক্ষিণ	০৮০৪২-৫৭০৩০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মেঘনা	০৮০৩৫-৫১১৯২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তিতাস	০৮০২৩-৫৫৩৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হোমনা	০৮০২৫-৫৪২৭২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ব্রাহ্মণপাড়া	০৮০২৮-৫৬২৮২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মনোহরগঞ্জ	০৮০৩৭-৫৩০৩১ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, দেবীদ্বার খামার	০৮০২৪-৫৩৩৮০ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, জাঙ্গালিয়া খামার	০৮১-৭৬৫৪২ (অ)
রাঙ্গামাটি জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা dforangamati@fisheries.gov.bd	০৩৫১-৬২৩২৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৩৫১-৬৩৬০৪ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
বান্দরবান জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা dfobandarban@fisheries.gov.bd	০৩৬১-৬২৩৩৮ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৩৬১-৬২৩৩৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আলীকদম	০৩৬১-৮১০১০ (অ)
খাগড়াছড়ি জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা dfokhagrachari@fisheries.gov.bd	০৩৭১-৬১৭২৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৩৭১-৬২০৯৫ (অ)
লক্ষ্মীপুর জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা dfolaksmipur@fisheries.gov.bd	০৩৮১-৫৫৪৬৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৩৮১-৬২২৬৪ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রামগতি	০৩৮২৩-৫৬২৭৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রায়পুর	০৩৮২২-৫৬৪৯১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রামগঞ্জ	০৩৮২৪-৭৫৪৯৫ (অ)
নোয়াখালী জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা dfonoakhali@fisheries.gov.bd	০৩২১-৬১৬৮১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৩২১-৬১৬৪৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বেগমগঞ্জ	০৩২১-৫২৩২৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কোম্পানীগঞ্জ	০৩২২৩-৫৬৩৮৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সেনবাগ	০৩২২৫-৫৬১৯৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হাতিয়া	০৩২২৪-৫৬০৪৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চাটখিল	০৩২২২-৭৫০৫৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সুবর্ণচর	০৩২২৮-৫২১৫৬(অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কবিরহাট	০৩২৩২-৫৩২৭৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সোনাইমুড়ি	০৩২২৭-৫১০১৩ (অ)

সিলেট বিভাগ	
ড. নিত্যানন্দ দাস উপপরিচালক	০৮২১-৭৬১২৩(অ ও ফ্যা) ddsylhet@fisheries.gov.bd
জনাব মোল্লা এমদাদুল্যাহ সহকারী পরিচালক	০৮২১-৭২৩২৫৭ (অ) dfo.sylhet@fisheries.gov.bd
সিলেট জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা dfo.sylhet@fisheries.gov.bd	০৮২১-৭১৬২৪১ (অ) ০৮২১-৭২১৯৭৮ (বা)
সহকারী পরিচালক, জেলা মৎস্য দপ্তর	০৮২১-৭১১২৯৮ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৮২১-২৮৭০০৩৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বালাগঞ্জ	০৮২২২-৫৬১২২ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোলাপগঞ্জ	০৮২২৭-৫৬৪২৩ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বিশ্বনাথ	০৮২২৪-৫৬০৭০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জৈন্তাপুর	০৮২২৯-৫৬০৫৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোয়াইনঘাট	০৮২২৮-৫৬০৬৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জকিগঞ্জ	০৮২৩২-৫৬০২২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দক্ষিণ সুরমা	০৮২১-২৮৭৮২১৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফেঞ্চুগঞ্জ	০৮২২৬-৫৬২৪৩ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কানাইঘাট	০৮২৩৩-৫৬১১৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বিয়ানীবাজার	০৮২২৩-৫৬০৩৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কোম্পানীগঞ্জ	০৮২২৫-৫৬০৯৬ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, খাদিমনগর	০৮২১-২৮৭০২২৫ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, গোলাপগঞ্জ	০৮২২৭-৫৬৪২৪ (অ)
সুনামগঞ্জ জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮৭১-৬১৪৯৭ (অ) dfosunamgonj@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৮৭১-৬১৬৬২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দিরাই	০৮৭২৪-৫৬৪৭৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তাহিরপুর	০৮৭৩২-৫৬০১৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দোয়ারাবাজার	০৮৭২৬-৫৬০৬৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শাল্লা	০৮৭২৯-৫৬০৭২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বিশ্বম্ভরপুর	০৮৭২২-৫৬১২৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জামালগঞ্জ	০৮৭২৮-৫৬১৩৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ধর্মপাশা	০৮৭২৫-৭৫০৫১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দ: সুনামগঞ্জ	০৮৭১-৬২৪৭১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ছাতক	০৮৭২৩-৫৬০০৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জগন্নাথপুর	০৮৭২৭-৫৬০৪২ (অ)
হবিগঞ্জ জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮৩১-৬৩৩৫০ (অ) dfohabigonj@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৮৩১-৬২৩১৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নবীগঞ্জ	০৮৩২৮-৫৬৩০২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বানিয়াচং	০৮৩২৪-৫৬২১০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আজমিরীগঞ্জ	০৮৩২২-৫৬১১৬(অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাহুবল	০৮৩২৩-৫৬০৯০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চুনারুঘাট	০৮৩২৮-৫৬১৯০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মাধবপুর	০৮৩২৭-৫৬১৮১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লাখাই	০৮৩২৬-৫৬০৩৪ (অ)
মৌলভীবাজার জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮৬১-৫২৮১৩ (অ) dfomoulavizazar@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৮৬১-৬২৯০৮ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শ্রীমঙ্গল	০৮৬২৬-৭১৪৮০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাজনগর	০৮৬২৫-৭৫৪৯৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কুলাউড়া	০৮৬২৪-৫৬৬৪৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কমলগঞ্জ	০৮৬২৩-৫৬১৪৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জুড়ী	০৮৬২৭-৫৭১৪৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বড়লেখা	০৮৬২২-৫৬৬১৭ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, মৌলভীবাজার সদর	০৯৬১-৫২২৯২ (অ)

বরিশাল বিভাগ	
ড. এ কে এম আমিনুল হক উপপরিচালক	০৪৩১-৬৪৬২৭ (অ) ০৪৩১-২১৭৫২৭৭ (ফ্যা) ddbarishal@fisheries.gov.bd
জনাব বঙ্কিম চন্দ্র বিশ্বাস সহকারী পরিচালক	০৪৩১-৬৩৪৫২ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
জনাব বঙ্কিম চন্দ্র বিশ্বাস সহকারী পরিচালক (ইউনিয়ন প্রকল্প)	০৪৩১-২১৭৭৫০০ (অ) ও (ফ্যা)
বরিশাল জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৩১-৬৪০১৮ (অ) dfobarisal@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,সদর	০৪৩১-৬২৬০৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আগৈলঝড়া	০৪৩২৩-৫৬২৯৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাকেরগঞ্জ	০৪৩২৮-৭৪২৬৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উজিরপুর	০৪৩২৯-৫৬১৫৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাবুগঞ্জ	০৪৩২৭-৭৩০৪৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গৌরনদী	০৪৩২২-৫৬৫৩৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বানারীপাড়া	০৪৩৩২-৫৬৩৯১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মেহেন্দিগঞ্জ	০৪৩২৫-৫৬১৬৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মুলাদী	০৪৩২৬-৭৫২৩৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হিজলা	০৪৩২৪-৫৬০৪১ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, সদর	০৪৩১- ২১৭৩৫১৫(অ)
খামার ব্যবস্থাপক, মেহেন্দিগঞ্জ	০৪৩২৫-৫৬১৬৫ (অ)
ভোলা জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৯১-৬২৪০৭ (অ) pkanamallicki@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৯১-৬২৮৬৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চরফ্যাশান	০৪৯২৩-৭৪০৯০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তজুমদ্দীন	০৪৯২৭-৫৬০৪৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দৌলতখান	০৪৯২৪-৫৬১৬৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বোরহানউদ্দিন	০৪৯২২-৫৬১৫৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লালমোহন	০৪৯২৫-৭৫৬১৭(অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মনপুরা	০৪৯২৬-৫৬০২১ (অ)
ঝালকাঠি জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৯৮-৬৩২৫৮ (অ) dfojahlai@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৯৮-৬৩২৫৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাঠালিয়া	০৪৯৫২-৫৬০৬৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাজাপুর	০৪৯৫৪-৬৫৩৪০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নলছিটি	০৪৯৫৩-৭৪০৩৪ (অ)
বরগুনা জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৪৮-৬২৩৯৬ (অ) dfoborguna@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৪৮-৬২৩৮১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আমতলী	০৪৪৫২-৫৬১৩৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পাথরঘাটা	০৪৪৫৫-৭৫২২৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বামনা	০৪৪৫৩-৫৬০৭৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বেতাগী	০৪৪৫৪-৫৬১৪৬ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, বরগুনা সদর	০৪৪৮-৬২৬৮১ (অ)
পটুয়াখালী জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৪১-৬২৫০১ (অ) dfokpatuakhali@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,সদর	০৪৪১-৬২০৯৬ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাউফল	০৪৪২২-৫৬১১৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দশমিনা	০৪৪২৩-৫৬১৬৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গলাচিপা	০৪৪২৪-৫৬১৩৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মির্জাগঞ্জ	০৪৪২৬-৭৫২৮৫ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, পটুয়াখালী সদর	০৪৪১-৬২৮০৫ (অ)
পিরোজপুর জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৬১-৬২৫৯৭ (অ) dfopirojpuri@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৬১-৬২৬৯৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মঠবাড়িয়া	০৪৬২৫-৭৫১৮৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নাজিরপুর	০৪৬২৬-৭৪০৫৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাউখালী	০৪৬২৪-৫৬২৪৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নেছারাবাদ	০৪৬২৭-৫৬০৪৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জিয়ানগর	০৪৬২২-৫৬১৪৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভাণ্ডারিয়া	০৪৬২৩-৫৬৪৩৯ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, পিরোজপুর সদর	০৪৬১-৬২০৬৩ (অ)

মাৎস্য বিজ্ঞান অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ	
ড. মনোরঞ্জন দাস ডীন, মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ	০৯১-৬৭৪২৬ (অ)
ড. জাকির হোসেন প্রধান, ফিসারিজ বায়োলজি এন্ড জেনেটিক্স বিভাগ	০৯১-৬৭৪০১-৬ এক্স. ২৯১০ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
ড. মোঃ আলী রেজা ফারুক প্রধান, অ্যাকোয়াকালচার বিভাগ	০৯১-৬৭৪০১-৬ এক্স. ২৯২০ (অ)
ড. শাহরোজ মাহিন হক প্রধান, ফিসারিজ ম্যানেজমেন্ট বিভাগ	০৯১-৬৭৪০১-৬ এক্স. ২৯৫৬ (অ)
প্রধান, ফিসারিজ টেকনোলজি বিভাগ	০৯১-৬৭৪০১-৬ এক্স. ২৯৭২ (অ)
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা	
প্রফেসর ড. মোঃ ছায়েক-উজ্জামান ভাইস-চ্যান্সেলর	০৪১-৭২১৩৯৩ (অ) ০৪১-২৮৩০১১১ (বা)
প্রফেসর ড. মোঃ নাজমুল আহসান প্রধান, এমআরটি ডিসিপ্লিন	০৪১-৭৩২১৫৭ (অ) nazmul_ku@yahoo.com
পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী	
ড. সুলতান মাহমুদ অধ্যাপক, মাৎস্য বিজ্ঞান অনুষদ	০৪৪২৭-৫৬৩১৭ sultanmahmud77@yahoo.com
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী	
ড. মোঃ আখতার হোসেন অধ্যাপক, ফিসারিজ বিভাগ	০৭২১-৭৬০৫৪১ (বা) mahfaa@yahoo.com
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	
মিসেস ওয়াহিদা হক চেয়ারম্যান, মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগ	৯৬৬১৯২০- ৭৭৮৩ (অ) daahsan@yahoo.com
ড. এম. নিয়ামুল নাসের অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ	৯৬৬১৯২০-৫০ এক্স. ৭৫৯৮ (অ)

সংকলনে:
মোঃ মিজানুর রহমান, ফিসারিজ টেকনোলজিস্ট, মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ

USAID Disclaimer: "This publication is made through support provided by the United States Agency for International Development (USAID). The contents and opinions expressed herein are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the US Agency for International Development or the United States Government."

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৩

সংকলন

মাছে মাছে
ভরবো দেশ
গড়বো সোনার
বাংলাদেশ

মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা পরিষদ

সৈয়দ আরিফ আজাদ	মহাপরিচালক	প্রধান উপদেষ্টা
নাসিরউদ্দিন মোঃ হুমায়ূন	পরিচালক	উপদেষ্টা
নিত্যরঞ্জন বিশ্বাস	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	সভাপতি
ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
মোঃ আবুল হাসেম	প্রকল্প পরিচালক	সদস্য
ড. মোহাঃ সাইনার আলম	সহকারী পরিচালক	সদস্য
ড. আলী মুহম্মদ ওমর ফারুক	সহকারী পরিচালক	সদস্য
মোঃ হুমায়ুন কবির খান	সহকারী পরিচালক	সদস্য
মোঃ মুখলেসুর রহমান	সহকারী পরিচালক	সদস্য
মুহাম্মদ মামুনুর রশিদ	গবেষণা কর্মকর্তা	সদস্য
কায়সার মুহাম্মদ মঈনুল হাসান	সহকারী পরিচালক	সদস্য
মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন	সহকারী পরিচালক	সদস্য
মোঃ সফিকুল ইসলাম	সহকারী পরিচালক	সদস্য
বেগম শবনম মোস্তারী	গবেষণা কর্মকর্তা	সদস্য
বেগম আয়েশা সিদ্দিকা	গবেষণা কর্মকর্তা	সদস্য
মোঃ মিজানুর রহমান	ফিসারিজ টেকনোলজিস্ট	সদস্য
মোহাম্মদ কামরুজ্জামান হোসাইন	মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	সদস্য
মনিকা দাস	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
রমেশ চন্দ্র মণ্ডল	উপপ্রধান	সদস্য সচিব

প্রকাশনায়
মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ

প্রকাশকাল
জুলাই ২০১৩

প্রচ্ছদ
সৈয়দ রাকিবুল মইন রুমি, মৎস্য অধিদপ্তর
প্রবীর সাহা, স্প্যারো কমিউনিকেশন, ঢাকা

প্রচার সংখ্যা
৮,৫০০ (সৌজন্যমূলক বিতরণের জন্য)

মুদ্রণ ও অলংকরণ
স্প্যারো কমিউনিকেশন
২৭৮ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন ঢাল, ঢাকা
sparrow.com@gmail.com

Citation: DoF.2013. National Fish Week 2013 Compendium (In Bengali).
Department of Fisheries, Ministry of Fisheries and Livestock, Bangladesh. 144p.